KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৮ [illegible] [illegible] স্ট্রীট, কল ১৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 11/4 12/2 12/3 12/4	Year of Publication : Oct 1988 May 1989 July 1989 July-Sep 1989 Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

শারদীয় বিভাব ১৯৮৮

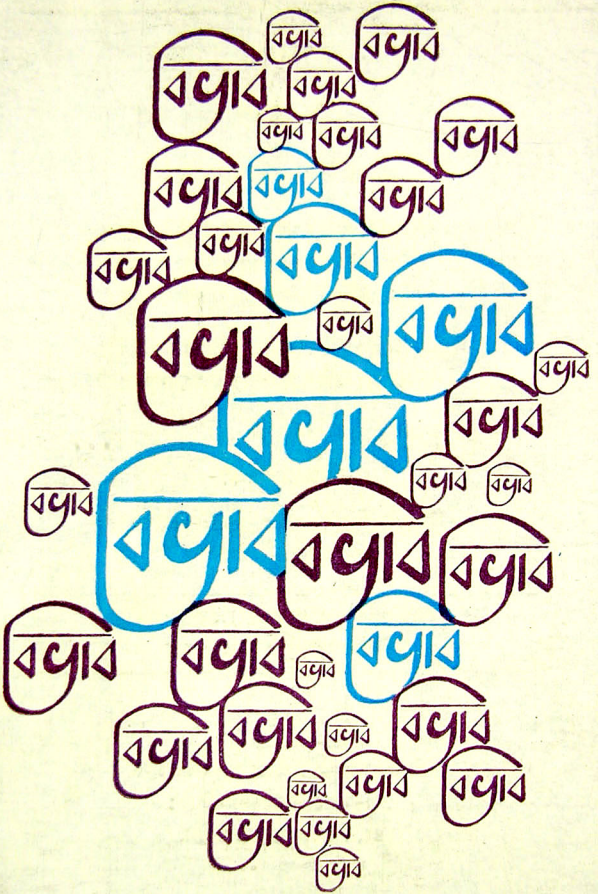

সম্পাদক / সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বর্ষ শেষে যদি মা এলে, দাও ভরে সুখ সকল ঘরে।
শস্য-শ্যামল হোক মা ধরা, শান্তিবারি পড়ুক ঝ'রে।।

আনন্দময়ীর আগমনে
সকলকে জানাই শারদ শুভেচ্ছা।

কেয়ো-কার্পিন প্রস্তুতকারক
Dey's দে'জ মেডিক্যাল
যাদের যত্নই আপনার আস্থা

DMS/P-3/88

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
বিশেষ শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৫

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সূচি

কতটুকু এলিয়ট	১	শঙ্খ ঘোষ
সাক্ষী ডুমুর গাছ	১৫	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
স্টেপনি	২৯	নবকুমার বসু
মকবুল ফিদা হুসেনের সঙ্গে পার্ব্বতী মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার	৩৭	
গুণানন্দের গোল	৪৭	গুণানন্দ ঠাকুর
রবীন্দ্রসংগীতের ভবিষ্যৎ— কয়েকটি প্রশ্ন	৫১	সুধীর চক্রবর্তী
মার্কসবাদ ও অস্তিতাবাদ : অবিচ্ছেদ্য বিচ্ছিন্নতা	৭৬	পথিক বসু
সাধন মার্গ	৯৩	রাধাপ্রসাদ ঘোষাল
আমাদের ঘরসংসার	১০৬	বাসুদেব দেব
মেলায় মানুষের রক্ত	১১৮	কমল চক্রবর্তী
আলোচনা চক্র	১৩৪	তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
চক্ষু বোজা চক্ষু খোলা	১৪৮	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
জাগো, মসৃণ ত্বক	১৬১	সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

উপন্যাস-ক্রোড়পত্র

ঘাতক	১	কল্যাণ মজুমদার

সম্পাদকমণ্ডলী

পবিত্র সরকার

দেবীপ্রসাদ মজুমদার। প্রদীপ দাশগুপ্ত

সম্পাদক

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদকীয় দপ্তর

6 সার্কাস মার্কেট প্লেস। কলিকাতা 17

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

অরূপ দত্ত

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক 6 সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলিকাতা 17 থেকে প্রকাশিত ও টেকনোপ্রিণ্ট, 7 সৃষ্টিধর দত্ত লেন, কলিকাতা 6 থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

এই সংখ্যার সঙ্গেই বিভাব বারো বছর অতিক্রম করল। তেরো বছরের শুরুতে বিভাবের প্রত্যেক শুভানুধ্যায়ীকে জানাই সম্পাদকমণ্ডলীর শুভেচ্ছা।

প্রেস নিয়ন্ত্রণ বিল প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। কোনো বিল পার্লামেণ্টে সরকারীভাবে পাশ হয়ে যাবার পর আসমুদ্র হিমাচল জনমতের চাপে প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হতে হ'ল—এরকম নজীর আর কোথাও কখনো সৃষ্টি হয়েছে কিনা জানা নেই। সম্ভবত এমন গণ্ড-মূর্খামিও দ্বিতীয়রহিত। তাছাড়া, নানারকম তছরূপ নিয়ে যখন ভারতের প্রতিটি নগরে গলিতে শোর উঠেছে তখন এক বা একাধিক চোর যে আছেই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তছরূপও শিল্প হয়ে উঠেছে আজকাল।

এখানে আরেকটি কথাও বলা উচিত। সংবাদপত্রগুলির ভূমিকাও আমাদের সব সময় খুশী করছে না। যেন কেন্দ্রীয় রাজনীতি, রাজনৈতিক নেতাদের ক্রিয়াকাণ্ড কেলেংকারী ছাড়া এই আসমুদ্রহিমাচল বিশাল দেশে কি ঘটছে, অধিকাংশ সময়েই তা থাকে আমাদের অলক্ষ্যে। সংবাদপত্রের বেশীর ভাগ সংবাদই সহর-ভিত্তিক : গ্রামগঞ্জের মানুষদের সার্বিক উন্নতিসম্পর্কীয় নানা সমস্যার কথা প্রায় থাকে না বললেই চলে। থাকলেও কাগজের সমগ্র মুদ্রণ অংশের তুলনায় তা নিতান্তই অপ্রতুল। এ দেশের মতো পৃথিবীর আর কোথাও রাজনৈতিক খবরা-খবর সংবাদপত্রের সিংহভাগ অধিকার করে না। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় কাগুজে বিতণ্ডা, টেলিভিশনে রোজই কয়েকবার চাঁদমুখ প্রদর্শন, লক্ষবার বলা একই বক্তব্যের চোঁয়াঢেকুর পুনরুদ্গার এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বন্যা ছোটানো ছাড়া কেন্দ্রীয় নেতাদের আর কিছু করণীয় আছে কিনা! বিভিন্ন রাজ্যে যারা আছেন তারা যে সকলেই দেবতাচরণে নিবেদন-অপেক্ষায় শুদ্ধ বিল্বপত্র তাও বলছি না। তবু স্বীকার করতেই হবে কোন কোন রাজ্যে উন্নতির আন্তরিক প্রয়াস অলক্ষ্য থাকে না।

এ বছর টি. এস. এলিয়টের জন্মশতবার্ষিকীর বছর। এলিয়ট ও তাঁর অন্যতম অনুবাদক বিষ্ণু দে প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষের নিবন্ধটি এ সংখ্যার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। এই সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ হ'লো ক্ষমতাবান প্রতিষ্ঠিত গল্পকারদের পাশাপাশি

বেশ কিছু তরুণ সম্ভাবনাময় লেখকের গল্পের মুদ্রণ। মৌলিক উপন্যাসও এই প্রথম বিভাবে প্রকাশিত হ'লো। বহুদিন পর গুণানন্দ ঠাকুর ফিরে এসেছেন এ সংখ্যায়। বিভাবের জন্য বেশ কয়েকবছর আগে নেওয়া মকবুল ফিদা হুসেনের সাক্ষাৎকারটিও কৌতূহলদীপক। ফিদার সাম্প্রতিক অনেক ছবি আমাদের খুশী করতে না পারলেও, তাঁর এই সাক্ষাৎকারে তিনি এমন কিছু কথা বলেছেন যা পাঠককে মনস্ক করবেই। ফিদার বক্তব্য নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হলে আমরা খুশীই হবো।

আমাদের পড়োশী দেশ বাংলাদেশে সম্প্রতি যে ভয়াবহ বন্যা হয়ে গেল তার জন্য আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এই বিপুল প্রাণক্ষয়, সম্পদ ও শস্যবিনাশের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ, শিল্পী, সাহিত্যিক, সকলকেই জানাই আন্তরিক সমবেদনা।

পরিশেষে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই অরিজিৎ কুমার ও তার প্রেসের যোগ্য সহকর্মীদের, তাদের অক্লান্ত নিবেদিত পরিশ্রমে বিভাবের প্রকাশ এখন অনেকটাই নিয়মিত হয়ে এসেছে। কৃতজ্ঞতা জানাই ভারতের বিভিন্নপ্রান্তের গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের। তাদের অক্লান্ত সহযোগিতাতেই বিভাব এক যুগ অতিক্রম করল।

বিভাব সম্পাদকমণ্ডলী

কতটুকু এলিয়ট

শঙ্খ ঘোষ

এলিয়ট একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, এউরিপিদেস আর তাঁদের মধ্যে গ্রীক ভাষার চেয়েও অনেক শক্ত বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অধ্যাপক মারের অনুবাদ। কেননা, এলিয়টের মনে হয়েছিল, মূল গ্রীক ভাষায় যেখানে এক-শব্দে কাজ চলে যায় আর ইংরেজিতে তার প্রতিশব্দ পাওয়াও যেখানে অসম্ভব নয়, গিলবার্ট মারে সেখানে নিয়ে আসেন অনেক শব্দের ভার, এমনকী অনেকসময়ে তিনি তৈরি করে তোলেন একেবারে নতুন অনেক শব্দবন্ধ বা নিজস্ব কিছু প্রতিমা। একটু ঠাট্টা করেই এলিয়ট লিখেছেন, এউরিপিদেসেরই জীবনপাত্র চুরমার করে দেন মারে, যখন তিনি 'মেদেয়া' নাটকের অনুবাদে লেখেন 'I dazzle where I stand,/ The cup of all life shattered in my hand' ! 'দি কাপ অব অল লাইফ শ্যাটার্ড্'-এর তুল্য কোনো ছবি কিন্তু মূল সংলাপে ছিলই না, এটা মারেরই উপহার, এই হলো এলিয়টের অভিযোগ। 'আয়্যাম রুইন্ড্' : এই কথাটুকু বলবার জন্য তাঁকে নিয়ে আসতে হলো বাড়তি অতগুলি শব্দ।

এ-রকম উদাহরণ যে মারের অনুবাদে মুহুর্মুহুই পাওয়া যাবে, এইটেই অবশ্য এলিয়টের একমাত্র আপত্তি নয়। তাঁর আরো আপত্তি এই যে মারের নেই কোনো স্রষ্টার চোখ। অনুবাদের একটা দায়িত্ব হলো—এলিয়ট ভাবেন—অতীতকে তার আপন স্বাতন্ত্র্যে রেখেই বর্তমানের মতো সঞ্জীবিত করে তোলা। সে যে অনেক দূরের, সেই বোধটাও যেমন চাই, এ বোধেরও তেমনি দরকার যে সে এই মুহূর্তেরও। কাজটা শক্ত নিশ্চয়। আর, এলিয়টের বিবেচনায়, এই কাজের যোগ্য সৃজনপ্রতিভা মারের ছিল না বলে তাঁর অনুবাদে একেবারে অসাড় হয়ে থাকেন এউরিপিদেস।

মারে সম্পর্কে তাঁর এতদূর ধিক্কার সংগত কিনা, সেটা অবশ্য এখানে আমাদের বিবেচ্য নয়। বিশেষত, একথা তো মনে রাখতেই হয় যে ছন্দ আর মিল বজায় রেখে অনুবাদ করতে গেলে অনুবাদক একধরনের বিপন্নতার মুখোমুখি হবেনই, আর ওই এক stand শব্দের টানই হয়তো তাঁর 'হাত'-এর ওপর

ভাঙাচোরা জীবনপাত্র পর্যন্ত তুলে দিয়ে যাবে। তাছাড়া, আমরা যারা গ্রীক ভাষা জানি না, আমরা খুব নিশ্চিত ভাবে বলতেও পারি না যে বাড়তি কথার দায় এড়িয়ে ই. পি. কোলরিজের গদ্য-অনুবাদই আমাদের অনেক বেশি মূলের স্বাদ এনে দিচ্ছে। কিন্তু এসব হলো ভিন্ন তর্ক। আমাদের কাছে আপাতত এলিয়টের এই ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা কেবল এইটুকু : যদি কেউ এলিয়ট অনুবাদ করতে চান, কথাগুলি তাঁর কতটা মনে রাখা উচিত। কারও কবিতা অনুবাদ করতে গেলে তাঁর কাব্যাদর্শের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনুবাদ-আদর্শও কি আমাদের বিবেচনাযোগ্য হবে ? বাংলায় এলিয়ট নিয়ে যে-কোনো ভাবনার সূত্রে একেবারে প্রথমেই যে-বিষ্ণু দে-র নাম আমাদের মনে পড়ে, সেই বিষ্ণু দে কি তাঁর অনুবাদে মানতে চাইবেন এলিয়টের ওই নীতি ?

২

ধরা যাক, 'সিমেয়নের গান' (মূলে কিন্তু A Song *for* Simeon) নামের কবিতাটি। এ কবিতায় বিষ্ণু দে যখন লেখেন :

> বিদেশি চোখের থেকে অনাত্মীয় হনন-উদ্যত
> বিদেশির তরবারি-রোষ থেকে আশাহীন
> তারা সব পালাবে যখন—

তখন মনে হতে পারে, আমাদের এই কবি গিলবার্ট মারের চেয়ে একটু বেশিই করছেন। এলিয়টের কাছে কি এর সমর্থন পাওয়া যেত বলে মনে হয় ? এই তিনটি লাইনের মূল তো ছিল একটিমাত্র ইংরেজি লাইন : 'Fleeing from the foreign faces and the foreign swords'। 'অনাত্মীয় হনন-উদ্যত' আর 'রোষ থেকে আশাহীন' অংশগুলি কিছু নিষ্প্রয়োজন বিস্তার নিয়ে এসে এলিয়টের সংহতিকে খানিকটা দূরেই ঠেলে দিল বলে ভয় হয়। এমনও নয় যে মিলের কোনো বাড়তি দাবি ছিল এখানে। মূল কবিতারও এই বিশেষ অংশে মিলের প্রয়োগ ছিল না, বিষ্ণু দে-ও আনেননি কোনো মিল। কেন তবে হঠাৎ এই প্রসারণ ? তার স্পষ্ট কোনো উত্তর পাওয়া শক্ত। উত্তর পাওয়া শক্ত যে অনুবাদে এই দ্বিতীয় স্তবকটির মাঝখানে 'তবু প্রশ্ন প্রাণে'র মতো একটি অবান্তর লাইনও কেন-বা হঠাৎ ঢুকে যায়।

মারে বিষয়ে এলিয়ট যেমন বলেন, বিষ্ণু দে বিষয়েও তেমনি বলা যায় যে

এ-রকম অকারণ সম্প্রসারণের অভিজ্ঞতা এই একটিমাত্র নয়, মাঝেমাঝেই ঘটবে এ-রকম। 'দি হলো মেন'-এর পঞ্চম ভাগ যে-চারটি লাইনে শুরু :

> *Here we go round the prickly pear*
> *Prickly pear prickly pear*
> *Here we go round the prickly pear*
> *At five o'clock in the morning*

তার মধ্যে যে-পোল-নাচ বা যৌনতার যে অনুষঙ্গ কেউ কেউ দেখতে পান, তাকে অনুবাদের মধ্যে সঞ্চারিত করা নিশ্চয় সহজ নয়। বড়ো জোর, 'ইকড়িমিকড়ি চামচিকড়ি' দিয়ে এই ছেলেভুলোনো ছড়ার একটা ধ্বনিগত সামীপ্য তৈরি হতে পারে। সেটুকুই যদি করতে চান কেউ, তবে এর অনুবাদের 'ইকড়িমিকড়ি চামচিকড়ি কাঁকড়ার দল চলে' পর্যন্ত একরকম বোঝা যায়। কিন্তু তারপর তো কেবল এই শব্দগুলিরই আবর্তনবিবর্তন ঘটবার কথা ? অথচ আমরা দেখতে পাই, দেয়ালে মাকড়সা আর চামচিকেদের চিমসে পাখা মেলে দেবার মতো অনেক কাণ্ডই ঘটতে থাকে চারের বদলে আটটি লাইনে, আর 'সকালবেলায় পাঁচটার সময়' কথাটুকু হয়ে দাঁড়ায় 'ষ্যাওড়াকাঁটায় ভোর চারটেয় ছেলেরা সব খেলে'। ছেলেদের খেলাধুলোর এই খবরটা বাহুল্য তো বটেই, এমনকী এর ফলে অংশটির ঈপ্সিত কামনাপ্রতীকটাও যেন একটু চাপা পড়ে যায়।

কিংবা ধরা যাক 'গেরোন্‌শন্‌' অনুবাদের একেবারে শেষ লাইনটি, যেখানে 'আমারও হৃদয়' শব্দদুটির উৎসও খুঁজে পাই না। এলিয়ট তো শেষ করেছিলেন এই বলে যে

> Tenants of the house,
> Thoughts of a dry brain in a dry season.

এ দুটি লাইনের সম্পূর্ণ প্রতিরূপ তৈরি করবার পরও বিষ্ণু দে যখন তৃতীয় একটি লাইনে 'আমারও হৃদয়' বসিয়ে দেন, তখন অন্য কথাগুলির সঙ্গে এই হৃদয়ের অন্বয়টা ভেবে ওঠাও বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। কিংবা এর ঠিক আগে 'And an old man driven by the Trades / To a sleepy Corner' লাইনটির জন্য 'পুবালি হাওয়া' যদি-বা বোঝা যায়, ঘুমন্ত কোণের পরেও 'ঝিমাই একলা' বলবার দরকার হবে কেন, তার কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। 'I was neither at the hot gates'-এর মতো ছোটো একটি বাক্যের জন্য অনুবাদে কেন দরকার

হবে 'আশ্রমে আমি তো কোনো খাদির খামারে হাঁকিনিকো দর' ? 'জানি অব দি মেজাই'-এর 'Birth or Death'-টুকুকেই-বা কেন করতে হবে 'সে কি জন্ম না মরণের তীর্থে ?' 'Were we led all the way for / Birth or Death ?'-এর মধ্যে তীর্থ-সম্ভাবনা তো ছিল না কোথাও। রবীন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেছিলেন 'এত দূরে যে আমাদের টেনে নিয়েছিল / সে কি জন্মের সন্ধানে না কি মৃত্যুর ?' আর বিষ্ণু দে লিখছেন, 'এতখানি পথ চালিত হলুম আমরা যে / সে কি জন্ম না মরণের তীর্থে ?' 'অ্যাশ ওয়েন্‌স্‌ডে' কবিতার প্রথম পর্বে 'The vanished power of the usual reign' অনুবাদে হয়ে উঠল 'মামুলি যুগান্ত টানি প্রত্যহ গতস্য শোচনার'। কোন্ উৎস থেকে এল এর শেষ তিনটি শব্দ ? 'ভ্যানিশ্‌ট্' তো 'অন্ত'র মধ্যেই আছে, তাহলে শুধু 'পাওয়ার'-এর জন্যই কি 'প্রত্যহের গতস্য শোচনা' ? আবার ওই কবিতারই শেষ পর্বে 'Suffer us not to mock ourselves with falsehood'-এর বাংলা করেন বিষ্ণু দে 'অসতো মা সদ্‌গময় মিথ্যায় করি না যেন আত্মপরিহাস'। পরিহাসটাকে বোঝাবার জন্য তাহলে একেবারে 'অসতো মা সদ্‌গময়'র মতো একটা শ্লোকাংশ পর্যন্ত দরকার হলো ! এর অল্প পরেই 'সর্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য' দেখেও একটু ধন্দ লাগে, তবে বুঝতে পারি যে 'Our peace is in his will'-এরই ভারতীয়করণ ওটা, যে-রকম ভারতীয়করণে 'And let my cry come unto Thee'-র অনুবাদে বাড়তি একটি 'চরণ'-শব্দ এসে যায় : 'আমার ক্রন্দন পাক তোমার চরণ'।

৩

এইখান থেকেই উঠে আসে আরো বড়ো একটা সমস্যা, দেশীয়করণের সমস্যা। অনুবাদের আদর্শ হিসেবে এলিয়ট যখন অতীতকে অতীত রেখেই বর্তমানতুল্য করে তুলবার কথা বলেন, তখন তিনি কালের দিক থেকে ভাবেন। কথাটাকে হয়তো ওইরকমই আবার ভাবা যায় স্থানেরও দিক থেকে। যে-সংস্কৃতি যে-পরিবেশের মধ্যে জেগে উঠছে কোনো-একটি বিদেশি কবিতা, আমাদের কাছে তা সম্পূর্ণ পরিচিত বা সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক না-ও লাগতে পারে কখনো-কখনো। তখন কি আদর্শ হিসেবে আমরা এইরকমই ভাবব যে বিদেশকে বিদেশ রেখেই তাকে দেশতুল্য করে তুলতে হবে, তাকে দিতে হবে দেশীয় কোনো প্রাসঙ্গিকতা ? বিষ্ণু দে এ বিষয়ে স্পষ্ট একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই এগিয়েছিলেন বলে বোঝা যায়। এলিয়টের কবিতার মধ্যে তিনি সমকালীন ভারতের রূপকে খুঁজতে চেয়েছিলেন,

তাঁর মনে হয়েছিল যে, 'প্রতীকী রীতির নিহিত স্বাধীনতার বশেই "রাজর্ষিদের যাত্রা"র মতো ক্রিষ্টিয়ান কবিতা গান্ধীজির দ্বিতীয় আন্দোলনের স্মৃতিতে অনুবাদ-সম্ভাব্যতা পায়, "কোরিওলান" পায় ইন্‌টেরিম সরকারের কালে, "গেরোন্‌শন্" হঠাৎ এসে যায় অবলম্বন-অনুবাদের মিশে যাওয়া গোধূলিতে যখন কলকাতায় উন্মাদ হত্যার বিরুদ্ধে গান্ধীজি অভিযান করছেন অনশনে এবং ছেলেমেয়েরা প্রাণ দিয়ে শোভাযাত্রায়।'

দাঙ্গার বিরুদ্ধে গান্ধীজির অনশনের বা ছেলেমেয়েদের প্রাণ দেবার কথাটা 'গেরোন্‌শন্' থেকে কীভাবে মনে পড়বে, সেকথা খুব স্পষ্ট না লাগলেও, এটা বোঝা যায় যে প্রতীকী কবিতার 'নিহিত স্বাধীনতা'য় কোনো কবিতাকে নানা তাৎপর্যে আত্মসাৎ করা সম্ভব। বিশেষ কোনো ঘটনা বা চরিত্রের সঙ্গে নিশ্চয় মিলিয়ে নেওয়া যায় এমন-সব কবিতা, যার কোনো যোগই ছিল না সেই ঘটনা বা চরিত্রের সঙ্গে। গান্ধীজির মৃত্যুর পর কারো কারো মনে পড়তেও পারে রবীন্দ্রনাথের 'শিশু-তীর্থ' কবিতাটির কথা, সেই পটভূমি নিয়ে কবিতাটিকে ভাবতে ইচ্ছে হতে পারে কারো, এমনকী গান্ধী-বিষয়ক রবীন্দ্ররচনার সংকলন করতে গিয়ে কেউ ছেপেও দিতে পারেন 'শিশুতীর্থ'র কিছু অংশ, 'মহাত্মা গান্ধী' বইটির প্রবেশক হিসেবে যেমন ছেপেছেন বিশ্বভারতীর সংকলক। কিন্তু সেই প্রতীককে স্পষ্টতর বা গ্রাহ্য-তর করবার জন্য কেউ নিশ্চয় পালটেও দিতে পারেন না তার পাঠ, মূল কবিতার ব্যাপারে সে তো কখনোই সম্ভব নয়। কিন্তু অনুবাদের বেলা ? দেশীয় সংস্কৃতির বার্তাবহ করে তুলবার জন্য মূলের পুরাণকে বা আচারকে পালটে নিয়ে তাকে কি আমরা অনায়াস দেশীয়করণের দিকে পৌঁছে দিতে পারি ?

ছটি পর্বে বিন্যস্ত 'অ্যাশ ওয়েন্‌স্‌ডে' নামের দীর্ঘ কবিতাটি যখন অনুবাদ করেন বিষ্ণু দে, তখন আমাদের কাছে সেটি এসে পৌঁছয় 'চড়কের গান' নাম নিয়ে। প্রশ্ন শুরু হয় এই নামটি থেকেই। 'অ্যাশ ওয়েন্‌স্‌ডে' থেকে 'চড়কের গান' ? যুক্তি নিশ্চয় এই হবে যে, আমাদের চেতনায় 'অ্যাশ ওয়েন্‌স্‌ডে' কোনো ছবি বা অনুষঙ্গ আনবে না, আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক করে তুলবার জন্য তাই আমাদেরই নিজস্ব কোনো লোকাচার বা ধর্মাচার চাই। কিন্তু এ-আচারে ও-আচারে ঠিক মেলানো যাবে কেমন করে ? খ্রিষ্টীয় চেতনায় বিশেষ এই অনুষ্ঠান হলো Lent-এর[১] প্রথম

১ খ্রীষ্টীয় পুনরুত্থানের বার্ষিকী উদ্‌যাপন হলো ঈস্টার। তার ঠিক আগের চল্লিশ দিন জুড়ে এই লেন্ট-এর পর্ব, যেন অনুশোচনার পর্ব। এই পর্বেরই একেবারে প্রথম দিনটি হলো অ্যাশ ওয়েন্‌স্‌ডে।

দিনটিকে নিয়ে, ধর্মপ্রাণ খ্রিষ্টানের পক্ষে সে-দিন হলো কান্নার, অনুতাপের, অনশনের : বিগত সমস্ত পাপের স্খালন করে ইহমুখিতা থেকে পরমের দিকে যেন ফিরিয়ে নেন ঈশ্বর, এই প্রার্থনার দিন সেটা। অন্যদিকে, চড়ক হলো মূলত শিবের পূজা, এর অনুষ্ঠানে আছে একরকম উদ্দামতা, কিছু-বা যৌনতার অনুষঙ্গে জড়ানো। সেই চড়কছবিতে এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে এলিয়টের খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের আবহ একেবারে অবান্তর হয়ে যায়, অথচ কবিতাটির অন্তর্গত সারাৎসারকে ছুঁতে গেলে সে-আবহকে কখনো আমরা ছাড়তেও পারি না। শরীর আর আত্মার দ্বন্দ্বের ভাবনা কিংবা পরমের সঙ্গে মিলিত হবার ভাবনা হয়তো যে-কোনো ধর্মসংস্কারের মধ্যেই এনে দেওয়া যায়, কিন্তু সে-ভাবনার পথটা তো তৈরি হবে সুচিহ্নিত কোনো আবেগে আর তার প্রতিমায়। সেই প্রতিমা বা আবেগের উচ্চারণে মূল কবিতার যে খ্রিষ্টীয়তা, তাকে বর্জন করা যাবে কেমন করে? অনুবাদের শুরুতে যখন পাই

যেহেতু রাখি না আশা ফেরবার আর
যেহেতু রাখি না আশা
যেহেতু রাখি না আশা ফেরবার

তখন কোনো সমস্যা হয় না, কেননা, এর মধ্যে বাইবেলের 'return to me with all your hearts, and with fasting and with weeping and with wailing' (জোয়েল ২/১২) কথাটির প্রচ্ছন্ন ইশারা থাকলেও মূলত এ হলো কাভালকান্তি-র[২] প্রেমকাতরতার লাইন, নির্বাসন থেকে আর ফিরতে পারবেন না ভেবে প্রেমিকাকে তাঁর হতাশা জানাচ্ছেন কবি। সমস্যা নেই তার ঠিক পরেও, কেননা 'Desiring this man's gift and that man's scope' লাইনের gift কথাটি পালটে তাকে art করে নিলে সেটা একেবারেই শেক্সপীয়রের ২৯ নম্বর সনেটের কথা হয়ে দাঁড়ায়, আর সেও তো ছিল এক প্রেমেরই কবিতা। প্রেমের রূপক দিয়ে ধর্মীয় চেতনার দিকে এগোবার এই ব্যবহৃত পদ্ধতিকে সহজেই আত্মীকরণ করা

২ কাভালকান্তির যেসব কবিতার অনুবাদ করেছিলেন এজরা পাউণ্ড, এটিও তার অন্তর্গত। পাউণ্ডের অনুবাদে এর সূচনাটি হলো :

Because no hope is left me, Ballateta
Of return to Tuscany,...

বিরহথিন্ন ভাবে তাঁর 'Lady of all grace'-এর কাছে বেদনা জানাবার দূতী পাঠাচ্ছেন কবি।

সম্ভব। কিন্তু এখানেও, অনুবাদকে নিরপেক্ষ না রেখে বিষ্ণু দে লাইনটিকে করে দেন 'এর ইন্দ্রপ্রস্থ চেয়ে, চেয়ে ওর পাশা' বা তার ঠিক পরেই 'aged eagle'-কে 'বৃদ্ধ জটায়ু'তে নিয়ে আসেন তিনি। রামায়ণে-মহাভারতে মিলেমিশে গিয়ে একেবারে ভিন্ন একটা কাঠামো গড়ে উঠতে থাকে তখন, খ্রিষ্টীয় জগতের চেয়ে খুবই সুদূর হয়ে যায় সেটা। অথচ কবিতার অন্য লাইনগুলিতে খ্রিষ্টীয় অনুষঙ্গ এতটাই ওতপ্রোত জড়ানো যে তাকে গণ্য না করে এর পূর্ণ তাৎপর্য পাওয়াই শক্ত। স্পেণ্ডার একটা খবর জানিয়েছেন যে এলিয়টকে একজন শ্রোতা জিজ্ঞেস করেছিলেন, কবিতার দ্বিতীয় পর্বের প্রথমেই 'Lady, three white leopards sat under a juniper-tree' লাইনটার মানে কী। এলিয়ট না কি উত্তরে বলেছিলেন যে ওর মানে হলো 'Lady, three white leopards sat under a juniper-tree'! কবিদের কাছে তাঁদের কবিতার মানে খুঁজতে গেলে এ-রকম অনেক দুর্ভোগ ঘটেই থাকে, কিন্তু তবু এও সত্যি যে ওই লাইন থেকে শুরু করে 'অ্যাশ ওয়েন্‌স্‌ডে' কবিতায় যে 'লেডি' বা 'লেডি অব সায়লেন্সেস' আসেন, কিংবা তার পরে আসেন মেরি, একাকার হয়ে আসেন 'ব্লেসেড সিস্টার, হোলি মাদার'—এ-কবিতার সামগ্রিক বোধের জন্য তাঁদের ভূমিকা তো আমাদের বুঝতেই হবে। এই যে নারীরা দেখা দেন, এঁদের মধ্যে একজন শুধু ইহজাগতিক, একজন ইহজাগতিক হয়েও দৈবতার প্রদর্শিকা, আর একজন সেই পরম দৈবতা, ভার্জিন মেরি. পরম সত্তাকে জেনেছেন তিনি। চড়কের গানের মধ্য দিয়ে বিষ্ণু দে এই নারীদের ধরবেন কীভাবে?

আমরা দেখি, উদ্ধৃত ওই লাইনটি বিষ্ণু দে-র হাতে হয়ে দাঁড়ায় 'হে ভদ্রা, জয়িত্রী গাছতলায় তিনটি শ্বেত চিতা।' লেডি তবে ভদ্রা। অল্প পরেই লেডি অব সায়লেন্সেস যে হবেন 'নৈঃশব্দ্যের দেবী' সেটা অবশ্য তত বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা হলো, 'She honours the Virgin in meditation'-এর বাংলা দাঁড়াল 'দেবকীমাতাকে ধ্যানে করেন সম্মান'। ভার্জিন তাহলে দেবকীমাতা? এদিকে, কবিতাটির চতুর্থ পর্বে পৌঁছে যখন পাই 'Going in white and blue, in Mary's colour' তখন তার বাংলা কিন্তু 'কে ও যায় শুভ্রে নীলে শ্রীরাধার নীলাম্বরে'। এরপর, রাধারই অনুষঙ্গে sand হয়ে যায় 'কালিন্দীর বালুতীর', eternal dolour হয় 'চিরন্তন মাথুর', between the rocks 'গোবর্ধনগিরির মাঝারে', slender yew trees 'তনু তমাল উদ্যান', exile হয়ে যায় 'দ্বারকায় নির্বাসন পালা', আর দান্তে থেকে নেওয়া 'Sovegna vos' (মনে রেখো) শব্দ-

দুটির জন্য এসে যায় একেবারে 'শুন বড়ু কহে স্মরিও আহ্মাহে'র মতো গোটা একটা কৃষ্ণকীর্তনীয় লাইন। রাধাকৃষ্ণজগৎ থেকে এখানে পরপর যে অনুরূপগুলি চলে এল, তার একটা যুক্তিক্রম বোঝা যায়। কিন্তু একাংশে ভাজিন যদি দেবকীমাতা, অন্য অংশে মেরি তবে শ্রীরাধিকা হবেন কীভাবে, এই ধাঁধাটা তবু থেকে যায়। এটা অবশ্য ঠিক যে 'ভাজিন ইন মেডিটেশন'-এর সঙ্গে মেরির সূক্ষ্ম একটা প্রভেদই রেখেছেন এলিয়ট, ডিভাইন কমেডিতে বেয়াত্রিচের মতোই যেন এই ভাজিন, কবিতার শেষ প্রান্তে গিয়ে এই ভাজিন আর মেরি হয়ে যাবেন একাকার। যদি তা না-ও হতেন তাহলেও দেবকীমাতা আর শ্রীরাধার সম্পর্ককে এ-দুয়ের সমান্তরাল হিসেবে ভাবা একটু শক্তই। এইটেই হলো সমস্যা, রাধাই হোন আর দেবকীই হোন, মেরির কাছে প্রযোজ্য প্রার্থনাগুলির সঙ্গে তাঁদের মেলানো যাবে কেমন করে, কোন্ সাধনাস্বরূপকেই-বা পাওয়া যাবে দেবকী নামের সূত্রে। আর তারও পরে, এই শেষ কথাটা ওঠে, যে-কবিতার নাম 'চড়কের গান', তার থেকে কেমন-ভাবেই-বা আমরা পৌঁছতে পারব একেবারে রাধাকৃষ্ণদ্বারকাকালিন্দীর বৈষ্ণবীয় উপকূলে?

চড়ক শিবেরই পূজা; তবে পণ্ডিতেরা বলেন যে, লোকাচারের অভ্যাসে সে-পূজায় দেবতাদের বৈচিত্র্যও হতে পারে অনেকসময়ে। কখনো পূজালক্ষ্যে থাকেন দেবী নীলা নীলাবতী নীলচণ্ডিকা, কখনো-বা নীল অথবা গম্ভীর নামের দেবতা, কারও কাছে-বা দেবতার নাম হাজরা, শ্বেতবর্ণ চতুর্ভুজ দিগম্বর। প্রধানত নিচু-শ্রেণীর মানুষদের এই দেবোৎসবে ধর্মবিশ্বাস বা আচার-আচরণের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের তত্ত্বজগৎকে জড়িয়ে নেওয়া তো বড়ো সহজ বলে মনে হয় না। ঠিক তেমনি শক্ত, রাধাকৃষ্ণের এই পট থেকে 'বাক্' এবং 'অক্ষর'-এর ধারণা পর্যন্ত পৌঁছনো।

'অ্যাশ ওয়েন্‌স্ডে'র গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চম পর্ব শুরু হয়েছে এই কথায়: If the lost word is lost, if the spent word is spent' আর তার বাংলা করেছেন বিষ্ণু দে 'যদি লুপ্ত বাক্ লুপ্ত হয়, যদি নিঃশেষ অক্ষর হয় শেষ'। গোটা এই পঞ্চম পর্ব দাঁড়িয়ে আছে word আর Word-এর পারস্পরিক সম্পর্কবিন্যাসের ওপর। Word আর Word, আর সেই একইসঙ্গে world আর world শব্দগুলি নিয়ে একটা গূঢ় রকমের খেলা আছে এখানে।[৩] এর একটা হলো কেন্দ্র, এলিয়টের

৩ এখানে স্মরণীয় যে 'জার্নি অব দি মেজাই'-এর মধ্যেও এলিয়ট Birth আর Death শব্দ-দুটিকে এইরকমই ভিন্নে ব্যবহার করেন, কখনো b আর d দিয়ে, কখনো B আর D; কিন্তু বিষ্ণু দে তাঁর অনুবাদে সে-প্রভেদটাকে গণ্য করেননি।

still centre, আর অন্যটা তার পাশে ঘূর্ণায়মান পরিধি। আমাদের জীবন, তার বিচ্ছিন্নতার তার অচিরতার তার অস্থিরতার আর্তি নিয়ে উচ্চারণ খুঁজে বেড়াচ্ছে, কথা খুঁজে বেড়াচ্ছে, সাজিয়ে চলছে কথার ওপর কথা, কিংবা প্রার্থনার ওপর প্রার্থনা, আর একেবারে গহন কোনো কেন্দ্রে আছে এক অক্ষয় অব্যয় Word আর World। কোথায় পাওয়া যাবে সেই প্রার্থনার বাণী, কোথায় ধ্বনিত হবে ভালোবাসার বাণী? এই সমুদ্রে এই দ্বীপে এই জনপদে, মরুতে বা বর্ষণেভরা জমিতে, কোনোখানেই নেই তার যোগ্য কোনো নীরবতার আশ্রয়। কোথায় দেখা যাবে সেই মুখ, কোথায় পাওয়া যাবে মহাকরুণা, এই কাতরতা নিয়ে এ-কবিতাংশে ঘূর্ণিত হচ্ছে ওই শব্দগুলি। বিষ্ণু দে অবশ্য 'Against the World the unstilled world still whirled'-এর বাংলা করেন 'বাকের উপরে সেই ক্ষান্তিহীন বিশ্ব তখনও ঘূর্ণায়াবেশে'। ক্ষান্তিহীন না অস্থির? কিন্তু সেকথা যদি ছেড়েও দিই, মনে হয় এখানে কিছু-বা অন্যমনস্কতাই ঘটে গেল, অন্যান্য লাইনে তো দেখি Word-এরই বাংলা হয়েছে বাক্। World-ও তাই? অন্যমনস্কতা কি প্রথম লাইনটিতেও ছিল? এলিয়ট lost word আর spent word-এর মধ্যে শব্দগত কোনো স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনা রাখেননি, দুটোতেই ব্যবহার করেছেন w, কোনো-টিতেই W নয়। সেক্ষেত্রে, অনুবাদে কি বাক্ আর অক্ষরের কোনো ভিন্নতা এখানে প্রত্যাশিত ছিল? আর, অন্য লাইনগুলিতে শব্দদুটির মধ্যে প্রভেদ যখন দেখাতেই হবে, তখন কোন্ শব্দটিকে বলব কোন্‌টির উপযুক্ত? word-ই কি অক্ষর, আর Word বাক্? না কি উল্‌টোটাই হওয়া সংগত? অক্ষর তো অনশ্বর বা নিত্য, তাকেই বলা হয় স্থির বা ধ্রুব, মহাভারতে তো আছে 'ভগবানক্ষরঃ প্রভুঃ'। কিন্তু বিষ্ণু দে-র অনুবাদে 'Still is the unspoken word, the Word unheard' হয়ে দাঁড়ায় 'তবু স্থির অভাষিত সে অক্ষর, অশ্রুত সে বাক্', অর্থাৎ তিনি উল্‌টোভাবেই নিতে চাইলেন শব্দদুটিকে। উপরন্তু, এ লাইনে 'স্টিল' শব্দের জন্য এল দুটি ভিন্নার্থক ব্যবহার: 'তবু' আর 'স্থির'। এর মধ্যে কোন্‌টাকে বলব এলিয়টের অভিপ্রেত?

অন্যমনস্কতা হয়তো আরো আছে। 'Where shall the word be found, where will the word/Resound ?' অনুবাদে হলো 'কোথায় সে বাক্ লভ্য, কোথা সে অক্ষর / প্রতিরব্য ?' এখানে ফাউণ্ড আর রিজাউণ্ড-এর ধরনে অনুবাদক যে লভ্য আর প্রতিরব্য-র অন্তমিল পর্যন্ত এনে দিলেন সেটা আমাদের নজর এড়ায় না বটে, কিন্তু বাক্ আর অক্ষরের কোনো স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ যে মূল লাইনটিতে

ছিল না সেটাও আমরা লক্ষ করি। উপান্ত্য স্তবকে আবার, 'Hour and hour, word and word, power and power, those who wait'-কে বিষ্ণু দে করেন 'প্রহরে প্রহরে, কথায় কথায়, ক্ষমতায় ক্ষমতায়, প্রতীক্ষাই করে যারা'। এবার তাহলে ওয়ার্ড হলো 'কথা'? যেমন তৃতীয় পর্বের শেষ লাইনে 'but speak the word only' হয়েছিল 'তবুও শোনাও তব গীতা'? কখনো কথা কখনো গীতা কখনো অক্ষর কখনো বাক্ দিয়ে এলিয়টের প্রত্যাশিত সম্পর্কসংঘর্ষটিকে তাহলে কিছুটা বিশৃঙ্খল করে দেওয়া হলো বলেই মনে হয়।

8

গীতা শব্দটির সূত্র ধরে আমরা ভিন্ন একটি কবিতাতেও সরে যেতে পারি: 'গেরোন্‌শন্' বা বিষ্ণু দে-র 'জরায়ণ'। সেখানে অবশ্য 'The word within a word' হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'শব্দের মাঝারে শব্দ', অক্ষর নয়, কথাও নয়, গীতাও নয়। অন্যদিকে, খ্রিষ্ট আবির্ভাবের যে ছবি এখানে আনা হয়েছে 'Came Christ the tiger', বিষ্ণু দে-র হাতে তা কৃষ্ণজন্মের রূপ নিয়ে 'এল কৃষ্ণ নরসিংহ'। এল, কিন্তু ওইটুকুতেই তৃপ্ত হলো না অনুবাদ, দেখা দিল ব্যাখ্যামূলক সম্পূর্ণ বাড়তি একটা লাইন 'পাঞ্চজন্যে কেশরীহুংকারে, বংশীরবে'। এইভাবে হয়তো মথুরার কৃষ্ণ আর বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে একত্র ধরা হলো নৃসিংহ অবতারেরও সঙ্গে, আর তারই টানে দরকার হলো 'ডার্কনেস'-কে একেবারে 'কাংস্য অন্ধকার' বানিয়ে তোলা। এলিয়ট লিখেছিলেন: Signs are taken for wonders, 'We would see a sign!' এলিয়টের প্রিয় ল্যান্সলট অ্যান্‌ড্রুজ থেকে পাওয়া এই উচ্চারণ বাংলায় হলো 'আবির্ভাব শেষটা দাঁড়ায় এক আশ্চর্য ঘটনা। / আমরা সবাই চাই আবির্ভাব।' 'See a sign'-কে 'সবাই চাই আবির্ভাব' দিয়ে ধরা গেছে বলে যদি ভাবতেনই বিষ্ণু দে, তাহলে এখানেও আবার পরবর্তী একটা যোজনার দরকার হতো না, নাটকীয় ভাবে বলতে হতো না 'দর্শন, দর্শন, জন্মাষ্টমী!'

ভিন্ন সংস্কৃতির আধারে বয়ে নিয়ে আসবার বিপন্নতা এসব সময়ে আমরা টের পাই। আর সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্ন ওঠে যে সত্যিই এর কোনো দরকার ছিল কি না। অনুবাদ যে প্রায় ব্যাখ্যার দিকে গড়িয়ে যায়, আপত্তিটা শুধু সেইখানেই নয়। আপত্তি এখানেও যে একেবারেই দুই ভিন্ন ধর্মবোধের বিপর্যয় ঘটতে থাকে কবিতার শরীরের মধ্যে, কোনো একটা দিকও তার স্পষ্ট পরিচ্ছন্নতা নিয়ে দাঁড়াতে

পারে না। ইওরোপ-আমেরিকার জাতীয় জীবনের দৈনন্দিনতায় খ্রিষ্টীয় চেতনা যেভাবে তার চিহ্ন রেখে যায়, আমাদের সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জগতে কৃষ্ণ-বোধ তো তেমন-কোনো সর্বাঙ্গকতা নিয়ে আসে না। ভাববার আছে আরো একটা কথা। আমরা তো জানি যে এলিয়ট নিজেই কখনো কখনো কৃষ্ণকে বা গীতাকে বা উপনিষদকে নিয়ে আসেন তাঁর ব্যবহারে, 'দি ড্রাই স্যালোয়েজেস' কবিতায় যেমন আছে 'I sometimes wonder if that is what Krishna meant' কিংবা 'So Krishna, as when he admonished Arjuna'। অনুবাদের যে-কোনো জায়গাতেই কৃষ্ণকে—কিংবা ভারতীয় অন্য কোনো ধর্মানুষঙ্গকে—প্রয়োগ করবার বিপদ হচ্ছে এই যে, কবির অভিপ্রায়-বিষয়ে পাঠক সেখানে একটু বিভ্রান্ত বোধ করতে পারেন, তিনি প্রশ্ন তুলতে পারেন, কোন্ কৃষ্ণ এলিয়টের নিজস্ব আর কোন্ কৃষ্ণ-বা অনুবাদকের উপহার। এ বিভ্রম কাটাবার একটা সরল পথ হয়তো মূল কবিতাটি সঙ্গে সঙ্গে পড়ে-নেওয়া। কিন্তু মূল কবিতা যদি সঙ্গে সঙ্গে পড়বেনই কেউ (বা, অনেকসময়ে বলা যায়, যদি পড়তে পারবেনই কেউ) তাহলে অনুবাদকবিতার আর তাৎপর্য রইল কোথায়? পাঠকের দিক থেকে ভাবলে অনুবাদ তো একটা কবিতাকে নিজস্ব ভাবে পাবার স্বাদ, সে তো কোনো গবেষণাশ্রয় নয়!

শুধু ধর্মানুষঙ্গই নয়, স্থান বা কালের অনুষঙ্গকেও পালটে দেন বিষ্ণু দে, স্বভাবতই। খ্রীষ্টের জায়গায় যদি কৃষ্ণই চলে এলেন, তাহলে 'In depraved May, dogwood and chestnut, flowering judas'-কে 'পচা ভাদ্রে, কচুশাক, কালোজাম, মোহিনী যুতুরা' করে তুলতে হবে, সে একরকম বোঝা যায়। বোঝা যায় যে তখন ব্রাসেল্‌স্ আর লণ্ডনকে হতে হবে কানপুর কলকাতা, হাকাগাওয়ার জন্য আসবেন কালচাঁদ প্রাণোলিয়া, আর এরই স্রোতে 'ইন দি হল' হয়ে দাঁড়াবে একবারে 'বেলেঘাটা হলের চৌকাঠে'। হলঘরের দুয়োরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন ফ্রাউলিন ফন কুল্‌প্, তিনি যে হঠাৎ মিস্টার তরফদার হয়ে গেলেন তাও না হয় মেনে নিই আমরা। কিন্তু তাই বলে, 'গেরোন্‌শন্'-এর শুরুতেই 'in a dry month' কেন হবে 'ভিজে ভাদুরে বাদলে'? একবার dry-কে উলটে এইভাবে 'ভিজে' করে দিলে সবটারই অবশ্য বদল ঘটতে বাধ্য, তাই 'waiting for rain' হবে 'রৌদ্রের আশায়', 'in the warm rain' হবে 'পশ্চিমা রৌদ্রে', অন্তিমে 'Thoughts of a dry brain in a dry season' হবে 'এ ভরা বাদরে ভিজা মাথায় চিন্তারা'! শুকনোকে এইভাবে সিক্ত করে নেবার উদ্দেশ্য কি জন্মাষ্টমীর বৃষ্টিকালকে মনে করিয়ে দেওয়া? এলিয়ট অন্তত

খ্রিষ্টীয় কারণে ডিসেম্বরকে পটভূমি বলে ভাবেননি, তিনি 'depraved May'কে এনেছেন তাঁদের অপরাধস্মৃতির কাল হিসেবে, খ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হবার উত্তরকালীন স্মৃতি হিসেবে। না কি এই কালবদলের উদ্দেশ্য শুধু এইটে ধরিয়ে দেওয়া যে ওদেশের আর এদেশের ঋতু-অনুভব ভিন্ন? উদ্দেশ্য যাই হোক, কবিতাটির দিক থেকে এর ফল খুব ভালো হয়েছে বলে তো মনে হয় না। সম্পূর্ণ কবিতাটি জুড়ে একজন ব্যক্তির সূত্রে ইতিহাসের যে বন্ধ্যা ছবি দেখাতে চান কবি, যে হতাশা আর অথর্বতা, তারই ইশারা দেবার জন্য 'ড্রাই' কথাটার এত ব্যবহার এ-কবিতায়; স্টোনি রাবিশ, ড্রাই স্টোন, ড্রাই গ্র্যাস বা ড্রাই স্টেরাইল থাণ্ডার হয়ে পরে যা বারবার ফিরে আসবে 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর মধ্যে। বৃষ্টির আশায় বসে থাকা এক শুকনো সময়ের ছবি তো ওতপ্রোত হয়ে আছে 'গেরোন্‌শন্‌'-এ। তার বদলে একে 'ভাদ্বরে বাদলে' টেনে নিলে কী সুবিধে হবে? কবিতাটির সমগ্রতায় 'thoughts of a dry brain' আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু 'ভিজা মাথায় চিন্তারা' বলতে কী প্রতীক বহন করবে এই কবিতা? ড্রাই ব্রেইনের দাহ-অনুভব থেকেই তো এদেশেও কেউ একদিন বলতে পারবেন 'জল দাও আমার শিকড়ে'? এরই তো পটভূমিতে কেউ অপেক্ষা করে আছেন বৃষ্টিজলধারার জন্য, waiting for rain? সে-ঋতুকে কি উলটে নেওয়া যায় অনুবাদে?

সবসময়ে যে এ-রকম বদল করে উঠতে পারেন না বিষ্ণু দে, তারও দু-একটা নজির অবশ্য আছে। 'আনিমুলা' (জীবকণা') কবিতার অনুবাদে ঠিকই চলে আসে 'মহাবিশ্বকোষ কিংবা শব্দকল্পদ্রুমের আড়ালে'র মতো লাইন; সেখানে মূলটি ছিল মাত্র 'Behind the Encyclopaedia Britannica'। কিন্তু তার কয়েক লাইন পরেই বলতে হলো 'গীতিরিয়ে' 'বুদ্ঁা' আর 'ফ্লরে'র মতো কয়েকটি ব্যক্তিনাম। বিশ্বকোষ বা শব্দকল্পদ্রুমের সঙ্গে এ নামগুলির সংগতি আর রইল না। অথচ মজা এই যে, এই নামগুলির বেলাতেই বরং খানিকটা স্বাধীনতার সুযোগ ছিল, কেননা এর নেই কোনো ধর্মীয় অনুষঙ্গ। উৎসসন্ধানী কোনো সমালোচক যদিও অনুমান করেন, বুদ্ঁা নামটি উঠে এসেছে জয়েসের 'ইউলিসিস' থেকে, এলিয়ট নিজে কিন্তু বলেন এ-তিনটি নামই নিছক কাল্পনিক, 'So entirely imaginary that there is really no identification to be made'। গীতিরিয়ে আর বুদ্ঁার একজনকে তিনি এনেছেন যন্ত্রযুগের একজন সফল মানুষ হিসেবে, 'avid of speed and power', আর অন্যটিকে তিনি করতে চান বিশ্বযুদ্ধে নিহত কারো চিহ্নমাত্র, 'blown to pieces'। যে-কোনো নামেই হয়তো সেটা সম্ভব হতে পারত।

বলা বাহুল্য যে যুদ্ধ বা যন্ত্রযুগের এইসব সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আলাদাভাবে অনুবাদে ধরা পড়বার কথা নয়। এলিয়টের বৈদগ্ধ্যে বিপুলা পশ্চিমি সংস্কৃতির কোন্ টুকরো যে কখন এসে পৌঁছচ্ছে কবিতায়, তাও অনুবাদে বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। হয়তো এইটুকু মাত্র হতে পারত যে, অ্যান্‌ড্রুজ থেকে পাঁচ লাইন উদ্ধৃতি দিয়েই যে 'জার্নি অব দি মেজাই'-এর শুরু[৪], অনুবাদে সেই উদ্ধৃতিচিহ্নটুকু থাকতে পারত, পাঠক একটু সচেতন হতে পারতেন তাহলে। হয়তো এটুকুও দাবি করা যায়, কবিতার মধ্যে এলিয়ট যখন ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করেন বা এনে দেন অন্য কোনো উদ্ধৃতি, তারও একটি ইঙ্গিত থেকে যাবে অনুবাদে। 'মারিনা' কবিতার উপ-শিরোনাম হিসেবে যে কথাটুকু আছে তা যে ইংরেজি নয়, তা যে সেনেকা থেকে তুলে আনা হারকিউলিসের সবিস্ময় প্রশ্ন, 'এ কোন্ স্থান, কোন্ রাজ্য, পৃথিবীর কোন্ দেশ'-এর মতো অনুবাদ থেকে তা বুঝবার কোনো সুযোগ থাকে না আমাদের। 'দি হলো মেন'-এর গোড়ায় মাত্র 'বুড়ো মোড়লকে কানাকড়ি' বললে একথা বুঝবার কোনো সুযোগ থাকে না যে 'A Penny for the Old Guy' কথাটার মধ্যে ওদেশের পাঁচই নভেম্বরের 'গাই ফক্স ডে'-র একটা অনুষঙ্গ থেকে গেছে। প্রুফ্রকের ভিন্নভাষী প্রথম ছটি লাইনকে অবশ্য সাধুভাষায় সাজিয়ে দিয়ে বিষ্ণু দে একটা স্বাতন্ত্র্য দেবার চেষ্টা করেন, তবে সে-সাধুভাষা তো দেখি 'গেরোন্‌-শন্‌'-এরও সূচনাতেও, আর সেখানকার উদ্ধৃতি তো ছিল ইংরেজিতেই। বরং 'অ্যাশ ওয়েন্‌স্‌ডে'র 'Sovegna vos'-কে যখন 'শুন বড়ু কহে স্মরিও আহ্মাহে' করা হলো, তার একটা ভাষাগত যাথার্থ্য বোঝা যায়। এ লাইনটির অসুবিধে কেবল এর আতিশয্যটুকু, শুধু 'স্মরিও আহ্মাহে'ই হয়তো যথেষ্ট হতে পারত।

৫

মহাকাব্য-তুল্য এলিয়টের 'ফোর কোয়ার্টেট্‌স্' প্রকাশিত হবার পরই তাঁর সেই নতুন কবিতাগুচ্ছ নিয়ে স্বচ্ছ আলোচনা করেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, ১৯৩৪ সালেই

৪ ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের এই ধর্মাত্মা Lancelot Andrewes বিষয়ে এলিয়ট যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তাতেও ব্যবহৃত আছে এই লাইনগুলি: A cold coming they had of it at this time of the year, just the worst time of the year to take a journey, and specially a long journey in. The ways deep, the weather sharp, the days short, the sun farthest off, *in solstitio brumali*, 'the very dead of winter'। কয়েকটি শব্দের যে বদল বা বর্জন আছে 'জার্নি অব দি মেজাই'তে, সেটা সকলেই লক্ষ করতে পারবেন।

এলিয়টের ঐতিহ্যধারণার বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ, এমনকী তারও কবছর আগে 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে এলিয়টের নৈর্ব্যক্তিক ধারণাকে তিনি বুঝিয়েছিলেন দেশিবিদেশি উদাহরণ সাজিয়ে, সমর সেন তাঁর স্বল্প গদ্যে এলিয়টের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ ঋণের কথা বলেছিলেন তাঁর যৌবনেই, আধুনিক বাংলা কবিতার সামগ্রিক পরিমণ্ডলেই এইভাবে একদিন ছড়িয়ে ছিলেন এলিয়ট। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে সেই ছড়িয়ে থাকার উৎস হিসেবে আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল ছিলেন বিষ্ণু দে। তাঁর প্রবন্ধে চিঠিপত্রে কাব্যাদর্শে কবিতায় এবং সর্বোপরি তাঁর বহুল অনুবাদে, তিনিই আমাদের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে এলিয়টের মুখোমুখি করে দিয়েছেন, আমার মতো অনেকেরই হয়তো এলিয়ট-দীক্ষা ঘটতে পেরেছে শুধু তাঁরই হাত ধরে। আমাদের সমাজের শতধা বিচ্ছিন্নতা যে কীভাবে এলিয়টের কবিতায় রূপ পায়, কীভাবে তাঁর রাজনৈতিক আর ধর্ম-নৈতিক ভুল গোঁড়ামিকে সরিয়ে রেখেও তাঁর কবিতার সমকালীন স্বাদ পেতে পারি আমরা, বিষ্ণু দে তা কতবারই ব্যাখ্যা করে বলেছেন আমাদের। একদিকে রবীন্দ্রনাথ অন্যদিকে ব্রেখ্‌টকে রেখে আধুনিকতার সম্পূর্ণ মর্ম তিনি এলিয়টকে দিয়েই কেমন করে বোঝান, তাও আমরা দেখেছি। কিন্তু এসব কথা মনে রেখেও আজ বলতে হবে, এলিয়টের অনুবাদে বিষ্ণু দে যে আদর্শ প্রয়োগ করেন তা হয়তো শেষ পর্যন্ত সমর্থনযোগ্য থাকে না, মূল কবিকে হয়তো তা অনেকাংশে বিপন্নই করে। বিদেশের সংস্কৃতিকে দেশীয় ঐতিহ্যের রূপকের মধ্যে আনতে গিয়ে আমরা বিদেশের ঐতিহ্যকেও যথাযথ পাই না, দেশীয় ঐতিহ্যকেও হারাই। প্রতিরূপ আর অনুরূপ, এ দুয়ের মধ্যে অনিশ্চিত ভাবে দুলতে দুলতে অনুবাদ হয়ে দাঁড়ায় একেবারে ভিন্ন কোনো কবিতা। সেই অনুবাদ দিয়ে বিষ্ণু দে-র মন হয়তো আমরা কিছুটা চিনতে পারি, কিন্তু তা যে কতটুকু এলিয়ট, এই প্রশ্নটা তবু থেকেই যায়।

শুদ্ধিপত্র সংশোধন

পৃষ্ঠা ৮ ২৬ লাইন পড়তে হবে :

Word আর word, আর সেই একইসঙ্গে World আর world শব্দগুলি নিয়ে

সাক্ষী ডুমুর গাছ

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

বালক বয়সে আমার দাদামশায় গত হন। তা প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। সে পৃথিবী আজ রূপকথা। তার অলিগলি, কথাবার্তা, খাবারদাবার সবই এখন আবছা লাগে। তবে একটা জিনিস স্পষ্ট মনে করতে পারি।

দাদামশায়ের শ্রাদ্ধে মায়ের এক বোন এসেছিলেন দিল্লি থেকে। তিনি—সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলে জলের ঝাপটা দিয়ে আমার মুখ ধুইয়ে দিয়েছিলেন। এ জন্যে মনে আছে যে—মহিলার হাতের আঙুলগুলো ছিল যেমন সুন্দর, পুরুষ্ট—আর ছিল তেমনি কঠিন। যেন লোহার আঙুল দিয়ে তিনি আমাদের চোখে জলের ঝাপটা দিয়েছিলেন।

সেই মাসি বাবদে আমরা ছটি ভাই আর একটি বোন পাই। দেবেশদা আর খগেশদা। বোন হ'ল—লতিকাদি। তিনি তখন সবে শাড়ি ধরেছেন।

আমরা যে মফঃস্বলের ছেলে—সেখানে তখনো কথায় কথায় রুমাল, সেন্ট, পাউডার, সাবান বা কাজল দেখা যেত না।

দাদামশায়ের শ্রাদ্ধের পরের বছর সেই মাসিমা দিল্লি থেকে দুই ছেলে আর মেয়ে নিয়ে আমাদের বাড়ি গরমের ছুটি কাটাতে এলেন। সঙ্গে মেশোমশাই।

আমাদের শহরে আম বা মাছের তখন কোন দাম ছিল না। আমরা খুব আম খেতাম—মাছ খেতাম। পা ছড়িয়ে বসে গল্প হ'ত।

দেবেশদা দিল্লিতে হিন্দি ছবি দেখে একটা গান তুলেছিল। সেটাই গাইতো। ইয়ে না বাতা সেকুন্দা ম্যায়—। খুব সুর দিয়ে গাইতো। এখন জানি, গানটা হবে এরকম—ইয়া না বাতা সাকুন্দা ম্যায়। তার মানে—একথা আমি বলতে পারব না। কোনো নায়িকার গান হবে হয়তো।

দেবেশদার পরে লতিকাদি। তা সে লতিকাদি তখন ফার্স্ট ইয়ার আর্টসের ছাত্রী। দিল্লির রাইসিনা কলেজের। কথায় কথায় রুমাল, সেন্ট, পাউডার, সাবান, কাজল তার লেগেই থাকতো। আমি নিচু ক্লাশের বালক—দেবেশদার গানে আর লতিকাদির সুগন্ধীতে যাকে বলে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতাম।

লতিকাদির পর খগেশদা। সে আমায় গুলতি দিয়ে পাখি মারা শেখায়। একটা বুনো রাগ নিয়ে গুলতি হাতে খগেশদা আমাদের বাড়ির পেছনের বাগানে ঘুরে বেড়াতো। লক্ষ্য : কাঠবেড়ালি নয়তো ঘুঘুর বাসা।

মাসিমা ব্লাড প্রেসারে লাল হয়ে থাকতো। গায়ে দিল্লির চিকনের কাজ করা শাদা ব্লাউজ। আর মেশোমশাই বাটি বাটি মুড়ি খেতো। চেয়ারে পা তুলে, লুঙ্গি পরা অবস্থায়, খালি গায়ে।

মাসিমা মেশোকে এজন্যে প্রকাশ্যে গালাগালি করতো।

মেশো বলতো, আমি কমিশারিয়েটে একজন ক্লার্ক। সব ক্লার্কই মুড়ি খায়। সাহেবদের মতো কাঁটা চামচ দিয়ে মুড়ি খাবো নাকি!

এই অব্দি বলা যায় এ গল্পের ভূমিকা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভেতর কলকাতায় যেতে হয়েছিল। বড়দার সঙ্গে। তার অ্যাজমার চিকিৎসার জন্যে। ততদিনে মেশো কলকাতায় বদলি হয়েছে।

খগেশদা তখন কলেজের ছেলে। তার সঙ্গে লাইন দিয়ে আলেয়ায় একটা ছবি দেখলাম। দেবেশদা বেকার। সারাদিন মাসি তাকে বকে। লতিকাদির বিয়ে হবে-হবে।

বড়দাকে ডাক্তার দেখিয়ে আমাদের মফঃস্বলে যখন ফিরি-ফিরি—মাসি বড়দাকে পই-পই করে বলেছিল—দিদিকে বলিস—এখানে যোধপুর পার্ক বলে একটা জায়গা হচ্ছে। জলা জায়গা বুজিয়ে। তিন কাঠার প্লট নিতে পারে। কাঠা পঁচাত্তর টাকা করে।

বাড়ি ফিরে বড়দা কথাটা মাকে বলেছিল। মা বলেছিল—একসঙ্গে দুশো পঁচিশ টাকা কোথায় পাবো?

কথাটা মা মিথ্যে বলেনি। পাঁঠার মাংস দশ আনা সের। এটা মনে আছে আমারই—বাকি জিনিসের দাম ভুলে গেছি। সর্ষের তেল ছিল বোধহয় পাঁচ আনা, চিনি চোদ্দ পয়সা।

এরপর একদিন দেশ ভাগ হয়ে গেল। আমরা কলকাতায় এসে উঠলাম। তখন বছর কয়েকের ভেতর দেখা গেল—আমেরিকায় খুব বাঁদর যাচ্ছে। মানুষ যাচ্ছে খুব বিলেতে—জার্মানিতে। পেঁয়াজ রসুন যাচ্ছে আরবে। এণ্ট্রোকুইনল ইন্দোনেশিয়ায়।

একদিন দেবেশদা খগেশদা বিলেত চলে গেল। লতিকাদিরও বিয়ে হয়ে গেল। অবশ্য আমরা বিয়ের খবর পাইনি সময়মত। পরে পাই।

এই লতিকাদিই ছিল আমার স্বপ্নের প্রথম রমণী—যাকে বলা যায় তাই। কেননা, কয়েকবছর আগে গরমের ছুটিতে আম আর মাছভাজা খেতে মা বাবা ভাইদের সঙ্গে লতিকাদি দিল্লি থেকে আমাদের শহরে এসেছিল। ট্রেনে উঠে কলকাতা যাবার সময় আমাদের স্টেশনের প্লাটফর্মে তার সুগন্ধী রুমাল পড়ে যায়। কুড়িয়ে নিয়ে দিতে যাবো, ট্রেন ছেড়ে দিল। দিতে পারিনি। রুমালখানাই আমার স্বপ্নের কারণ হয় সেই বয়সে। অনেকদিন আমার কাছে ছিল।

বিলেত গিয়ে দেবেশদা ওয়েলসে লেবার পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন লিডার হ'ল কয়লাখনিতে। খগেশদা পড়াশুনা করে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার হ'ল। দু'জনেই মেম বিয়ে করল—কয়েক বছরের ভেতর।

এরপর আর কোনো যোগাযোগ নেই। শুধু এটা-সেটা খবর পাই। আমরাও পাশ করেছিলাম। ফেল করছিলাম। জয় করছিলাম। হেরে যাচ্ছিলাম। এর ভেতর সুগন্ধী রুমালখানার কথা মনে পড়তো। মাঝেমাঝে।

খবর পেয়েছি—

খগেশদা মেম বউ নিয়ে দেশে এসেছিল। মাসিমা তার চুলে সর্ষের তেল দিয়ে বিনুনী বাঁধতে যায়। কপালে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে লোহা পরায়। খেতে বসলে সজনে ডাঁটা আর কুমড়োর লাবড়া খেতে দিয়েছিল।

খগেশদা বউ নিয়ে বিলেতে ফিরে যায়।

দেবেশদা আসেনি। তার পাঁচটি বাচ্চা। তার একটি বক্সার। সে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে প্রাইজ লড়াই লড়তে গেছে।

মেশোমশাই রিটায়ার করেছেন। মুড়ি খাওয়া ছাড়েননি। জলা-জায়গা বুজিয়ে যোধপুর পার্ক হয়েছে। সেখানে মাসি বাড়ি তুলে ভাড়া বসিয়েছে। কিন্তু নিজেরা সামান্য ভাড়ার খুপরি ফ্ল্যাট ছাড়েনি। মেসোকে নিয়ে থাকে। দুই প্রাণী। লতিকাদি তো শ্বশুরবাড়িতে। জামাইয়ের নাকি বিরাট অবস্থা।

তারপর পঁচিশ তিরিশ বছর কেটে গেছে। স্বাধীনতা পুরনো হয়ে গেল। জীবনও তাই। পুলিশ আমাদের ছেলেবেলার মতো মাথায় আর লাল পাগড়ি পরে না। আত্মীয়স্বজন ভাইবোনের সঙ্গে দেখা হয়—কারও শ্রাদ্ধে। বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশন সব অ্যাটেণ্ড করা হয় না। লতায়পাতায় আত্মীয়স্বজন বোধ হয় দু'শোর ওপর। কার খোঁজ রাখবো। অনেকের দাঁত নেই। অনেকে বাঁধিয়েছে। চেহারা দেখলে চিনতেও পারবো না।

আমাদের মা মরে গেল। বাবা মরে গেল। আমারই ছেলেমেয়েদের একে একে বিয়েও হয়ে গেল। তাদের ছেলেমেয়েরাও দেখতে দেখতে স্কুলে ঢুকলো।

এখন আলু, চিনি, খাসির মাংস, মিষ্টি, পাতে নুন খাই না। খবর পাই অমুক অমুক আর নেই। রানীর ছেলে আমেরিকায়। পল্টুর মেয়ে এয়ারলাইন্সে পাইলট। এভাবেই খবর পাই মাসি মানে লতিকাদির মা মারা গেছে। কিন্তু মেশো বেঁচে। যোধপুরের বাড়ি থেকে ভাড়াটে তোলা যায়নি। তারা উনিশশো পঞ্চাশের এক দেড়শো টাকা ভাড়ায় বহাল তবিয়তে বাড়িটা ভাগে ভাগে ভোগ-দখল করে আছে। তা তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর হ'ল।

মেশোমশায়কে দেখতে গেলাম। বাবার ভায়রাভাই। একদা খুব মুড়ি খেতো। যৌবনে দিল্লির কমিশারিয়েটে ছিল। রিটায়ার করেছে সেই কবে।

ট্রামলাইন থেকে সিধে উঠে-যাওয়া সিঁড়ি। দোতলায় ফ্ল্যাট। ছোট দু'খানা ঘর। বসার জায়গা। রান্নাঘর। কল বাথরুম। পরিপাটি সাজান। আসলে আমাদের মাসি পঞ্চান্ন-ষাট বছর আগে দিল্লিতে অল্প টাকায় সংসার করতে গিয়ে ভয়ঙ্কর গুছিয়ে হয়ে উঠেছিল। মাইনেপত্তর বেড়েছে মেশোর, দেবেশদা-খগেশদা পাউণ্ড পাঠিয়েছে বিলেত থেকে—কিন্তু মাসির থাকার মেথড পাল্টায়নি। তাকে তাকে বিলিতি ওভালটিনের কৌটো। মেসো নিজেও একটা বিলিতি জাম্পারের ভেতর থেকে গলা বাড়িয়ে জানতে চাইল—কে?

ইজিচেয়ারে শুয়েছিল মেশো। পরিচয় দিলাম। চিনতে পারলো। জানতে চাইলাম, বয়স কত হ'ল?

সাতাশি। পেনশন পাচ্ছি বত্রিশ বছর। চাকরিই করেছি পঁয়ত্রিশ বছর। কুড়ি বছর বয়সে ভর্তি হই।

এখন কে থাকে আর এখানে?

কেউ না। তোমার মাসিই মারা গেছে দু'বছর হ'ল।

দেখাশোনা করে কে?

কাজের লোক থাকলে তারাই। না থাকলে আর কেউ না। আজকাল তো কোন লোক টেকে না।

চমকে উঠলাম। মেশোমশাই শাদা রঙের ফর্সা পায়ে এই বয়সেও কয়েকটা কালো চুল। বললাম, রাতে দরজা আটকায় কে?

কোনদিন আটকানো হয়—কোনদিন হয় না।

বলে কি মেশোমশাই! সব তো চুরি হয়ে যাবে—

হলে হবে। কি করা যাবে! একটু থেমে মেশো বলল, আমিই মরে যাচ্ছি—তো জিনিসপত্তর দিয়ে কি হবে।

থাক, আর কথা বলবেন না। মনে হচ্ছিল—এই বুঝি প্রাণটা বেরিয়ে যাবে মানুষটার। জাম্পারের বাইরে কণ্ঠনালীতে ট্রানজিস্টারের কায়দায় গুচ্ছের শিরা জেগে।

দেবেশদের চিঠি দেওয়া হয় নিয়ে যেতে আমাদের—মানে তোমার মাসি যখন বেঁচে। কোনো জবাব নেই। বদলে ওরা দু'ভাই যা পাউণ্ড পাঠাতো—তা ডবল করে দিল।

টাকা তোলেন কি করে?

তোলা হয় আর কোথায়! সবই জমা পড়ছে। মাসে মাসে পাউণ্ড, বাড়ি-ভাড়া, পেনশন। ব্যাংক একটা করে রসিদ পাঠায় ডাকে। ব্যাংকেরই একজন সই করিয়ে নিয়ে যায়—টাকা দিয়ে যায় মাসের গোড়ায়—

মনে মনে ভাবি—সে কি কথা! কত টাকার সই করায়? আর সব টাকাই বা দিয়ে যায়? ডাহা ঠকাতে পারে তো।

আমার মুখ দেখে মেশো আমার মনের ভাব বুঝলো। পাতলা ঠোঁটে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হাসল। তারপর বলল, আমার কাছে এখন টাকার দামই বা কি? সবই তো সমান।

কী বলছেন? টাকা সব সময় লাগে।

ঢাকা চাদরের বাইরে দু'খানা পাখির পা বের করে চট খুঁজলো মেশো। পেল না। শেষে বলল, আমিও একসময় ভাবতাম—টাকা খুব দামী জিনিস। বিশেষ করে বয়স হলে টাকাই দেখবে। টাকাই ডাক্তার ডাকবে—নার্স রাখবে—ওষুধ দেবে। টাকাই ভাত খাওয়াবে। কিন্তু কোথায়!

খাওয়া-দাওয়া করছেন কি করে?

করি আর কোথায়! নিচের চা-দোকানের একটা ছেলে এসে ভাত ডাল ফুটিয়ে দেয়। দু'একদিন মাছ রাঁধে—

ওভাবে কি হয় মেশোমশায়!

আমি ত জানি হয় না। লতু এসে দেখে গেছে। নিয়ে যাবে ওর কাছে। আর ব্যাংকে ওদিকে টাকা—তস্য সুদের পাহাড় হচ্ছে। কিন্তু কোনো কাজে আসছে না বাবা—কে ভাঙাবে! কেই বা খরচা করবে!

মশারি টাঙায় কে? দোর খোলে কে? খাবার দিয়ে এঁটো তোলে কে?

পড়ে গেলে কে দেখবে ? দোর দেয় বা কে ? এসব ভাবতে ভাবতেই নিচে নেমে এলাম। দেবেশদা, খগেশদা এ বুড়োকে বিলেত অব্দি নিয়ে যেতে চায় না। তাই মাসকাবারি পাউণ্ড যা পাঠাতো তা ডবল করে দিয়েছে।

নেমে আসবার আগে মেশো চোখ দিয়ে দেওয়ালে তাকাতে বলল। তাকিয়েছিলাম। ছেলেমেয়েদের ঠিকানা পেনসিল দিয়ে লেখা। দেবেশদার ঠিকানার নিচে লেখা অ্যাবার্ডিন। খগেশদার ঠিকানার নিচে লেখা হ্যাম্পস্টিড হিথ্। লতুদির ঠিকানার নিচে লেখা অক্ষয় পাড়ুই লেন, শিবপুর, হাওড়া। সব ঠিকানা মাথার ভেতর তালগোল পাকিয়ে গেল। কেননা—মেশোর টাকার চক্রবৃদ্ধিহারে সুদের পাহাড়টা আমারই মাথার ভেতর টিউমার হয়ে জাগান দিচ্ছিল। মনে করতে পারলাম—এখন পাঁঠার মাংস চল্লিশ টাকা। চিনি সাত টাকা। সর্ষের তেল খোলা বাজারে চব্বিশ টাকা। পৃথিবীর হ'ল কি ?

লতুদি মেশোকে নিতে দেরি করলে নির্ঘাৎ টেঁসে যাবে। হাড়গিলের মতো গলা বেরোনো দশা। কথা বলে আর মাথা কাঁপে। হাসলে পাতলা কাগজের মতো ঠোঁট ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়। যেন আঠা দিয়ে কাটা জিনিস জুড়ে তবে মেশোকে বানানো।

শেষের সেদিনটা যেমন হয়—তা কি রামমোহন রায়ের বাঁধা গান শুনে ধরা যায়! আসলে সেদিনটাই যে আসে আচমকা। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ—আমরা বলি বটে—কিন্তু কেই-বা মেনে নিতে পারে সেই দিনটাকে। বাঁচতে তো চাই সবাই। এমনকি বিনা চমকে সে এলেও।

আমার নিজেরই জীবন নিস্তরঙ্গ হয়ে আসছিল। বেঁচে আছি ঘুম থেকে উঠে খাবো বলে, টাকা ভাঙিয়ে রেশন তুলবো বলে। বন্ধু কমে গেছে। যাও বা আছে—তাদের সঙ্গে কথা বললে গাড়ল লাগে। এরই ভেতর লতুদির একপাতা চিঠি পেলাম। বাবা বড় দেখতে চায় তোকে—

ঠিকানা লিখে দিয়ে এসেছিলাম। যাক্! মেশো তাহলে মেয়ের কাছে গিয়ে উঠেছে। বাঁচা গেল। তাহলে বেঘোরে মরতে হবে না মানুষটাকে। বহুদিন দিল্লির শুকনো আবহাওয়ায় থেকে থেকে কলকাতার ভিজে বাতাসে বড্ড কাহিল হয়ে পড়েছে মেশো। তারপর মাসি নেই।

খুঁজে খুঁজে লতুদির শ্বশুরবাড়ি হাজির হলাম। লতুদিই গিন্নী। শ্বশুর শাশুড়ি ফটোতে। জামাইবাবুর বাঁধাঘাটে ব্রেপলের ব্যবসা—কেন্দ্রিসের ব্যবসা। সারা বাড়িতে একটা ভিজে রবারের গন্ধ। সেই স্বপ্নের লতিকাদি এখন ভারি

গিন্নীবান্নি। কানে চেন লাগানো বড় দুল। বিরাট তেতলা বাড়ি। উঠোনে হুধেল গাই। বড় ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ এনেছে। সে ঘোমটা দিয়ে আমায় প্রণাম করলো। জামাইবাবু গদিতে।

লতুদি বলল, দোতলায় যা—

দোতলায় উঠে যে ঘরে মেশোকে পেলাম—তাকে এঁদো বলাই উচিত। তিনদিক বন্ধ প্রায় দেওয়াল। জানলার সামনে একটা ডুমুর গাছ। ঘরের সিলিং থেকে চার ব্লেডের পাখাটা ঘুরছে আরামি চালে।

ঘরে ঢুকতেই মেশোকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। একদম শাদা হয়ে গেছে। আমায় সামান্য চিনলো। দেখেই বলল, আমার ব্লাড প্রেসার, ব্লাড সুগার—কিছুরই পরোয়া করে না লতু। দু'বেলা ভাত দিচ্ছে।

আমি তো শুনে অবাক। জিজ্ঞাসা করবো লতুদিকে ভাবছি—লতুদিই দেখি ওপরে উঠে এসেছে। সিঁড়ির মুখে বলল, সারা জীবন নিজে টাকা জমিয়ে কষ্ট করেছে—ছেলেরা পাউণ্ড পাঠিয়েছে—তাও ভাঙেনি। কোন্‌দিন মরে যাবে—শেষে ও-টাকা ব্যাংক খাবে—বাড়ি তো লুটে খাচ্ছে ভাড়াটেরা—

কেন ? তোমরাই তো পাবে সব। তাড়া কিসের—

তাড়া নয়তো কি বলিস। এখন যদি বাবা যান তো ও বাড়ি—ব্যাংকের টাকা কারও ভোগে আসবে না।

কেন ?

দাদা আর খগেশ বিলেত থেকে আসবে সই দিতে ? আনডিভাইডেড্ প্রপার্টির সাকসেশন সার্টিফিকেটও তো পাওয়া যাবে না সই ছাড়া। অতগুলো টাকা ব্যাংকের পেটে পড়ে থাকবে ?

তাও তো বটে।

বাবা বলে কি জানিস। ছেলেদের ছেলেমেয়েরাও সমানভাগী। উনি উইল করতে চান। কুল্লে এক লাখ আশি আর একখানা বাড়ি—ভাগের ভাগ তস্য ভাগ করে দিতে চান উনি। বিলেত থেকে তারা পাঁচ আনা ছ'পাই নিতে সব ছুটে আসবে খ'ন!

যাকে নিয়ে কথা সে সবই শুনছিল। হেসে মেশো বলল, বেশতো—দানপত্রের কাগজখানা আনিস। আমি সই করে দেব। ল্যাঠা চুকে যাক—

লতুদি আবার সংসারের কাজে চলে গেল। মেশো এখন আস্ত একটা হাড়গিলে পাখি। গায়ে আর মাংস নেই। কিন্তু ফর্সা পায়ে কালো লোম। ভাঙা-

চোরা দ' হয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে। আস্তে আস্তে নিজেই বলল, দান করলে নিজেকে বড় নিঃস্ব লাগে। কোনটা যে আগে ফুরোবে—তাতো জানি না বাবা! আয়ু? না, সঞ্চয়?

আবারও খানিকবাদে বলতে লাগলেন, উইল করলে ভাগ বাটোয়ারা যা কিছু সবই তো আমি চলে গেলে শুরু হত। তা লতুর তর সয় না।—বলছিলেন আর ঝুঁকে পড়ে মেঝে দেখছিলেন।

জামাইবাবু কি বলেন?

সেই তো দানপত্র লিখিয়ে ডেমি কাগজ ওই কাঠের বাক্সে রেখে গেছে। বলে—আমরা দেখছি শেষ সময়ে—আমাদেরই তো দানে হক। হিসেবী জামাই আমার।

ঘরে কেউ ছিল না। আমি আর মেশো। বললাম, ভাড়ার ফ্ল্যাটে ফিরে যাবেন?

সে পথও বন্ধ। বাড়ি ছেড়ে দিয়ে মালপত্র কাগজ-পত্তর সমেত আমাকে এখানে ডাম্প করেছে। এখন কোথায় যাই? মৃত্যুও এত লেট করছে বাবা!

নিজের মেয়ের বাড়িতে বসে মেশো এসব কথা বলছিল। লতুদি আমার জীবনে প্রথম স্বপ্নের সুগন্ধী রমণী। যার রুমাল আমি বহুকাল সাবধানে রেখে দিয়েছিলাম।

আচমকাই লতুদি ঘরে ঢুকলো। ঢুকেই বলল, তোর কথা শোনে বাবা। তুই বললে সই করে দেবে ঠিক।

বাবা আর মেয়ের ভেতর আমি বলার কে? তাই বোকার মতো অর্থহীন হাসি হাসলাম একবার।

সেদিন আর বেশি বসিনি। আমারও সংসার আছে। দাঁতের ব্যথা আছে। লোক-লৌকিকতা আছে। আছে অনুরোধে ঢেঁকি গেলা। তবু ওরই ভেতর চোখ বুজলে পরিষ্কার দেখতে পাই—একজন বাবা ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে শাদা ধরে গেছে। তার মেয়ে টাকা মাড়িয়ে সংসার করে চললেও বাপের সম্পত্তিটুকুও তার চাই-ই চাই। যাকে বলে চক মিলানো বাড়ি—গোহালে দুধেল গাই থাকা সত্ত্বেও। এক একদিন মনে হ'ত মেশো আমায় ডাকছেন। পরিষ্কার বলছেন—কবে আসবি আবার? আয় না একবার।

আবারও গেলাম। আচমকাই। এক শনিবার বিকেলে। শীতের মাঝা-মাঝি। যখন বিকেলের আকাশ শীতে নীল হয়ে আসে।

কাউকে না দেখে সিধে দোতলায় উঠছি। উঠতে উঠতেই মেশোর গলা পেলাম। রীতিমতো কেঁপে কেঁপে ওঠা গলা। আমি সজ্ঞানে অন্য নাতি-নাতনিদের কি করে ঠকাই?

বুঝলাম, এ সেই দানপত্রের কেস। মেশোর মনে লাগছে—অন্য দুই ছেলের ছেলেমেয়েরা কেন বাদ যাবে!

লতুদির গলা—তারা তোমার এই তিন পয়সা নিতে এদেশে আসবে না।

'আসবে না' কথাটায় একটা ধমক ছিল। আমি লতুদির মুখ না দেখেও মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম। 'আসবে না' বলতে গিয়ে ধমক ও রাগের সময় তা রীতি-মতো মুষড়ে গেছে।

ওপরে উঠবো কি উঠবো না—ভাবছি। লতুদির চোখে পড়ে গেলাম।

আয়। দেখে যা বাবার কাণ্ড!

এমন করে বলা—যেন মেশো তেল না মেখেই পুকুরে নাইতে নেমেছে। এত সাধারণ। এত হাসির—যেন কিছুই হয়নি। দানপত্র নামক অনিচ্ছার জিনিসে একজনকে যে টেনে হিঁচড়ে সই করানো হচ্ছে—তা নয়। লতুদির গলার সহজ ঢল শুনে মনে হবে—মেশোকে তাঁর অনিচ্ছায় কোনো স্কুল স্পোর্টসে টাগ-অফ-ওয়ারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে রসিকতা করে।

আসলে তো তা নয়। অষ্টাশি চলছে বোধ হয়। গায়ে সেই জাম্পার। গলাটি হাড়গিলে পাখির মতো বেরিয়ে। ফর্সা কপালে এক পোঁচ পাকা চুল এসে পড়েছে। হাতের সরু আঙুলের নখ কাটা হয়নি।

লতুদি বলল, তুই একটু বলে ছাখ বাবাকে—

দেখি।—বলে ঘরে ঢুকলাম। মেশো ইজিচেয়ারে কাত হয়ে জানলার ওপাশের ডুমুর গাছটার দিকে তাকিয়ে। আমি কোনো কথা বললাম না। ঘরখানা চুপচাপ।

মেশো সেইভাবেই জানলায় তাকিয়ে বলল, অনেকদিন ধরেই জানি—আমরা কেউ কারও নই। তোর মাসি যে চলে গেছে দু'বছর—আর কি কোন বন্ধন আছে আমাদের সঙ্গে তার? কিচ্ছু নেই। মায়ার বসে আমরা হাসি-কাঁদি।

আমি চুপচাপই রইলাম।

মানুষের শৈশব সবচেয়ে দীর্ঘ। গরুর বাচ্চা দেখবি—জন্মেই ছুটতে থাকে। আমাদের পা ফেলা ঠিক হতে পাঁচ বছর লাগে। মা বাবার ওপর নির্ভর করতে করতে চিরকালের জন্যে হীনমন্যতা জন্মায়। তার প্রতিশোধেই সন্তান বাবা-মাকে পরে কষ্ট দেয়।

ক্লান্ত আছেন। থাক এখন। কথা বলবেন পরে।

না। এখুনি বলবো। আমার মাথা পরে আর কাজ নাও করতে পারে। জানো বাবা—পাখি কয়েকটা শিস দিতে পারে মাত্র। মানুষ সেই শিসে সুর দিয়ে গান বানায়। আবার সেই মানুষেরই আদি আনন্দ কি জানো?

না।

নর-হত্যা! মানুষ সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায় মানুষ খুন করে। এ তার কোটি কোটি বছরের শিকারের সংস্কার। এসব কথা বলছি—কারণ, পরে হয়তো আর বলার সুযোগ পাবো না। মনেই আসবে না।

বাঃ! তা কেন মেশোমশায়?

যা বলছি ঠিক। তুমি আজ শুনে যাও। স্রেফ শুনে যাও—বাধা দিলে আমি ভুলে যাবো বাবা। খেই থাকবে না—

চুপ করে ভাবলাম—মানুষের দীর্ঘতম শৈশব, আর তা থেকেই প্রতিশোধ স্পৃহা। পাখি শিস দেয় মাত্র। মানুষ গান গায়। সেই মানুষেরই আদি আনন্দ বা উল্লাস নরহত্যায় লুকিয়ে আছে।

এই সবই ঢেকে দেবার জন্যে শিশু মহান হাসি দিয়ে মায়ায় বাঁধে। সেই মায়ার বশে আমরা পৃথিবীতে ঘরবাড়ি বানাই, টাকা জমাই—বুঝলে। নয়তো আমরা কেউ কারও নই। কারর নই। আমিও আলাদা। তুমিও আলাদা বাবা—

কথা বলতে বলতে মেশো উঠে বসেছিল। বললাম, থাক আর কথা বলবেন না। শুয়ে থাকুন।

উঠে বসেই আবার ইজিচেয়ারে ধপ করে ঢলে পড়লো মেশো—চোখও বুজে ফেললো।

কি হ'ল?

পৃথিবীটা কেমন দুলে গেল।

চোখ খুলুন।

না। পারবো না। ভয় করছে বাবা—

কিসের ভয়? আমি তো আছি মেশোমশায়—

চোখ বুজেই মেশো খুব শান্ত গলায় বলল, ভরসা পাচ্ছি না বাবা। কেমন মনে হ'ল ইজিচেয়ার একদিকে বসে যাচ্ছে।

আবার চুপচাপ। বললাম, তারপর?

জানলা সুদ্ধু, সামনের দেওয়ালটা যেন কাত হয়ে পড়ল।

কি বলছেন?

চোখ বুজেই মেশো বলল, হুঁ। আগেও আরও দু'চারবার হয়েছে এমন। লতু জানে। মনে হচ্ছে—ঘরে নদীর জল ঢুকে পড়েছে। আমি ইজিচেয়ার থেকে পিছলে পড়ে যাবো। বাবা—ধরো আমায়—ধরো—

আমি তো চমকে উঠেছি। এ কি ব্যাপার মেশোর? ইজিচেয়ারের একদিকের হাতল ধরে যেন অদৃশ্য কোন স্রোতের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে চাইছে মেশো—তাই যুঝে চলেছে—দাঁতে দাঁত কামড়ে। কিন্তু একটুর জন্যে পারছে না। যে কোনো সময় সেই অদৃশ্য স্রোত ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাই—পড়েও যেতে পারেন—ইজিচেয়ারেই।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে ওকে দু'হাতে ধরলাম। মেশো তখন পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছিল—এই জল ঢুকে পড়লো। ঢুকছে—ঢুকলো। ধরো। শক্ত করে ধরো আমায়—

আমার পেছন থেকে শান্ত ঠাণ্ডা গলায় লতুদি বলল, ছেড়ে দে। ধরার দরকার নেই—

আমি একরকম ক্ষেপে গিয়ে বললাম, পড়ে যাবে যে—মাথা ফাটবে শেষে—

সত্যিই তখন মেলার তামাকখোর পুতুলের মতোই ওর মাথাটা দুলছিল। এদিকে। আর ওদিকে।

লতুদি আরও শান্ত গলায় বলল, না। পড়বে না। এটা বাবার মনের ভুল।

তাহলে?

ডাক্তার এসে দেখে গেছে। কানের ভেতর যে জল থাকে—তা বেশি বয়স বলে কবে নাকি শুকিয়ে গেছে। কোন্ একটা ভাল্‌ভ একটু খারাপ হয়েছে। ই এন টি-র ডাক্তার এসে দেখে গেছে। দিনে দুটো করে স্টুগেরন ট্যাবলেট পড়ছে। ওষুধ খেলেই ব্যালান্স আবার ফিরে পাবে।

বলতে বলতে লতুদি তার বাবার কানের কাছে মুখ নিয়ে জোরে জানতে চাইল, বড়ি খেয়েছিলে?

এবার চোখ খুললো মেশো। ঘোলা দৃষ্টি। কোনো বিশেষ দিকে না তাকিয়ে বলল, কোন্ বড়ি?

স্টুগেরন্!

আবার কোন্ বড়ি হবে!

মনে নেই।

ভালো করেছো!—বলে মসমস করে লতুদি তার জমজমাট সংসারের ভেতর আবার চলে গেল।

মেশো চোখ বুজে পড়েছিল ইজিচেয়ারে। আমি ওঁকে রেস্ট নিতে দিয়েই টুক করে উঠে এলাম।

সেই একটা সইয়ের জন্যে একজন অনিচ্ছুক রুগ্ন বুড়োকে নিয়ে ধস্তাধস্তি করতে বা দেখতে ভাল লাগে! বিশেষত বুড়ো যখন নিজের বাবা—আর টানাচড়ার নায়িকা যখন নিজেরই একমাত্র মেয়ে—সেখানে কথা বলার আমি কে!

আমিও আমাকে না জানিয়েই ভাবতে শুরু করেছি—আমরা কেউ কারও নই। আমার গিন্নী কিছুকাল হ'ল ম্যালেরিয়ায় পড়েছে। মেটাক্যালসিন খায়। একদিন তেমন খেয়ে সবে শুয়েছে। তাকে বললাম—আমরা কেউ কারও নই।

মাথায় ব্যথা। ক'দিন আগে জ্বর গেছে। শেফালী চিঁ চিঁ করে বলল, এ আবার বলার কি আছে। তোমার ব্যাভারই বলে দিচ্ছে—আমি তোমার কেউ নই।

শুধরে নেবার চেষ্টা করলাম। শেফালীর মাথা টিপলাম। সুবিধা হ'ল না।

এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে গিয়ে একটু একটু করে মেশোমশায়ের নিরুপায় মুখখানাই মনের সামনে বড় হয়ে উঠলো। ভাবলেশহীন চোখ। এক পোঁচড়া চুল কপালে এসে পড়েছে।

পরদিন হাওড়া থেকে মিনিবাসে আঁদুল যাচ্ছি। আগেকার বাঙালবাবুর ব্রিজ দিয়ে—এখন যেটা সালকে, ময়দান আর হাওড়া স্টেশন জুড়ে সিমেন্টে ঢালাই এক অতিকায় আমসত্ত্ব আর কি—মিনিবাস এগোচ্ছিল। দেখি স্টেশন গেট দিয়ে মেশো বেরোচ্ছে। সকালবেলা। হুইলচেয়ারে বসে। পেছনে চারজন কুলি। তাদের পেছনে লতুদি আর তার ছোটছেলে। ওদেরও পেছনে ছ' নম্বর প্ল্যাটফর্ম, কালকা মেল বোধহয় ছাড়ল। আমি নেমে পড়লাম।

রীতিমত ফ্যামিলি অ্যালবাম। ব্রিজের ওপরেই সামান্য কুয়াশার ভেতর জামাইবাবুর অ্যামবাস্যাডার দাঁড়িয়ে।

কি ব্যাপার?

লতুদি আমায় দেখে হাসল। ওঃ! তুই। তাই বল।—এই অব্দি বলে যাকে বলে সলজ্জ কণ্ঠে—সেরকম করে বলল, বাবাকে নিয়ে—ট্রেন দেখাতে এসেছিলাম। ওপাশ দিয়ে ঢুকে এপাশ দিয়ে বেরোচ্ছি।

ট্রেন দেখাবার মতো বালক নয় মেশো। তবু ভাল লাগল। নব্বুইয়ের

ধারাধারি এক ভদ্রলোককে তার মেয়ে আশা মিটিয়ে ট্রেন দেখাচ্ছে। রেলের হুইলচেয়ার ভাড়া নিতে হয়েছে। নিতে হয়েছে চারজন কুলি।

ও মেশোমশায়? কেমন লাগছে?

বেশ আনন্দ করেই জানতে চাইলাম। মেশো আমার মুখে চোখ তুলে চাইলেন। সুদূর দৃষ্টি। আমায় চিনতেও পারলেন না। ফাঁকা চাহুনি।

অতি আনন্দে—বা অতি আহ্লাদে বিহ্বল দশায় মানুষ সবকিছু ভুলে যায়। বুঝি-বা মেশোরও সেই দশা হয়েছে।

মাসখানেক পরে সকালের কাগজ দেখছি। হুইয়ের পাতায় পুলিশের দেওয়া এক বিজ্ঞাপন দেখে তো পটাং করে লাফিয়ে উঠলাম। জামা-কাপড় পরে সিধে লতুদির বাড়ি।

কি ব্যাপার? এ কিসের বিজ্ঞাপন?

লতুদি কাগজখানার দিকে না তাকিয়েই বলল, ঠিকই দিয়েছে। আমরা কালকা মেলে তুলে দিয়েছিলাম। ঠিক ছিল—দিল্লিতে অমৃতদা এসে বাবাকে নামিয়ে নিয়ে যাবে—কালকা যাবার আগে ট্রেনটা দিল্লিতে থামে অনেকক্ষণ।

অমৃতদা কে?

তুই চিনবি না। আমরা রাইসিনায় থাকতে মাকে মা বলতো। বাবাকে বাবা। একদম নিজের ছেলের মতো হয়ে গিয়েছিল অমৃতদা।

সে তো বহু বছর আগে।

হুঁ। সম্পর্ক তো অনেকদিনের। বাবা ঠাঁইনাড়া হতে চাইছিল। ভাবলাম অমৃতদার ওখান থেকে ঘুরে আসুক। মনটা ভাল হবে। তা কে ভেবেছে—দুষ্টুমি করে মাঝপথে কোন স্টেশনে নেমে যাবে—

আমি চমকে উঠলাম। তাই নাকি? যে মানুষ সব ভুলে গেছে—তাকে একা মেল ট্রেনে তুলে দিতে পারলে—?

অমৃতদার চিঠি পেলাম—বাবা তো আসেননি। তখনই তো আমরা পুলিশকে জানাই। পুলিশ আমাদের কাছ থেকে ছবি নিয়ে গিয়ে তবে বিজ্ঞাপন দিল। কালকা মেল হইতে নিরুদ্দেশ।

অ। সই দিয়েছিল তোমার বাবা?

সে তো কবেই দিয়ে দিয়েছিল। সেই যে হুইল চেয়ারে দেখলি একদিন সকালে—তখনি দিয়েছে সই।

আমি আবারও বললাম, অ।

আজও জানি না, সত্যি সত্যিই অমৃতদা বলে আদৌ কেউ ছিল কিনা আসলে। আজও জানি না, যেদিন হুইল চেয়ারে মেশোকে দেখি—সেদিনই তাকে কালকা মেলে তুলে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল কি না। আজও জানি না, সব ভুলে বসা ফাঁকা চাহুনির মানুষটা জীবিত, না মৃত? এই বিশাল ভারতবর্ষে তিনি এখন কোথায় কে বলতে পারে! ঝাঁঝায় নেমেছে মেশো? না টুণ্ডলায়? পড়ে আছি আমি—আর সেই ডুমুরগাছটা।

স্টেপনি

নবকুমার বসু

যাকে বলে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামা, ঠিক তাই নামলো—যখন দিব্যেন্দু নতুন সি আই টি রোডের দিক থেকে পার্কসার্কাস ময়দানের দিকে ঘুরলো। ইলশেগুঁড়ি ফিসফিসোচ্ছিল মিনিট দশেক আগে থাকতে। বেরুনোর সময় দেখেও গা করেনি। বরং রাজা রায়ের ফ্ল্যাটের নিচে থেকে আকাশে চোখ তুলে ঝিকমিকান তারা দেখেছিল। মনে হয়েছিল সামান্য উড়ো বৃষ্টিও আর থাকবে না।

এখন মুষলধারে, বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা দিব্যেন্দুর নতুন গাড়ির উইণ্ডস্ক্রীনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। মুহূর্তের মধ্যে শ'য়ে শ'য়ে জলজ বিস্ময় চিহ্ন ঝাপসা করে দিচ্ছে কাঁচের পিছনে তার দৃষ্টিকে। জলমোছা এপাশ ওপাশ কাঠিগুলো আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে কাঁচভেদ করা দিব্যেন্দুর দৃষ্টিকে স্বচ্ছ রাখতে, কিন্তু দ্রুত গতিতে আছড়ে পড়া বৃষ্টির তীরের সঙ্গে তারা পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছে না। হিলহিলানো আঁকাবাঁকা জলধারা তার দৃষ্টিকে ভাসিয়ে দিচ্ছে।

দিব্যেন্দু মনে মনে বললো—শালার বৃষ্টি আর নামবার সময় পেল না!

রাত হয়েছে। গাড়িঘোড়া কমে এসেছে রাস্তায়। তবু কলকাতার রাস্তায় রাত সাড়ে এগারোটায় এণ্টালি থেকে যোধপুর পার্ক ফিরে আসাটা কোনো ব্যাপার না। শ্রাবণ মাস হলেও মোটামুটি শুকোরুখো যাচ্ছিল ক'দিন ধরে। ধোঁওয়া আকাশ থেকে পূর্ণিমার ভরা জ্যোৎস্নাও দিন দুয়েক আগে রাস্তাঘাট সব ভাসিয়ে দিচ্ছিল। একটু আগে আজও প্রায় তাই ছিল। তখন কে জানতো, কোথায় লুকিয়ে রয়েছে এমন গভীর জলভরা এক আকাশ ঘন কালো মেঘ!

যা হচ্ছে এতো শুধু বৃষ্টি হওয়া নয়। ঝোড়ো বাতাস আর তীক্ষ্ণ জলের ঝাপটা মিলেমিশে কয়েক মিনিটের মধ্যেই যেন ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু হ'য়ে গেছে। সব কাঁচ বন্ধ করে দেওয়া চলন্ত গাড়ির মধ্যে বসে থেকেও দিব্যেন্দু টের পাচ্ছে, আসলে বাইরে কী ব্যাপারটা ঘটছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের ভাপে কাঁচের ভিতরের দিকটাও ঝাপসা হয়ে উঠেছে। এক টুকরো কাপড় দিয়ে কাঁচটা ঘষে নিল দিব্যেন্দু। পরিষ্কার দেখতে পেল বাইরে বৃষ্টির তোড় কতখানি। আর সেই সঙ্গেই দেখতে

গেল এই কয়েক মিনিটের তীব্র ধারাবর্ষণে এরমধ্যেই রাস্তায় জল জমতে শুরু করেছে। মনে মনে প্রমাদ গনলো দিব্যেন্দু।

গাড়ির গতি অনিবার্যভাবেই কম। বেকবাগান পর্যন্ত আসতে এই সময়টুকু চলে গেছে। তার ওপর এই ট্রামলাইনের ধারেই যখন জল জমতে শুরু করেছে তখন আর একটু এগিয়ে বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে নিশ্চয়ই আরও বেশি জল দাঁড়িয়েছে এখন। কিন্তু যোধপুর পার্ক পর্যন্ত যেতে তো গোলপার্ক এবং ঢাকুরিয়া ব্রিজের নিচে পঞ্চাননতলা পার হতে হবে।

নীরবে শিউরে উঠলো দিব্যেন্দু। জল জমার জন্য ব্রিজের নিচটা কলকাতায় বিখ্যাত। প্রকৃতপক্ষে যেকোনো সময় প্রবল বর্ষণের পরেই কলকাতার উত্তর দক্ষিণ ভাগ হয়ে যায় ঢাকুরিয়া ব্রিজের নিচে থেকে। বড় বড় কিছু গাড়ি ছাড়া, প্রায় আর সব গাড়ি ডুবে যাওয়ার ভয়ে যাওয়া আসা বন্ধ করে দেয়। বেপরোয়া ভাবে পার হয়ে যাওয়ার আশায় কিছু গাড়ি অবশ্য শেষ পর্যন্ত ইঞ্জিনে জল ঢুকে বিকল হয়ে রাস্তাতেও পড়ে থাকতে বাধ্য হয়। সে যে কি বিড়ম্বনার ব্যাপার—দিব্যেন্দুর থেকে ভাল আর কে জানে!

হাঁটু থেকে কোমর পর্যন্ত জলে তখন বাধ্য হয়ে নেমে গাড়ি ঠেলার ব্যবস্থা···। আশেপাশে রেললাইনের ধারেকাছের ছেলেছোকরাগুলোর এই এক মওকা। ব্রিজের নিচে জল জমলেই হৈ হৈ করে কোত্থেকে ঠিক এক দঙ্গল ছেলে এসে জুটবে। জলে আটকে পড়া গাড়ি ঠেলে রোজগারের ধান্দা। কারুর সর্বনাশ, কারুর পৌষমাস।

আমির আলি এ্যাভেনিউ ছেড়ে বালিগঞ্জ পোস্টাপিসের কাছাকাছি আসতেই দিব্যেন্দু বুঝলো জল দাঁড়াতে শুরু করেছে। বৃষ্টিও এক্ষুনি কমার কোনো লক্ষণ নেই। গাড়িটা আস্তে চালালেও ঠিকই চলছে এখনও। তাছাড়া সামনের গাড়িগুলো যেটুকু জল জমেছে, তার ওপর দিয়ে যখন চলে যাচ্ছে—তখন দিব্যেন্দুও পার হয়ে যেতে পারবে। গাড়ির কাঁচ আর-একবার কাপড় ঘষে পরিষ্কার করে নিল। তারপর সেকেণ্ড থেকে থার্ড গীয়ারে তুলে দিয়ে একটু গতি বাড়িয়েই এগিয়ে চললো গড়িয়াহাটের দিকে।

বৃষ্টির তেজ বোধহয় সামান্য একটু কমেছে। নির্ঝঞ্ঝাটে ফাঁড়ির জায়গাটুকু অল্প জলের ওপর দিয়ে পেরিয়ে চলে আসতে পারায় একই সঙ্গে খানিকটা স্বস্তি এবং মনের জোর পেল দিব্যেন্দু। সাময়িক টেনশনটা কাটানোর জন্য একহাতে ষ্টিয়ারিং ধরে রেখে সিগ্রেট ধরিয়ে ফেললো একটা।

সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে ফিরে আবার বেরুনোর সময় সামান্য কথা কাটাকাটি হয়ে গিয়েছিল জয়ার সঙ্গে।

—সারাদিন অফিস করে এসে এখন আবার বেরুচ্ছো?

জামাকাপড় পরতে পরতেই দিব্যেন্দু বলেছিল—আজকে না গেলে আর রাজাদার সঙ্গে দেখা করার সময় হবে না। কাল বিকেলের ফ্লাইটে বম্বে চলে যাচ্ছেন।

—অন্তর কালকে জেনারেল নলেজ পরীক্ষা। খানিকক্ষণ ওকে নিয়ে বসলে ভাল হতো।

দিব্যেন্দু উত্তর দেয়নি জয়ার কথায়। আসলে নিজের কাজ সামলে ছেলে-মেয়ের পড়াশুনা সে আর দেখতে পারে না। তাছাড়া হঠাৎ মাঝে মধ্যে একদিন ওদের পড়া নিয়ে দিব্যেন্দুর বসতে ভালোও লাগে না। ওর ধারণা, তাতে উপকার কিছু হয় না।

জয়া আবার বলেছিল—মিতুরও গাটা গরম গরম লাগছে।

—থার্মোমিটার দিয়ে দেখেছ জ্বর আছে কি না?

—কখন আর দেখবো? এদিকে পড়াশুনা, ওদিকে রান্নার গ্যাস ফুরিয়ে গেছে। টেলিফোনটায় এখনও ডায়ালটোন নেই···।

—জ্বরটা দেখে নাও। সিজিনাল ফিবার হয়তো। একশ'র ওপর থাকলে ক্রোসিন দিয়ে দাও।

কথা বলতে বলতেই গাড়ির চাবি হাতে নিয়েছিল দিব্যেন্দু।

—তুমি কি গাড়ি নিয়ে বেরুচ্ছো?

—হ্যাঁ। তা নয়তো ফিরতে বড় অসুবিধে হয়।

—কিন্তু যদি বৃষ্টি হয়ে জল জমে, তখন!

—মহা মুস্কিল দেখছি।—বিরক্ত দিব্যেন্দু উত্তর দিয়েছিল।—এতো সব আগে থেকে ভাবলে মানুষ কি আর কাজকর্মে বেরুতে পারে!

—রাজাদার ওখানে তো কাজের থেকে আড্ডাটাই···

দিব্যেন্দু আর দাঁড়ায়নি। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলেছিল—হ্যাঁ, আমি তো সারাদিন আড্ডাই দিচ্ছি। গড়িয়াহাটের মোড়টা পেরিয়ে চলে এসেই এতক্ষণে মনে হ'ল—মেয়েটার জ্বরটা আবার বাড়েনি তো! এদিকে জয়া নিশ্চয়ই ভাবছে—যা বৃষ্টি হচ্ছে, গাড়ি নির্ঘাৎ রাস্তায় আটকেছে। এই বৃষ্টিতে

পঞ্চানন তলায় ব্রিজের নিচে কি এতোক্ষণে জল জমেনি! হয়তো বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

মুহূর্তের জন্য কেমন এক বিপন্নতা আচ্ছন্ন করে দিব্যেন্দুকে। সত্যি কি এই মনুষ্যজন্মটা ব্যক্ত এবং অব্যক্ত হাজারটা বিধি নিষেধের বেড়া দিয়ে এক অন্ধকারময় জায়গাতে আবদ্ধ! জীবন মানে কি আড়ষ্টতা দিয়ে বেঁধে রাখা কিছু নিয়মমাফিক সময়! এবং এই সময়টার জন্য কিছু তথাকথিত সামাজিক এবং সাংসারিক কর্তব্য পালন! একই সঙ্গে পাহাড়ের ওপর সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে দিব্যেন্দু দেখতে পায় একটা রাজপ্রসাদ আর ঘন সবুজ একটা উঁচু গাছের পাতার আড়ালে একটা সুখী পাখি। হাওয়া দিচ্ছে। সূর্যের আলো পড়েছে গাছের চিকণ পাতায়, পাখির পালকে। কতদিন কবিতা লেখেনি দিব্যেন্দু! অথচ একসময় তার কবিতা নিয়ে—বৃষ্টির মধ্যেই হঠাৎ একটা হল্লায় চমক ভেঙে যায় দিব্যেন্দুর।

—আরে স্-শালা, ওই আর এক পার্টি আসছে ফিয়াট নিয়ে!

গোলপার্ক চলে এসেছে দিব্যেন্দু। বৃষ্টি একটানা হলেও, নিশ্চয়ই তার তীব্রতা কমেছে। কিন্তু এতক্ষণ আকাশভাঙা তোড়ে যা বৃষ্টি হয়েছে, তার ফল চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছে সে। গোলপার্ক থেকে ঢাকুরিয়া ব্রিজ পর্যন্ত লম্বা পুরো রাস্তাটা এখন উচ্ছল টলটলে এক ভরা নদীর চেহারা নিয়েছে। গাড়ির আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রীতিমত ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ ভাঙছে। এপাশে ওপাশে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে বেশ কয়েকটা গাড়ি। জলের তলায় ডুবে গেছে তাদের চাকা। প্রায় উদোম পায়ে জল ঠেলে ঠেলে ছোটার চেষ্টা করছে কয়েকটা ছেলে; নিশ্চয়ই দিব্যেন্দুর গাড়ির কাছেই আসছে। বন্ধ হয়ে গেলে ঠেলে তুলে দেবে ব্রিজের মুখ পর্যন্ত। অল্প জলের ওপরেই ব্রেক কষে দাঁড়াল দিব্যেন্দু। ইঞ্জিন বন্ধ না করে আন্দাজ করার চেষ্টা করলো সামনে জলের গভীরতা। যাবে, কি যাবে না!

গাড়ির ইঞ্জিন খারাপ না। কিন্তু যদি ইঞ্জিনের মধ্যে জল ঢুকে যায়! মাঝপথে গাড়ি বন্ধ হয়ে গেলে—তিন-চারটে ছেলে এগিয়ে এসেছে দিব্যেন্দুর গাড়ির কাছে। মজা, উত্তেজনায় চকচক করছে ওদের চোখ-মুখ।

ঠেলে পার করে দেব স্যার?—একটা ছেলে বললো।

গাড়ির কাঁচ তোলা। দিব্যেন্দু না-শোনার ভান করলো।

আর একটা ছেলের গলা কানে এলো দিব্যেন্দুর।

—আরে দে না শালার সাইলেন্সর পাইপে জল ঢুকিয়ে। এখানেই বসবে।

দিব্যেন্দু সতর্ক হল! ইঞ্জিনে শব্দ করে গাড়ির কাঁচ নামাল। মুখ বাড়িয়ে তাকাল ছেলেগুলোর দিকে। পিছন থেকে এগিয়ে এলো ছেলেগুলো।

—ফিয়াট পুরো ভিতর হয়ে যাবে স্যার। স্-সামনে দিলীপকুমারের গঙ্গা-যমুনার সঙ্গে রাজকাপুরের স্-সঙ্গম চলছে। শব্দ করে হেসে বাজলো ছেলেগুলো।

দিব্যেন্দুর মধ্যে কোথায় যেন দুটো রসিক বুদ্বুদ ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই অসহায় বোধ করলে আবার। ইঞ্জিনে শব্দ করে মনোবল ফেরাতে চাইলো। একটা ছেলেকে বললো—এই ব্রিজের ওপর ঠেলে তুলে দিতে কত নিবি?

সবচেয়ে লম্বা ছেলেটা এগিয়ে এলো। পায়ে হাত রেখে বসলো—চল্লিশটা টাকা দেবেন স্যার। বহুত তাগত লাগবে আজ।

দিব্যেন্দু অনুভব করলো তার গাড়িটা ছেলেগুলোর ঠেলাঠেলিতে নড়ছে। গাড়ির মধ্যে গরম ভাপ। সে ঘামছে। চাকার হাওয়া-টাওয়া খুলে দিচ্ছে কি না কে জানে। ফিসফিসিয়ে বৃষ্টি পড়ছে এখন।

—পনেরো টাকা দিতে পারি। যাস তো, নে—ঠেল।

লম্বা ছেলেটা গাড়ির ছাদে একটা টোকা মারল।—ছোড় বে। চালিশ সে পন্দেরো, পাত্তি কেয়া মুফত সে মাঙতা! আবে, এ শ্যামলা চল, আগে বড়।

গাড়ির কাঁচ আরও নামিয়ে ছিল দিব্যেন্দু। জলের ছাট লাগছে ওর মুখে। ঘাম মুছলো রুমাল দিয়ে। ইঞ্জিনটা গরম অবস্থাতে এখনও গর্জন করছে অল্প অল্প। ও স্টার্ট বন্ধ করেনি। ছেলেগুলো সরে গেছে ওর গাড়ি থেকে একটু তফাতে। কিছু বিগড়ে দিয়ে গেছে কিনা কে জানে! কিন্তু এই পথটুকু গাড়ি ঠেলে দেওয়ার জন্য চল্লিশ টাকা সে কিছুতেই দিতে পারে না। অথচ গাড়ি এখানে সে ফেলে রেখেও যেতে পারবে না। একটু এগিয়ে যদি—। সারা রাত কি এই জলের ওপর গাড়ি নিয়ে বসে থাকবে! জয়াকে খবর দেবে কী করে! সকাল হতেই ছেলেটার পরীক্ষা; মেয়েটার জ্বর বাড়লো কিনা কে জানে!

ছেলেগুলো যায়নি। মুখ ঘুরিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে, বিড়ির আগুন দেখা যাচ্ছে ওদের ঠোঁটে, হাতের ফাঁকে ফোকরে। বোধ হয় আশা করছে দিব্যেন্দু আবার ডাকবে ওদের। রাত বেড়ে যাচ্ছে। এদিকে বৃষ্টিও···। দুবার এ্যাক্সিলারেটর চেপে শব্দ করে, গাড়ি গীয়ারে দিল দিব্যেন্দু। হেড লাইটের উজ্জ্বল আলোর শূন্যতায় এক নাগাড়ে বৃষ্টির বিন্দু ঝরছে। গাড়ি নড়ে উঠে এগোতে লাগলো সামনে।

ছেলেগুলো ঘুরে তাকিয়েছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। স্থির দাঁড়িয়ে দেখছে—ভরা নদীর বুকে যেন একটা খেলনা স্টিমার এগিয়ে যাচ্ছে।

ওরা পায়ে পায়ে এগুতে লাগলো গাড়ির পিছনে। শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে সামনে জলের ঢেউয়ে চোখ রেখেছে দিব্যেন্দু। গাড়ি চলছে। চেনা রাস্তায় নিজের আন্দাজ মতো হিসেব করে মাঝখানে রেখেছে। নিশ্চয়ই চাকার অনেকখানি ডুবছে এখন জলের গভীরে। গোঁ গোঁ করে অন্য একধরনের শব্দ শুনতে পাচ্ছে দিব্যেন্দু। জোরে ঝাঁকানি খেলো একবার। নিশ্চয়ই বড় কোনো গর্তে পড়েছিল। না, বন্ধ হয়নি এখনও। খুব ধীরে জল কেটে কেটে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা। বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছে দিব্যেন্দু। এখন আর ফেরার কোনো উপায় নেই। দ্রুত আয়নায় দেখে নিল পিছনের দিকটা। লম্বা প্লাবিত রাস্তার জল ভেঙে এগিয়ে আসছে ছেলেগুলোও। ওরা কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলছে না, হাসছে না। মুখগুলো সন্দেহে থমথমে। ভেজা মাথার চুল।

চোখে আলো পড়লো দিব্যেন্দুর। ব্রিজের ওপর থেকে দ্রুত বেগে এগিয়ে আসছে একটা ট্রাক। রাস্তার জল জমা ওরা তোয়াক্কা করে না। গাঁ গাঁ শব্দ করতে করতে ঠিক বেরিয়ে যাবে। দিব্যেন্দু ভয় পেল অন্য কারণে। জলের ওপর দিয়ে দ্রুত বেগে যাওয়া লরির চাকা বড় ঢেউ তুলবে। সেই স্রোতে ওর ছোট্ট গাড়ির ইঞ্জিন ভেসে যেতে পারে।

ওর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তীব্র আলোর ঝলকানির সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে রাস্তার জল তোলপাড় করে লরিটা চলে গেল ওর ডানদিক দিয়ে। ঢেউ আছড়াচ্ছে ওর ছোট্ট গাড়ির গায়ে। গাড়িটা কাঁপছে। জল ঢুকে গেছে গাড়ির ভিতরে। নিজের চট পরা পায়ে জলের স্পর্শ অনুভব করছে দিব্যেন্দু। একটা অন্য ধরনের যান্ত্রিক শব্দ শুরু হল এইমাত্র। পিছন থেকে সিটি বাজিয়ে খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠলো ছেলেগুলো।

দরদর ঘামছে দিব্যেন্দু। গাড়িটা খুব ধীরে হলেও এখনও চলছে। জলও অনেক রাস্তায়। ইঞ্জিনের শব্দে বোঝা যাচ্ছে আর বেশি টানতে পারার ক্ষমতা নেই।

হঠাৎ চোখের সামনে অন্ধকার দেখলো দিব্যেন্দু। গাড়ির হেড লাইট নিবে গেছে, ওয়াইপারটাও থেমে গিয়েছে। বুকের মধ্যে একটা চাপ অনুভব করেই শান্ত হল সে। না, ইঞ্জিন এখনও বন্ধ হয়নি। গাড়ি এগোচ্ছে আস্তে আস্তে।

সামনে ব্রীজের রাস্তা দেখতে পেল দিব্যেন্দু। আর একটু যেতে পারলেই ঘোলা জলের তল থেকে গাড়ির চাকা কালো পীচ রাস্তার ডাঙা ছোঁবে।

দু'খানা জানালার কাঁচ নামিয়ে দিয়েছে দিব্যেন্দু। বাতাস আর গুঁড়ো বৃষ্টির ছাট আসছে ভিতরে। রাস্তার আলোয় আর অস্বচ্ছ কাঁচের মধ্যে দিয়ে যেটুকু দেখা যায়, তাইতেই গাড়ি এগোচ্ছে। কোনোক্রমে।

পিছনের ছেলেগুলো গাড়ির অনেক কাছে চলে এসেছে। ওদের চেহারাগুলোয় যেন এক ধরনের কাঠিন্য স্পষ্ট করেছে। চোখমুখে হিংস্র ক্রোধ বুঝি। দিব্যেন্দুর তাই মনে হ'ল। হতাশা আর আক্রোশে চকচক করছে ওদের নির্বাক মুখ। যেন শ্লথ হয়ে গেছে ওদেরও গতি। জল ভেঙে এতখানি রাস্তা এগিয়ে এসে ওরা ক্লান্ত।

দিব্যেন্দু অনুভব করলো ওর গাড়ির চাকা উঠে এসেছে জল ছেড়ে। হালকা হালকা লাগছে হাতে স্টিয়ারিং আর পায়ে এ্যাক্সিলারেটর। সেই সঙ্গে গরম ইঞ্জিনে জল লেগে গাড়ির পাশ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। দিব্যেন্দু জানে—এ ধোঁয়া ভয়ের কিছু না। নেহাৎ বাষ্প।

ও গাড়ি দাঁড় করাল। ইঞ্জিন বন্ধ না করে ঘর-র ঘর-র শব্দ করলো কয়েকবার। গাড়িটা যেন অসম্ভব পরিশ্রমে বিধ্বস্ত হয়ে এখন অল্প অল্প শব্দের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে।

গাড়ি থেকে নামলো দিব্যেন্দু। ঘামে আর বৃষ্টিতে ভেজা জামা সপ সপ করছে। চামড়ার চটি পায়ে ভিজে ঢোল। ভেজা জামা আর গায়ে বাইরের হাওয়া লেগে অসম্ভব আরাম লাগলো। বৃষ্টি ধরে গেছে।

পকেট থেকে সিগ্রেট আর দেশলাই বার করলো দিব্যেন্দু। ছেলেগুলো একটু তফাতেই দাঁড়িয়ে দেখছে ওকে। ক্ষোভ আর হতাশায় ওরাও যেন দিব্যেন্দু আর ওর গাড়ির মতোই শ্রান্ত।

বুক ভ'রে ধোঁয়া টেনে নেওয়ার জন্য সিগ্রেট ধরাতে গিয়ে দিব্যেন্দু বুঝলো তা সম্ভব নয়। সিগ্রেটের প্যাকেট দেশলাই দুই-ই ভিজে টইটম্বুর। ছুঁড়ে ফেলে দিল। আর ফেলতে গিয়েই দেখলো গাড়ির পিছনের একখানা চাকা ব'সে গেছে। কিছুক্ষণ আগেকার অস্বস্তিকর যান্ত্রিক শব্দটা হচ্ছিল সেই কারণেই।

সেই লম্বা ছেলেটা এগিয়ে এলো দিব্যেন্দুর কাছে। কোমরের কাছে গুটিয়ে আঁট করে বাঁধা লুঙ্গির খাঁজ থেকে সেলোফেন কাগজের মোড়ক বার করলো।

তার ভিতর থেকে শুকনো শস্তার সিগ্রেট আর দেশলাই বের করে এগিয়ে দিল দিব্যেন্দুর দিকে।

—আস্থন, স্যার। একটা ধরান। বহুত চোট গেছে আপনার।

ক্ষুব্ধ চোখে দিব্যেন্দু তাকিয়েছিল গাড়ির চাকার দিকে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে ছেলেটা তাকাল। আবার বললো—ও আপনি কিছু ভাববেন না, স্যার। এক্ষুণি ফিট করে দিচ্ছি। আস্থন, ধরান স্যার। আবে এ্যাই কচি, শ্যামলা—দাদার গাড়ির জ্যাগ্‌টা নামা না!

দিব্যেন্দু ক্লান্ত অসহায় গলায় বললো—কত লাগবে?

—কিছু না, কিছু না, স্যার। খুশিসে আপনি যা দেবেন। আস্থন, আস্থন। —ছেলেটা দেশলাই কাঠি জেলে বাড়িয়ে ধরলো। বললো—স্যার, আপনি এতোটা লড়ে এসেছেন, আমরাও আপনাকে ফলো করে এসেছি। এখন তো আমরা স্-সব্বাই গাড্ডায়। জ্যাগ দিয়ে ও গাড়ির চাকা আপনি কি আর···

ঝকঝকে আকাশে সলমা-চুমকির মতন তারা ফুটেছে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় ব্রীজের নিচে জলে এখন ছোট ছোট স্রোত বইছে। দিব্যেন্দু দেখতে পাচ্ছে শ্রান্ত অথচ সবল কয়েকটা হাত এখন দ্রুত তার গাড়ির চাকা লাগিয়ে ফেলছে অসম্ভব উত্তেজনা উৎসাহে। আর তার নিজের বুকটা ভ'রে ভ'রে টেনে নিতে পারছে শস্তা সিগ্রেটের ধোঁয়া অসম্ভব আরামে। পৃথিবীটাকে বড় সুন্দর মনে হল তার।

মকবুল ফিদা হুসেনের সঙ্গে পার্ব্বতী মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ সাক্ষাৎকার

[বেশ কয়েক বছর আগে আমাদের জন্য এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ শিল্প আন্দোলন সংগঠনের অন্যতম পুরোধাকর্মী পার্ব্বতী মুখোপাধ্যায়। বাড়ি-বদলের সময় সংরক্ষণের অসাবধানতায় বেশ কিছুদিন এই টেপের ক্যাসেটটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি পার্ব্বতী মুখোপাধ্যায়ের কন্যা-জামাতা মৌসুমী ও শিলাজিৎ ঘোষ টেপটি উদ্ধার করে আমাদের দেন। সাক্ষাৎকারটি বলাবাহুল্য ইংরেজিতে। বাংলা রূপান্তর করেছেন আরতি সেন। এদের সকলের কাছেই আমাদের কৃতজ্ঞতা।

এ প্রসঙ্গে দু'একটি কথা জানিয়ে রাখা দরকার। প্রশ্নকর্তা পার্ব্বতী মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ টেপে স্পষ্ট হলেও হুসেনের কণ্ঠ একটু জড়ানো ছিল। দু'একটি জায়গায় তার উত্তর প্রায় না বোঝবার মতো নিচু। কোথাও প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দেননি বা উত্তর সমাপ্ত করেননি। তাই যুক্তিসিদ্ধ অনিবার্যতায় কয়েকটি প্রশ্নোত্তর একেবারেই বাদ দিতে হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে একই উত্তর বা প্রশ্ন শুধুমাত্র অন্যভাষায় ফিরে ফিরে এসেছে, সেখানে অনিবার্যভাবেই যৎকিঞ্চিৎ সম্পাদনার প্রয়োজন হয়েছে মূল বক্তব্য অবিকৃত রেখে। —বিভাব সম্পাদকমণ্ডলী]

পার্ব্বতী : ফিদা, আজ তোমার সামনে কিছু প্রশ্ন রাখতে চাই। শুরুতেই জানিয়ে রাখি, প্রশ্নগুলি কিন্তু প্রচলিত রীতির হবে না। ভারতীয় শিল্পজগতে তোমার খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা আজ অবিসংবাদিত। তোমাকে কেউ 'ফেনোমেনন' কেউ-বা 'লেজেণ্ডারি' ব্যক্তিত্ব বলছেন আজকাল। কিন্তু নিজের সম্পর্কে তোমার কি ধারণা তা আমাদের বল।

ফিদা : এটা কিন্তু খুব চতুর ও কৌশলী প্রশ্ন হলো। দেখ পার্ব্বতী, শুধু শিল্পই তো শিল্পীর অস্তিত্বের সবখানি নয়। তার চারপাশে আরো বহু তাৎপর্য, ধ্যেয়ান ও প্রেক্ষিত থাকে। এই যে মানবজীবন, তা এতই ব্যাপক ও সদা-প্রসারণশীল, এত তীব্র অনুভূতিময়, আমাদের অঙ্কনশিল্প তার একটি অংশ মাত্র। খণ্ডিত

হলেও এই শিল্প মগ্ন করে রাখে আমাদের। জীবনের অনুশীলন পরিশীলনই হচ্ছে তোমরা যাকে শিল্প বলো। সেটাচিত্র শিল্প, সংগীত, সাহিত্য—সব কিছুই হতে পারে। মানুষকে তার যথার্থ পরিবেশে দেখা। দেখার সেই আনন্দ নতুন ভাবনা চিন্তায় উদ্দীপ্ত করতে পারে শিল্পীকে, শিল্প হয়ে উঠতে পারে সত্যিকারের সৃষ্টি। মানুষের বিশাল জীবনপ্রবাহের পটভূমিতে আমাদের এই অঙ্কনশিল্পকে অনেকটাই সীমিত শিল্পমাধ্যম বলবো।

পা : শিল্পীজীবনে কখনো তোমার ধ্যানধারণায় ছবিকে প্রকাশ করতে গিয়ে, এই মাধ্যমকে সীমিত মাধ্যম ভেবে তার সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্ব ঘটেছে ?

ফিদা : জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে গিয়ে দ্বন্দ্ব তো আসবেই। বাস্তবে যা সত্য, তা প্রকৃত সত্য নাও হতে পারে। সেই শিল্প-মাধ্যম সংগীত, সাহিত্য, চিত্রাঙ্কণ যাই হোক না কেন। শিল্পীকে গভীরভাবে ভাবতে হবে ; প্রাণিত হয়ে বাস্তবতাকে তার চলিত অর্থ থেকে মুক্তি দিতে হবে। রেখার সঙ্গে ছায়ার মতো মিশে যেতে হবে। প্রয়োজনবোধে বাস্তবতার সমস্ত লৌকিক ধারণা ধ্বংস করতে হবে।

পা : তোমার মূল উদ্দীপনা, চিত্রশিল্পে ফিরে যাচ্ছি। কবে থেকে তুমি প্রথম আঁকতে শুরু করো ?

ফিদা : প্রশ্নটা বড়ই ক্লিশে প্রশ্ন। আমার তো মনে হয় আমার তেমন কোনো প্রস্তুতি নেই।

পা : না না, আমি বলতে চাইছি প্রচলিত অর্থে যাকে লোকে ছবি আঁকা শেখা বলে, তেমন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কি তোমার আছে ?

ফিদা : একদম না। সারাজীবন বাইরের দৃশ্যজগত নিয়ে এত মগ্ন থেকেছি, কোনো নিয়মনির্দিষ্ট শিক্ষা নেবার প্রয়োজনই অনুভব করিনি কখনো। হিমালয়ের সৌন্দর্য্য যেমন আমাকে মুগ্ধ করেছে, তেমনি মোনালিসার রহস্যময়তাও আমাকে টানে। এমনকি সুন্দর ফোটোগ্রাফও আমাকে উপকরণ জুগিয়েছে।

পা : কোনো পূর্বসূরী মহান শিল্পীর প্রভাব কি তোমার ওপর আছে ?

ফিদা : সমস্ত চিত্রশিল্পজগত থেকেই আমি উপাদান সংগ্রহ করি ও করেছি। পূর্বসূরীদের সমস্ত উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্মেও আমি অনুপ্রাণিত হই। শিল্প আকাশ থেকে নামে না। তার ভিত্তি মাটিতে। মাটির শিকড়ই তাকে আকাশের দিকে তুলে ধরে। গত ৫০০ বছরের শিল্প-ইতিহাস লক্ষ করো।

তার বেশ কিছুই নানানভাবে উঠে এসেছে আমার তুলিতে। অবশ্য জীবন ও প্রকৃতি ও তার সঙ্গে এসেছে।

পা : শিল্পীজীবনে কখনো ব্যক্তিত্বের সংকট অনুভব করেছো ?

ফিদা : ব্যক্তিত্বের সংকট ? সে আবার কি ? তুমি ঠিক কি বোঝাতে চাইছো ?

পা : আমি বোঝাতে চাইছি শিল্পীর নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার সংকট। তোমার জীবনে সে-রকম সংকট এসেছে কখনো ?

ফিদা : নিজের পায়ের দাঁড়াবার মাটি নিজেকেই খুঁজে নিতে হয় শিল্পীর। প্রত্যেক শিল্পীর জীবনেই (এমনকি মানুষ হিসাবেও) এটা ঘটে। সাধারণ মানুষের তুলনায় শিল্পী একটু বেশী সংবেদনশীল, স্পর্শকাতর। শিল্পী নিজে সেটা জানেন। কেননা কোন প্রস্থানভূমিতে দাঁড়িয়ে তার শিল্পকর্ম গড়ে তুলছেন —প্রকৃত শিল্পীকে তা জানতেই হয়। আমি তো এই কম বেশি চল্লিশ বছরের শিল্পজীবন অতিক্রম করে আসার পরও নিশ্চিত নই কালের নিরিখে আমার শিল্প কোনো মূল্য পাবে। এই দোলাচলের সংকট পৃথিবীর সমস্ত শিল্পীর জীবনেই থাকতে বাধ্য।

পা : তুমি তো নিয়ত সৃজনশীল উদ্যমী শিল্পী। শিল্প প্রবক্তাদের কেউ কেউ তোমায় চিত্র-বিবর্তনকে বা উত্তরণকে তিনটি পর্বে ভাগ করে দেখাতে চেয়েছেন। তুমি কি সেটা মানো ?

ফিদা : এ ধরন পর্বভাগে আমার বিশ্বাস নেই। উত্তরণ এক জিনিস, আর ক্রমশই দুর্দান্ত হয়ে ওঠা অন্য জিনিস। সত্যিকারের বোদ্ধা প্রবক্তারা পর্ব-টর্বতে বিশ্বাসী নন। দেখতে হবে মনের দিক থেকে শিল্পী সজাগ কিনা। গত ষাট বছরের শিল্পের ইতিহাসকে, তার এগুনো পেছোনোকে, পর্বভাগে না বুঝিয়ে তাকে সামগ্রিক ভাবে বিংশশতাব্দীর শিল্পকর্ম বলাই শ্রেয়। বছর দিয়ে শিল্পী জীবনকে ভাগ করায় আমার বিশ্বাস নেই। আমার শিল্পজীবনে ৩।৪টি পর্ব আছে কিনা জানি না। থাকলেও প্রচলিত নিয়মে তাকে বর্ণনা না করাই ভালো।

পা : তোমার শিল্পকে এ্যাবস্ট্রাকট বলবে না মৌলপন্থী বলবে ?

ফিদা : সিম্বলিক বা প্রতীকী বলাই ভালো। মানুষ, বিশেষত নারী, আমার প্রিয় প্রতীক। এই কারণেই আমি বারবার রামায়ণ মহাভারতের নারীচরিত্রের কাছে ফিরে যাই। ভারতীয় সভ্যতার প্রধান উৎসই হলো এই রামায়ণ মহাভারত।

পা : তোমার ছবিতে আমরা প্রায়ই দুর্গার মোটিফ দেখি। দুর্গা তোমার তুলিতে প্রায়ই ফিরে ফিরে আসে।

ফিদা : হ্যাঁ, দুর্গা হলো শৌর্য ও সুন্দরের প্রতীক। লক্ষ্য করলে দেখবে বিভিন্ন সময়ের ভারতীয় ভাস্কর্যেও এই দুর্গা-প্রতীক বারবার ফিরে এসেছে। শক্তি ও শৌর্যের প্রতীক অন্যান্য ভারতীয় দেবদেবীও আমাকে আকর্ষণ করে।

পা : চিত্রশিল্প কি জীবন অ-সম্পর্কিত, না তা জীবনের রেখা ও আকারের চিত্র-বর্ণনা মাত্র ?

ফিদা : চিত্র হলে তো তার আকার থাকবেই। তবে দেখে বোঝা যায় এমন আকার আরোপে আমি বিশ্বাসী। অবশ্যই তা নন্দনতত্ত্বের অর্থে।

পা : প্রশ্ন উঠতে পারে, এই বিশেষ আকার সচেতনতা কি শিল্পসত্যের বিরুদ্ধে যায় না, বিশেষত সেই আকার যদি পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা থেকে উঠে আসে। যদি না তা শর্ত-স্বাধীন হয়!

ফিদা : আমার প্রত্যেক ছবির পেছনেই কোন না কোন নির্দিষ্ট ভাবনা থাকে। থাকে একটি বক্তব্য, বা মানবতার স্বপক্ষে কোনো রেখায়িত প্রার্থনা। শুধু সৎ, সুস্থ বা আস্তিক বলে আমার ছবিকে বোঝানো যাবে না। ছবি আঁকার সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই শিল্পীর স্থির আত্মময়তার ফসল। তার নিন্দা বা প্রশংসা দুই হতে পারে।

পা : আমি বলতে চাইছি ভারতীয়তার কথা যা একটু আগে বললে···

ফিদা : (কথা কেড়ে নিয়ে) শুধু সেজানে পিকাসো (···স্বর অস্পষ্ট) শুধু তাদেরই বা আলাদা করি কেন···সমস্ত সার্থক পশ্চিমী শিল্পধারার উৎসই হচ্ছে প্রাচ্য, বিশেষ করে ভারতবর্ষ, আলজিরিয়া, মরক্কো থেকেও ঐ সব পশ্চিমি শিল্পীরা তাদের ঋণ নিয়ে পরে নিজের ধ্যানধারণায় জারিত করে মৌলিক শৈলী বলে চালিয়ে দিয়ে পার পেয়ে গেছে। আমরা যাকে টু-ডাইমেনশনাল বা দ্বিতীয়-মাত্রিক ছবি বলি—যা নাকি একান্তভাবেই প্রাচ্যের ; পশ্চিমী শিল্পীরা তা আত্মসাৎ করে নিজেদের বলে চালিয়েছে। বিশ্ববীক্ষা ও শিক্ষার অভাবে আল-জিরিয়া মরক্কোর বা অন্যান্য প্রাচ্যদেশের স্থানীয় শিল্পীরা—নিজেদের প্রকৃত শক্তি সম্পর্কে যাদের কোনো ধারণাই ছিল না—তারা পশ্চিমের এই আত্মস্থ করে নেবার ব্যাপারটা শনাক্ত করতেই পারেনি···

পা : জ্যামিতিক রেখাঙ্কন সম্পর্কে কি মত ? একটা বিশেষ জ্যামিতিক যুক্তি থাকা কি চিত্রশিল্পের পক্ষে আদৌ জরুরী ?

ফিদা : শুধু চিত্রশিল্পে কেন ! বিশ্বসংসারে সব কিছু, সব আকারই জ্যামিতির অন্তর্গত।

পা : এই জ্যামিতিক রেখাঙ্কন ও কিউবিজিমের মূল পার্থক্য কোথায় ?

ফিদা : মানুষের শরীরে জ্যামিতি বলো, কিউবিজিম বলো—একটা আকারের আভাস থাকেই।

পা : আচ্ছা সেক্স বা যৌনচেতনা কি চিত্রশিল্পের পক্ষে একান্তই জরুরী ?

ফিদা : নিশ্চয়। নরনারীর মিলনই তো সৃষ্টিকর্মের মূল কথা। শিল্পী তার মুখোমুখি হবেন নিশ্চয়। যতক্ষণ এই চেতনা থাকবে ততদিন তিনি সৃষ্টিশীল থাকবেন। সেই অর্থে যৌনতা অলঙ্ঘনীয়।

পা : যৌনতা কি তোমার ছবিতে তেমন প্রাধান্য পেয়েছে ?

ফিদা : (সরাসরি উত্তর না দিয়ে) আমার তো মনে হয় সমস্ত দৃশ্যবস্তুকেই শিল্পের তাড়নায় বিশেষরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে হয়। এই চেতনাই আমার সব ছবিতে প্রবলভাবে মুখ দেখায়। ধর, যখন আমি ঘোড়া আঁকছি। স্পষ্টতই তাকে দুটি ভাগ করে নিয়ে রেখায় ফোটাতে পারি। স্ফুরিতনাসাসহ ঘোড়ার মাথাকে এমন রূপ দিতে পারি, অনেকটাই তা ঘোড়ার মাথার মতো হলেও তাতে উত্তেজিত জ্বাগনের মাথার রূপারোপ ঘটতে পারে। কিংবা ঘোড়ার পশ্চাৎদেশ এমনভাবে আঁকলাম যাতে একই সঙ্গে তাতে নারীনিতম্বেরও ডৌল ফুটল।

পা : যৌনতার সীমা নিয়ে কি তুমি কোনো বিশেষ চিন্তাভাবনা কর ?

ফিদা : মানুষ তো যৌনতা নিয়েই জন্মায়। জন্ম, সৃষ্টি, যৌনতা—একে অন্যের পরিপূরক। যৌনতা না থাকলে পৃথিবী থেমে যেতো একসময়। সুস্থ যৌনতা স্বাস্থ্যকর, সুন্দর এবং পবিত্র।

পা : তোমার ফিল্ম তৈরি নিয়ে কিছু বলো। তোমার প্রথম ছবি তো খুবই প্রশংসিত হয়েছিল। নতুন কোনো ফিল্ম তোলার পরিকল্পনা আছে ?

ফিদা : ফিল্মের মিডিয়ামটা এমন একটা মাধ্যম যা একান্তভাবে আরো বহু ভিন্ন শিল্পশৈলীকে আত্মস্থ করে এক সময়য় ভূমিতে এনে দাঁড় করাতে পারে।

পা : ছবি আঁকাটা কিন্তু নিতান্ত একার, ফিল্ম নির্মাণ একই সঙ্গে অনেকের।

ফিদা : চিত্র অঙ্কনের ধরন একরকম, ফিল্মের নির্মাণ একেবারেই অন্যরকম। অবশ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে ফিল্মই অধিকতর উপযোগী মাধ্যম।

পা : শিল্প হিসাবে ফিল্ম কি অঙ্কন শিল্পের মতো গুরুত্ব দাবি করতে পারে ?

ফিদা : আগেই তো বললাম ছবি আঁকার ব্যাপারটা একার, ফিল্ম একই সঙ্গে অনেকের। তবে বিভিন্ন চরিত্রশিল্পীদের দিয়ে তাদের অভিনয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় আনাটাকে পরিচালকের শিল্পকর্ম বলা উচিত নিশ্চয়ই। সত্যজিৎ রায়ের মতো আমার ফিল্মের সমস্ত দিকগুলো আমি নিজেই দেখি। একই ক্যানভাসে শিল্পীর তুলিতে যেমন নানান রং, আমার ফিল্মের বিভিন্ন চরিত্ররাও তেমনি। যখন কোনো সুন্দরী মেয়েকে দেখি, কোন ভূমিকায় তাকে নিলে সে আরো সুন্দর হয়ে উঠতে পারে, চিত্রপরিচালক হিসাবে আমাকে তা ভাল করে ভাবতে হয়।

পা : তুমি কি নিজেকে একজন আধুনিক শিল্পী ভাবো ?

ফিদা : এই আধুনিক শব্দটা বড় ধন্ধের, ধাঁধারও। তুমি আমাকে সমকালের বলতে পারো। অথবা যে অর্থে রবীন্দ্রনাথ এখনো আধুনিক সে অর্থে আমাকে আধুনিক বললে আপত্তি নেই।

পা : রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্পর্কে তোমার কি মত।

ফিদা : রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এতই বিস্ময়কর, সর্বত্রসঞ্চারী যে তিনি ছবি আঁকুন, কবিতা বা নাটক লিখুন, সবই এক আলাদা তাৎপর্য পায়। অতি সাধারণ বিষয়কে অসাধারণ করে তোলার ক্ষমতা তাঁর ছিল। ছবি আঁকাটা তার সাহিত্যকর্মের অবসরের ফাঁকে কোনো পরিপূরক বিনোদন ছিল না। কি গঠনে, কি বিষয়ে, রবীন্দ্রনাথের ছবি একেবারেই অন্যরকম যা বিশেষ মনযোগের দাবি রাখে। আমাকে যদি সরাসরি প্রশ্ন করো তবে আমি বলবো রবীন্দ্রনাথের অনেক ছবি মোনালিসার চেয়েও গরীয়ান। মোনালিসা ছবিটি তো শুধু অতি নিপুণ অঙ্গসংস্থানশৈলীর এক খ্যাত উদাহরণ মাত্র। কোনক্রমেই মোনালিসাকে মহান যুগোত্তীর্ণ শিল্পকর্ম বলবো না আমি। কিছু শিল্প-সমালোচক, লেখক ও শিল্পীর এবং স্বদেশবাসীর সমবেত প্রচারেই এই ছবিটি সম্পর্কে এই অহেতুক বোকা মোহ তৈরি হয়ে গেছে।

পা : ফিদা হুসেনের মুখেই এই অসমসাহসী কথা মানায় !

ফিদা : (উচ্চ হাস্য)

পা : তোমার কি মনে হয় নগ্নতাই সমস্ত মহান শিল্পের পূর্বশর্ত ?

ফিদা : আমাদের ভারতীয় শিল্পে, বিশেষত ভাস্কর্যে, রাজা-রানী, এমনকি দেব-দেবীরাও তো নগ্নরূপে পাথরে শিল্পীত।

পা : চিরকালীন সত্য যেমন আচ্ছাদনহীন, সেরকম অর্থে বলছো ?

ফিদা : প্রকৃতিও তো সব অর্থেই নগ্ন। তাকে কি তুমি অসুন্দর বলবে ? Nudity আর Nackedness এক কথা নয়।

পা : তুমি ঠিক কি বোঝাতে চাইছো···

ফিদা : (মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) যা কিছু নগ্ন তাই পবিত্র। চল্লিশের শুরুতে বিদেশের চিত্রকলায় নগ্ন রূপারোপের যে জোয়ার এসেছিল, এদেশে অনেক আগেই তা ছিল। চল্লিশের ভারতবর্ষে দুশো বছরের ব্রিটিশ দাসত্বের বিরুদ্ধে দেখা দিয়েছিল অন্যরকম বিদ্রোহ—যার নাম স্বাদেশিকতা। শিল্পের ক্ষেত্রে বিদ্রোহ অন্যরকম। তুমি মিউজিয়মে গিয়ে গ্রীক ভাস্করদের মূর্তিগুলি দেখ, সেখানে স্থির পাথরে এক অস্থির বিদ্রোহ টের পাবেই।

পা : আচ্ছা, এখনকার কোন কোন শিল্পীর ছবি তোমাকে আকর্ষণ করে ?

ফিদা : আলাদাভাবে কার নাম করবো ! সকলেই নতুন পথ সন্ধানে ব্যস্ত। সব মিলেই তো একটি অখণ্ড প্রবাহমান শিল্প আন্দোলন। যার গতি কখনই থেমে থাকেনি।

পা : না, তবু যদি কারো নাম আলাদা করে বলার ইচ্ছে হয় তোমার ?

ফিদা : উল্লেখযোগ্য অনেকেই আছে। যেমন গাইতুণ্ডে—রঙের ওপর ওর বিস্ময়কর দখল আমাকে বিস্মিত করে। তারপর আছে কলকাতার গণেশ পাইন। অবশ্যি এদের কথা আগেও বলেছি। আমার সংগ্রহে আমার নিজের পছন্দের প্রায় ত্রিশ চল্লিশটি ছবি আছে বিভিন্ন-শিল্পীর।

পা : যাকে বলে শৈল্পিক নিঃসঙ্গতা মননের একাকীত্ব, বা ধরো তাকে যদি বলি বিষণ্ণতা—এরা কি কখনো তোমার ছবিতে প্রভাব ফেলেছে ?

ফিদা : তেমন কিছু নয়, আসল কথা আঁকা ছবিটা উৎরে গেল কিনা। মানুষ এখন ছবি চিনতে শিখেছে···

পা : ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু বলো। এই যেমন প্রেম, নারী, নেশা, বিচ্ছিন্নতাবোধ ইত্যাদি···

ফিদা : আমি বিবাহিত ছয় সন্তানের জনক। কফি ছাড়া অন্য নেশা নেই। মদ সিগারেট ছুঁই না।

প : বিবাহ-বহির্ভূত কোনো পরকীয়ায় কি তুমি বিশ্বাসী ?

ফিদা : ব্যাপারটা হয়তো খুব মন্দ না। তেমন যোগ্য সঙ্গী পেলে পরকীয়া খারাপ কি !

পা : প্রতি পদক্ষেপে যারা সংগ্রাম করে চলেছে সেই নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের সম্পর্কে তোমার কিছু বলার আছে ?

ফিদা : তুমি কি উপদেশের কথা বলছো ? না, দেওয়ার মতো কোনো উপদেশ আমার নেই। এইটুকুই বলবো, তরুণ শিল্পীরা, তোমরা যা আঁকবে তাতে যেন ভারতীয় ঐতিহ্যের নির্ভুল স্পর্শ থাকে।

পা : এখনকার শিল্পসমালোচনার মান সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ?

ফিদা : এখনকার সমালোচনার মান খুবই নিচু। অবশ্য এর জন্য আমি শুধু সমালোচকদের দায়ী করবো না। যে সব কাগজে এই সব সমালোচনা প্রকাশিত হয়, সেই সব কাগজের মালিকরাও অনেকাংশে দায়ী। কেননা আলোচকদের তেমন টাকা দেওয়া হয় না। যৎসামান্য সম্মানমূল্য পেলে শিল্পসমালোচকরা তেমন পরিশ্রমই বা করতে যাবেন কেন ? সেটা আশা করাই তো অন্যায় !

পা : ললিতকলা অকাদেমী সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ?

ফিদা : প্রত্যেক অকাদেমীরই একটা সুস্থ প্রকাশ্য ভূমিকা থাকা উচিত। লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু হয় না, হওয়া কোনমতেই উচিত নয়। আবার প্রত্যেককে খুশি করাও সম্ভব নয়। একটা সৎ নিরপেক্ষ প্রচেষ্টা চলছে—এটা যেন স্পষ্ট বোঝা যায়।

পা : রাজনীতি বা ধর্ম সম্পর্কে মতামত ?

ফিদা : রাজনীতিতে আমার কোনো আগ্রহ নেই। আর আমার ধর্ম তো হলো ছবি। সংগীত, কবিতা, অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের মত চিত্রশিল্পও একটি প্রধান শিল্পধর্ম। সৎ শিল্পী তো ক্যানভাসে রঙ-এর কবিতাই আঁকেন। তবে ছবি সংগীতের খুব কাছাকাছি। আমি যখন ছবি আঁকি আমার ঘরে নিচু স্বরে রেকর্ডে সংগীত বাজতে থাকে। আমাদের জীবনে সংগীত খুবই প্রয়োজনীয়।

পা : শিল্পীরা তো শুনি নানারকম টেনশনে ভোগেন। ছবি আঁকবার সময় তোমার কি কোনরকম টেনশন থাকে ?

ফিদা : আদপেই না। এতবছর ছবি আঁকছি, যে অর্থে তুমি টেনশন বলছো, সে রকম বিব্রত হবার মতো কোনো টেনশন অনুভব করিনি।

পা : তুমি কী প্রেরণায় বিশ্বাস কর।

ফিদা : না।

পা : পদমশীর মতো কোন অলৌকিকত্বের ?

ফিদা : না। তাহলে প্রকাশ্যে লোকের সামনে ছবি আঁকতে পারতাম না। এইতো কিছুদিন আগেই বহু লোকের সামনেই বড় বড় ছটা ছবি আঁকলাম। প্রেরণা অলৌকিকত্বের ভূমিকা যে ছবি আঁকায় নেই, সেটা বোঝাবার জন্যই ওরকম প্রকাশ্যে এঁকেছিলাম। ছবির বিষয়ই ক্যানভাসে রঙকে ডেকে নেয়। ছবিটা কি মাধ্যম বা আঙ্গিকে গড়ে উঠবে তা ছবির বিষয়ই এক আন্তর নিয়মে নির্ধারিত করে দেয়। ছবি আঁকা সম্পূর্ণ শেষ হবার পরই একমাত্র বোঝা যায় ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো।

পা : ফিদা, সবরকম অঙ্কনশৈলী তো তোমার নখাগ্রে। কিন্তু যখন মন স্থির করে আঁকতে বসো, অঙ্কন চলাকালীন কোনো উৎকণ্ঠায় কি তুমি আক্রান্ত হও না ? হও না রঙের সঠিক নির্বাচন সম্পর্কে ভাবিত ?

ফিদা : ছবি আঁকা শুরুর আগে মোটামুটি একটা ধারণা তো করে নিতেই হয়।

পা : তোমার প্রত্যেক ছবিরই একটা আলাদা তাৎপর্য আছে। তুমি দর্শককে কোথায় পৌঁছে দিতে চাও সেটা নিশ্চয়ই ভেবে নাও ছবি শুরুর আগে ?

ফিদা : সব ক্ষেত্রেই ভেবে শুরু করতে হবে তার কোনো মানে নেই।

পা : এ্যাবস্ট্রাকশন সম্পর্কে তোমার কি মত ?

ফিদা : এ সম্পর্কে আলাদা করে ভাবিনি। এ পদ্ধতিতে এঁকেও অনেকে নাম করেছেন। তবে ইদানীং এ্যাবস্ট্রাকশনের একটু বাড়াবাড়ি দেখা যাচ্ছে !

পা : এ্যাকশন পেয়নটিং—যেমন জ্যাকসন পোলক, তোমার ধারণা কি ?

ফিদা : সবরকম নিয়ম ভেঙে পোলক প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিলেন। পিকাসো মাতিসও তাঁদের সময়ের চলিত শিল্পধারণাকে ভেঙে নতুন প্রেক্ষিত গড়ে তুলেছিলেন।

পা : স্থরিয়ালিজমের বদলে চরম-বাস্তববাদের এখনকার প্রবর্তনা সম্পর্কে তোমার ধারণা ?

ফিদা : যে কোনো শৈলীতেই আঁকা হোক না কেন। ছবিটা শেষ অবধি কিছু হয়ে উঠল কিনা সেটাই দেখতে হবে।

পা : রামকিংকর বেজ সম্পর্কে ধারনা।

ফিদা : রামকিংকর খুবই বড় মহান শিল্পী। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কাজগুলি নিয়ে মূলত তিনি শান্তিনিকেতনেই থেকে গেলেন।

পা : তোমার পরবর্তী ফিল্মের বিষয় নিয়ে ভাবছো ?

ফিদা : আগে শর্ট ফিল্ম করেছি। অনেকদিন থেকে একটা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের, এই ধরো

একঘণ্টা দেড়ঘণ্টার মতো সময়ের ছবি তুলবো ভাবছি। কমারশিয়াল হবে না ছবিটা। তবে ছবি করার পর যদি টাকাটা ফেরত আসে মন্দ লাগবে না।

পা : (হেসে) যেমন তোমার প্রতিটি ছবি এখন প্রচুর টাকা আনছে!

ফিদা : চার্লস চ্যাপলিনকে নিয়ে ওই গল্পটা কি জানো? চ্যাপলিন বলতেন "শুরুতে আমি কিছু টাকা করবো ভেবেই শুধু ছবি করতাম। যাতে কোন-ক্রমে খেয়ে পরে বাঁচতে পারি। পরে লোকে বললো ওগুলি প্রত্যেকটাই নাকি একেকটা মহান শিল্পকর্ম! আর আমি বিখ্যাত হয়ে গেলাম"। (ফিদার দীর্ঘস্থায়ী উচ্চহাস্য···)

পা : আচ্ছা ফিদা, এতখানি সময় দেবার জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।

গুণানন্দর গোল

গুণানন্দ ঠাকুর

গুণানন্দ হঠাৎ দেখিতেছে যে, সে যে সমাজে বাস করে তাহার কোন কিছুই আর তাহার বোধগম্য হইতেছে না। ইহাতে তাহার বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। পাঠক তুমি কি মুখ টিপিয়া হাসিতেছ? তোমার কি মনে হইতেছে যে বুড়া তো বহুদিনই ভীমরতীর দশাপ্রাপ্ত, তাহার পক্ষে আহার ভিন্ন অন্যকিছুই আর বোধগম্য নয়। গুণানন্দ ভোজনরসিক ইহা সে মানিবে। কিন্তু পাঠক তোমার ওই হাস্য সংবরণ কর। কারণ গুণানন্দর মুশকিল গুরুতর। সে তোমার সাহায্যপ্রার্থী।

তোমার স্মরণ থাকিতে পারে কিছুদিন পূর্বে 'ক' পার্টি সারা বঙ্গে ছাত্র ধর্মঘটের আহ্বান করিয়াছিল। এই বৃদ্ধবয়সে গুণানন্দর স্মরণশক্তি অনেক কমিয়া গিয়াছে—হাটে ব্রাহ্মীশাক সুদুর্লভ—সুতরাং ঠিক কোন বিষয়ে এই উদাত্ত আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছিল সে আর স্মরণ করিতে পারিতেছে না। সত্য কহিতে দোষ নাই হেতুটা অকিঞ্চিৎকর, 'ক' পার্টির পেশীর পরীক্ষাই আসল। যাহা হউক 'খ' পার্টি এই আহ্বান শুনিয়াই ইহার প্রতিবাদ করিল। গুণানন্দ বড় প্রীত হইল। বুড়া ছাত্রদের অধ্যয়নের সময়টি বৃথা কার্যে ব্যয় করার বিরোধী। তাহার ধারণা ছাত্রসমাজ ধীযুক্ত হইলে সুপণ্ডিত হইলে, দেশের মঙ্গল। সুতরাং 'খ' পার্টি যখন কহিল তাহারা এই ধর্মঘটের বিরোধিতা করিতেছে তখন গুণানন্দর আহ্লাদের সীমা রহিল না। সে বিনা অহিফেন সেবনেই স্বল্প দেখিতে লাগিল, বঙ্গে সুবর্ণ দিন আগত প্রায়। এই মহান ভূখণ্ডের বিদ্যায়তনগুলি আবার সরস্বতীর আরাধনার পীঠস্থান হইয়া উঠিয়াছে। আবার সর্বভারতীয় পরীক্ষায় বঙ্গ সন্তানরা দলে দলে সাফল্যলাভ করিতেছে। আবার গবেষণার ক্ষেত্রে বাঙালি জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসুদের ন্যায় দিকপালরা উপস্থিত হইতে চলিতেছেন। তাঁহাদের ন্যায়ই এই দিকপালরা শ্বেতদ্বীপ পরিহার করিয়া গুণানন্দর জন্মস্থান ডিহি কলিকাতাকেই তাহাদের কর্মস্থল নির্বাচন করিয়াছেন। স্বপ্নে আনন্দের শিহরণে গুণানন্দ শিহরিত হইল।

সেই ধর্মঘটের দিনে কলিকাতা এবং অধুনা পশ্চিমবঙ্গ খ্যাত ভূখণ্ডে বড়

অশান্তি হইল। অগ্নিকন্দুকের ঘায়ে জনৈকা নারী আহত হইল। জনৈক যুবক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ইহাতে মহাগোল উপস্থিত হইল। 'ক'-এর লোকজন বলিতে লাগিল এই অগ্নিকন্দুক দুষ্কৃতকারী 'খ'-এর লোকজন মারিয়াছে। আহত ও মৃত আমাদের সমর্থক। কিমাশ্চর্য অতঃপরম, 'খ'-ও দাবী করিল যে অগ্নিকন্দুক ছুঁড়িয়াছে 'ক' আর আহত আর মৃতরা 'খ'-এর লোকজন। গুণানন্দ প্রাচীন লোক, তাহার কোন কিছুই ঠাহর হইল না। সে দেখিতে পাইল 'ক' কিংবা 'খ' দলের সমর্থন-পুষ্ট ছাত্ররা অগ্নিকন্দুক লইয়া একে অন্যকে আক্রমণ করে। 'ক' এবং 'খ' দলের মাতব্বর ব্যক্তিরা কেহই বলিলেন না যে ইহারা ছাত্র নয়। বলিলেন, ইহারা ছাত্র তবে আমাদের গোষ্ঠীর নয়। দুষ্কৃতকারীরা যাহাদেরই হউক আহত কন্যাটিকে লইয়া বড় ধুমধাম হইল। মন্ত্রী ছুটিলেন। বৈদ্য উপাচার্য নাড়ি টিপিলেন। মন্ত্রীর গোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন সংবাদপত্রের আলোক-চিত্রতে গুণানন্দ দেখিল আহত কন্যার একটি শয্যা জুটিয়াছে। যাহারা অতটা সহানুভূতিশীল নহে, তাহাদের সংবাদপত্রে দেখিল কিশোরীটি ভূমিশয্যায় শায়িত। দুইটিই আলোকচিত্র অথচ একদম বিপরীতধর্মী। ভীমরতীগ্রস্থ গুণানন্দ বুঝিল না কে মারিয়াছে কাহারা আহত হইয়াছে এবং তাহাদের চিকিৎসা কিরূপ হইতেছে। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া সরস্বতীর একনিষ্ঠ সাধকরা ভয়ানক দ্বন্দ্বে মাতিলেন। পথচারীদের জীবন অতিষ্ঠ হইল।

তাহার পরদিন 'খ' আহ্বান জানাইল ছাত্র ধর্মঘটের। কাল যাহারা অধ্যয়নকে তপস্যা মনে করিয়াছিল, আজ তাহারা গতকাল তাহাদের বিরোধীরা যাহা বলিয়াছিল তাহাই বলিতে শুরু করিল। হা হতোহস্মি। আজ দেখিলাম 'ক' সরস্বতীর একনিষ্ঠ সাধক হইয়াছে। কাল যাহারা পদ্মবনে হস্তী, আজ তাহারা তাপস বালক।

গুণানন্দ বুঝিতে পারিল না কি হইতেছে। নব্যতর ন্যায়শাস্ত্র তার অধীত বিদ্যার মধ্যে পড়ে না। সুতরাং তাহার চক্ষে সরল ভাবে যে সত্যটি ধরা পড়িল তাহা বড়ই পীড়াদায়ক। 'ক' এবং 'খ' দুজনের কেহই বঙ্গে শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহী নয়। তাহারা নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধেই অতি আগ্রহশীল এবং সেই স্বার্থটি যাহাই হউক তাহার সহিত বঙ্গভূমির ভাল-মন্দর কোন যোগ নাই।

পাঠক আবার তুমি হাসিতেছ। তুমি ভাবিতেছ বুড়া কি মৌলিক কথাই না কহিল। তুমি তো বহু আগেই এ বিষয়ে অবহিত আছ। পাঠক বৃদ্ধ গুণানন্দ তোমায় করুণা করে। তাহার সময় গিয়াছে। তাহার শুধু অতীত আছে

ভবিষ্যৎ নাই। আজও শ্রীমান সমরেন্দ্রর প্রশ্রয়ে গুণানন্দ তোমাদের সম্মুখে তাহার নির্বুদ্ধিতার কথা বলিতে আসিয়াছে। একদিন স্বাভাবিক নিয়মেই তাহার দীর্ঘ আয়ুও শেষ হইবে। তাহার লেখনী স্তব্ধ হইবে। কিন্তু পাঠক তুমি নবীন। এই বঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থায় তোমার স্বার্থ জড়িত। তোমার উত্তর পুরুষের [গুণানন্দরও] স্বার্থ জড়িত। তুমি ভাবিতেছ গুণানন্দ নির্বুদ্ধি চূড়ামণি। তুমি যে তোমার পুত্র-কন্যাকে শ্বেতদ্বীপে রপ্তানি করিবে তাহা গুণানন্দ জানে না। তুমি বড় চতুর। চাতুর্য একটি মহৎ গুণ। তবে তোমার পুত্র পলাইয়া বাঁচিবে ইহাই তোমার যদি অভিপ্রায় হয় তাহা হইলে তোমার প্রতি গুণানন্দ করুণা প্রকাশ করিতেছে। ময়ূরপুচ্ছ যতই সুন্দর হউক ময়ূর ভিন্ন অন্য কাহারও তাহা মানায় না। তোমার সন্তানকেও তাহা মানাইবে না।

ছাত্রদের কথা অনেক হইল। বয়স্কদের কথা হউক। তুমি ঠিকই ধরিয়াছ। গুণানন্দ বুড়া। বুড়ারা রূপকথা বর্ণনা করিতে বড় আনন্দ পায়। গুণানন্দ তোমার কাছে একটি রূপকথা বর্ণনা করিতেছে শুন। কঠোর বাস্তব যদি তোমার মুখে একটি তিক্ত স্বাদ আনিয়া দিয়া থাকে তাহলে গুণানন্দ ক্ষমাপ্রার্থী। এই মধুর রূপ কথাটি শুনিলে তুমি খুশী হইবে।

বহুদিন পূর্বে জম্বুদ্বীপে দুইটি পরস্পর বিবদমান রাজ্য ছিল। একটি রাজ্যের নাম—নাম দিয়া কি প্রয়োজন। দুইটি রাজ্যের মধ্যে সাত শত যোজন দূরত্ব ছিল। একটির নৃপতি উদ্যমী তরুণ। অন্যটির নৃপতি ধীমান প্রবীণ। নবীন নৃপতির বিদেশ হইতে কিছু সামগ্রী ক্রয়ের প্রয়োজন ছিল। কয়েক পরার্ধ অর্থ তাহার জন্য ব্যয় করিতে হইয়াছিল। কিছুদিন গত হইলে শুনা গেল 'চ'-এর কাছ থেকে রাজ্য যে সামগ্রী ক্রয় করিয়াছিল তাহাতে 'ছ' কয়েক শত নিযুত অর্থ দস্তুরী হিসাবে পাইয়াছে। ইহাতে প্রবীণ রাজার রাজ্যে বড় হট্টগোল শুরু হইল। সবাই কহিতে লাগিল ইহা অনাচার। পরন্তু 'ছ' অর্থ লইয়াছে ইহা যেরূপ সত্য তেমনই কুহেলী-পূর্ণ 'ছ' এর স্বরূপ। নবীন নৃপতি বার বার বলিতে লাগিলেন 'ছ' এর সম্বন্ধে কেহই কিছু জানেন না। এমন হইতে পারে 'ছ' 'চ'-এরই বেনামদার। কাহার হস্তে কে তাম্রকূট সেবন করিল সে সম্বন্ধে কোন কিছুই আবিষ্কৃত হইল না। নবীন নৃপতির পারিষদগণ প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন আমাদের নৃপতি নির্দোষ। তাঁহারা একে অন্যের সহিত সাক্ষাৎ মাত্র অভিবাদনের বদলে 'নৃপতি নির্দোষ' বলিয়া একে অন্যকে আপ্যায়ন করিতে শুরু করিলেন। প্রবীণ নৃপতির পারিষদগণ অবশ্য ইহাকে দুর্নীতি বলিল এবং প্রচুর নিন্দাবাদ করিল।

ইহার মধ্যে হঠাৎ আবিষ্কার হইল প্রবীণ নৃপতির রাজকোষ হইতে বড় রকম চুরি হইয়া গিয়াছে। ইহাতে নবীন রাজার পারিষদগণ মহা শোরগোল তুলিল। তাহারা কহিতে লাগিল হহা তস্করবৃত্তি। নৃপতির ইহা শোভা পায় না। প্রবীণ নৃপতির পারিষদগণ উচ্চকণ্ঠে কহিতে লাগিল আগে প্রমাণ হউক চুরি হইয়াছে। কেহ কেহ এমনও সন্দেহ প্রকাশ করিল যে দস্তরী সম্বন্ধে যে হট্টগোল হইতেছে তাহা অন্যদিকে ধাবিত করিবার ইহা এক ষড়যন্ত্র।

পাঠক তোমাকে রূপকথা বলিবার প্রয়োজন গুণানন্দর নাই। তুমি তোমার চক্ষের উপর দেখিতেছ এই স্বর্ণভূমে বর্তমানে অসুরদিগেরই প্রাধান্য। অসুরবৃত্তি সম্বন্ধে কেহই লজ্জিত নহে। পরন্তু অসুর হইবার সাধনায় সমস্ত দেশ মাতিয়াছে। তস্করের ষষ্ঠ দিনেই সপ্তাহ শেষ হইতেছে, সাধুর দিন আর আসিতেছে না।

গুণানন্দ বৃদ্ধ অশক্ত। চলৎশক্তিও বর্তমানে সীমিত। গুণানন্দ বিশ্বাস করে না যে দেশ শুধুমাত্র অসুরভোগ্যা। গুণানন্দ বিশ্বাস করে যে দেশ সম্পূর্ণ বিনাশ হয় নাই। দেশের অধিকাংশ মানুষ সৎ, ধর্মভীরু এবং পরিশ্রমী। কিন্তু তাহাদের রুখিয়া দাঁড়াইবার উপায় জানা নাই। তাহারা নেতৃত্ব চাহিতেছে। সৎ পরিশ্রমী নির্লোভ নেতৃত্ব খুঁজিতেছে। নবীন পাঠক তুমি রুখিয়া দাঁড়াও। দেশবাসী তোমার সঙ্গে রহিবে। ভুলিও না এই তমিস্রার অন্তে নূতন সূর্যোদয় অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। তুমি তোমার বিজয়শঙ্খ হস্তে ধারণ কর। তাহাতে মঙ্গলবাদ্য বাজুক। নূতন প্রভাত তোমার জন্যই অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে।

রবীন্দ্রসংগীতের ভবিষ্যৎ—কয়েকটি প্রশ্ন

সুধীর চক্রবর্তী

কেমন করে গান কর

রবীন্দ্রসংগীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এক এক সময়ে এই বিশিষ্ট গানের এক এক রকমের সমস্যা তৈরি হয়েছে। এই শতকের গোড়ার দিকে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল সম্প্রচারের। কে গাইবে রবীন্দ্রনাথের গান? শান্তিনিকেতন আর ব্রাহ্মসমাজের বাইরে তখন রবীন্দ্রনাথের গানের চল ছিল না। তার মানে অভিজাত শিক্ষিত সমৃত একটি শ্রেণী তখন ছিলেন এই গানের প্রচারক ও ভোক্তা। ১৯০৭ সাল থেকে কলকাতায় উচ্চমানের গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরি হতে থাকে এবং অদীক্ষিত কিছু গায়ক গায়িকা অবাঞ্ছিত সুরে ও গায়কিতে রবীন্দ্রনাথের কিছু গান রেকর্ডবদ্ধ করেন। তিনের দশকে বাংলা চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রগান সন্নিবেশিত হয় এবং অচিরে তা জনপ্রিয় হয়। পঙ্কজ মল্লিক, সায়গল ও কানন দেবী এই তিনজনের নাম সেই জনপ্রিয়তার জন্য দায়ী। এইবারে নবার্জিত জনপ্রিয়তার সূত্রে দ্বিতীয় সমস্যা দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর গানের গায়নে ষ্টিমরোলার চালানোর অভিযোগ বা আশংকা করলেন। গাইবার সময় যাতে তাঁর গান তাঁর মতো থাকে এ বিনতি রাখলেন। এই সতর্কীকরণ অনেককে সচেতন করলো। ঘটনাচক্রে ধীরে ধীরে কলকাতায় গড়ে উঠতে লাগলো রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষায়তনগুলি, তাঁর প্রয়াণের ঠিক পর থেকে। বিশ্বভারতী সংগীতভবন ছাড়াও কলকাতা ও ঢাকার শিক্ষায়তন এবং শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত গায়কের সূত্রে শুদ্ধ রবীন্দ্রগীতের বারতা পৌঁছোতে লাগলো অখণ্ড বাংলার নানা প্রান্তে। পাঁচের দশক থেকে ছয়ের দশক পর্যন্ত রবীন্দ্রসংগীতের সম্পর্কে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবেগ ও আকুলতা চরম পর্যায়ে পৌঁছোয়। এসে পড়ে রবীন্দ্রশতবর্ষের সময়। শতাব্দীর সূচনায় ছিল যে-গানের সম্প্রচারের সমস্যা, এবারে তা প্রচার মাধ্যমগুলিকে ভাবে রসে এমনকি বাণিজ্য সফলতায় ভরিয়ে দিল। সাতের দশক থেকে রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে নতুন দুটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রথম সমস্যা হলো, সত্যিকারের অনুসরণযোগ্য স্বরলিপি স্বরবিতানের কোন্ সংস্করণে পাওয়া যাবে এবং কোন্ গায়ক গায়িকার গায়নরীতিকে

যথার্থ বলবো আমরা ? কেননা দেখা গেল একই গান একাধিক ধরনে গাইছেন বা রেকর্ড করছেন শিল্পীরা এবং বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড তাতে সায় দিচ্ছেন। একই গানের রূপায়ণ ঘটেছে কখনও তালে এবং কখনও মুক্তছন্দে। স্বরবিতানের বিভিন্ন সংস্করণ তুলনা ক'রে বিশেষজ্ঞরা বহুদিন ধ'রে দেখিয়ে চলেছিলেন যে 'স্বরবিতান' সম্পাদনায় প্রার্থিত সতর্কতার বড়ই অভাব। দ্বিতীয় সমস্যা হলো, গানে যন্ত্রানুষঙ্গঘটিত এবং তার চেয়েও যেটা চিন্তার তা হচ্ছে জনপ্রিয়তার ঝোঁকে রবীন্দ্রগান পরিবেশনে একধরনের সরলীকরণের প্রবণতা কিংবা যাঁরা কোনোদিন রবীন্দ্রগীতে তালিম নেননি, কেবল বাণিজ্যিক কারণে তাঁদের দিয়ে গান করানোর মারাত্মক প্রচেষ্টা। এইসব সংকট ক্রমে ক্রমে সমীকৃত হয়ে আটের দশকে, এই সময়ে, একটা নতুন ভাবী সমস্যার আশংকা অনেকের মনে জাগছে এবং বারে বারে নানা ভাবে ব্যক্ত হচ্ছে। বলা হচ্ছে, ১৯৯১ সালের পর যখন আন্তর্জাতিক নিয়মে রবীন্দ্রসংগীতের ওপর বিশ্বভারতীর কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না তখন রবীন্দ্র-সংগীতের স্বরূপ কি দাঁড়াবে ? সুরে গায়নে যন্ত্রানুষঙ্গে নানারকম স্বৈরতার কল্পনায় একদল আতংকিত, আরেকদল ভাবছেন 'স্বরবিতান' যখন আছে, আছে অজস্র রেকর্ড এবং শ্রোতাদের বিবেকী সংস্কৃতিবান মানসতা তখন যদৃচ্ছ কাটাছেঁড়া রবীন্দ্রনাথের গানে বাঙালি সইবে না। আরেকদল মধ্যপন্থী দুদিক বজায় রেখে বলতে চাইছেন যে, বিশ্বভারতীর অনুশাসন যখন আইনত থাকবে না, তখন একটু আধটু গায়নের স্বাধীনতা হয়তো রবীন্দ্রগানে আসতে পারে, তবে নজরুলগীতির মত ধ্বস্ত চেহারা তার কোনদিনই দাঁড়াবে না।

এবারে বোঝা যাচ্ছে, প্রথমে রবীন্দ্রনাথের গানের ছিল প্রচারের সমস্যা, আর এখন তার ব্যাপক প্রসারের ফলে শুদ্ধতার হানি ঘটছে, ঘটছে বাণিজ্যিকরণ এবং তার ফলে তার ভবিষ্যৎ স্বরূপ সম্পর্কেই দুর্ভাবনা শুরু হয়েছে। এখানে স্মরণ করতে পারি ১৯৪৬ সালে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য। 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' বইতে প্রসঙ্গত তিনি বলেছিলেন :

> রবীন্দ্রনাথ বলিতেন শেষ পর্যন্ত তাঁহার গানগুলিই টিঁকিবে। অনেকে বলেন তাঁর গান কেবল শিক্ষিত সমাজেরই গান। এ দেশে এখন পর্যন্ত শিক্ষিত সমাজ অত্যন্ত সংকীর্ণ, শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের পরিধি বিস্তৃত হইলে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রসারও অনিবার্য।

চার দশক আগে প্রমথনাথের অনুমান এখন সিদ্ধ সত্য। অবশ্য কেবল শিক্ষিত সমাজের পরিধি বেড়েছে বলেই যে রবীন্দ্রসংগীতের প্রসার বেড়েছে তা নাও হ'তে

পারে। আধুনিক নামধেয় গানগুলি যে ক্রমেই ভদ্রসমাজে গাইবার অনুপযোগী হয়ে পড়ছে, অন্তত আগের কয়েক দশকের তুলনায়, সে-তথ্য মনে রাখলে রবীন্দ্র গানের ব্যাপক প্রসারের একটা যুক্তিগ্রাহ্য কারণ পাওয়া যায়। এখানে প্রসঙ্গক্রমে আরো দুটি কথা সেরে রাখা উচিত। প্রথমত, রবীন্দ্রসংগীত বাংলার শ্রোতৃ সমাজে জনপ্রিয় হয়েছে কিন্তু সর্বত্রগামী হয়নি। তার প্রচার ও প্রসার গ্রামে-গাঁথা বাংলায় খুবই ক্ষীণ, শহুরে শ্রমজীবী অংশে স্বল্প। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত স্তরে রবীন্দ্রসংগীত সবচেয়ে ব্যাপক প্রচারিত। দ্বিতীয়ত, সুরে তালে নিবদ্ধ রবীন্দ্রনাথের ১৫৯৮টি* গানের মধ্যে বড় জোর দুশো থেকে তিনশো গান সম্প্রতিকালে পৌনপুনিকভাবে চালু আছে। বাকিগুলির ভবিষ্যৎ এখনই অনিশ্চিত।

এইসব সমস্যার উচ্চকিত ঘোষণার মাঝখানে একটা মৌল সমস্যা অনেকের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। তা সহসা ব'লে বসলে খুব কর্কশ শোনাতে পারে আমাদের মোলায়েম কানে। তবু বলা যেতে পারে : রবীন্দ্রসংগীত আদপেই টিঁকবে তো ?

কেউ যদি ভাবেন এ প্রশ্ন হঠাৎ উঠলো কেন ? তাহ'লে দুটো আলাদা উদ্ধৃতি আমি পেশ করবো। প্রথম উদ্ধৃতি সত্যজিৎ রায়ের একটি রচনা থেকে। ১৯৬৭ সালে 'রবীন্দ্রসংগীতে ভাববার কথা' ব'লে একটি নিবন্ধে ('এক্ষণ—কার্তিক অগ্রহায়ণ ১৩৭৪) তিনি লিখেছেন :

> সত্যি বলতে কি—আজকাল যা হচ্ছে, তাতে সাধারণের বাজারে রবীন্দ্র-সংগীতের কোনো ভবিষ্যৎ আছে কিনা সন্দেহ। সাধারণের কাছে এ গানের ভাবের মূল্য কিছুমাত্র আছে বা থাকতে পারে বলে মনে হয় না ; আর যুগটাও যে পালটেছে সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই।···কেবল স্বরলিপির শুদ্ধতা নিয়ে মাতামাতি ক'রে বা সংগীত শিক্ষায়তনে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িয়ে বা সিনেমা-রেডিও-গ্রামোফোনে গান গেয়ে রবীন্দ্রসংগীতকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।

এখানে রবীন্দ্রসংগীতের 'সুস্থভাবে' বাঁচার প্রশ্ন উঠেছে এবং সত্যজিৎ রায় খেয়াল রেখেছেন যে যুগটাও পালটেছে। এই প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথেরও মনে ছিল, তাই তিনি একবার লিখেছিলেন, 'যুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে সব কিছুই তো বদলায়। তবে সবচেয়ে স্থায়ী আমার গান এটা জোর করে বলতে পারি।'

যুগ বদলানোর ব্যাপারটা দুজনেই খেয়াল রেখেছেন কিন্তু তার মাত্রা কতটা

* গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের গান বাদে স্বরলিপিসমন্বিত রবীন্দ্রসংগীতের সংখ্যা ১৫৯৮।

তা বলেননি। কিন্তু কিছু কিছু তথ্য এ ব্যাপারে আমরা হাজির করতে পারি। যেমন শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'জার্নাল' (১৯৮৫) বইতে উল্লেখ করেছেন এক বিচিত্র ঘটনা। লিখেছেন :

> দুঃখ করলেন শৈলজারঞ্জন এবারকার শান্তিনিকেতন নিয়ে। ক মাসের দায় নিয়ে আছেন এখানে, শেখাতে যান সকালে তিনদিন, বিকেলে তিনদিন। কিন্তু ছেলেমেয়েরা যে নিয়মিত আসে, এমন নয়। কোনো-দিন হয়তো ভরে গেল সব, কোনোদিন ফাঁকা।

বিবরণ থেকে ১৯৮৫ সালে খোদ শান্তিনিকেতনের গানের পরিবেশ বোঝা যায়। শৈলজারঞ্জনের মতো আচার্যের কাছে গান শেখার ব্যাপারে এই হাল্‌কা আচরণ ভাবায় নাকি ? অথচ আশ্চর্য যে এই শৈলজারঞ্জন কত ভরসা নিয়ে একদা লিখে-ছিলেন :

> রবীন্দ্রসংগীতের পীঠস্থান কবির আশ্রম শান্তিনিকেতনের আকাশে বাতাসে যেন গান ছড়িয়ে আছে। সেইজন্য সেখানে রবীন্দ্রসংগীতের স্বাভাবিক পরিমণ্ডল বিরাজমান।...আশ্রমবাসীদের কণ্ঠে সেই রাবীন্দ্রিক জগৎ অটুট থাকবেই।

কিন্তু দেখাই যাচ্ছে অটুট নেই। শান্তিনিকেতনেও নেই, কলকাতাতেও নয়। শ্রোতারা লক্ষ করলে দেখবেন, আকাশবাণী কলকাতার প্রতিদিনের অনুষ্ঠান-সূচিতে রবীন্দ্রগানের সম্প্রচার অনেক কমে গেছে আগের তুলনায়। দিল্লীর চক্রান্তে নয়, শ্রোতাদের অনীহায়। রবীন্দ্রগানের নবীন গায়ক গায়িকার ক্যাসেট বাণিজ্য-সফলতা পাচ্ছে না। কলকাতার নানা মঞ্চে রবীন্দ্রগানের আসরে অনেক আসন আজকাল ফাঁকা থাকছে।

'যুগ বদলায় কাল বদলায়' এই পর্যন্ত ভাবতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রগানের স্রষ্টা, ভাবেননি যে যুগের বদলে শিল্পীর একাগ্রতা বদলে যায়, বদলে যায় মনোবৃত্তি। গানে প্রাতিষ্ঠানিকতার একঘেঁয়েমি আসে, আসে ফাঁকি। তালিম শেষ হবার আগেই সভাশোভন সজ্জা তৈরি হয়ে যায় এখন, চলে বেতার আর দূরদর্শনে উমেদারি। এমন মনোভাব থেকেই চটকদারি আসে। শিক্ষার্থীর অস্থিরচিত্ততা আর স্থৈরস্বভাব সুযোগ্য শিক্ষকের ক্লাশ একদিন ভরিয়ে দিয়ে আরেকদিন শূন্য করে। সুবিনয় রায়ের মতো শিক্ষক সাক্ষাৎকারে এবম্বিধ কথা বলেন (যুগান্তর। ১৮ মে ১৯৮৬) :

> প্রশ্ন : আজকে যারা উঠ্‌তি শিল্পী তাদের মধ্যে বিশেষ কারো নাম মনে পড়ছে আপনার—যাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বীজ লক্ষ্য করেছেন ?
>
> সুবিনয় রায় : না। দুঃখের সঙ্গেই বলছি, না। গাইছে অনেকে। কিন্তু বিশেষ করে নাম করার মতো তেমন করে বর্তমান প্রজন্মের কারো নামই মনে পড়ছে না। (গত ১০।১৫ বছরে) ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সাধারণভাবে শেখবার আগেই এরা বেশি কমার্শিয়াল হয়ে পড়ছে। কিভাবে পরিচিতি এবং অর্থ দুটোই তাড়াতাড়ি লাভ করা যায় সেদিকেই এদের নজর বেশি। এবং আরো একটা খারাপ জিনিস হচ্ছে, ভালো ক'রে না শিখেই এরা আবার অন্যদের শেখাতে শুরু করছে। জীবিকার উপায় আর কি !

এইসব বক্তব্য আর মন্তব্য মনে রেখে আমাদের আগেকার প্রান্তবাদী জিজ্ঞাসা, রবীন্দ্রসংগীত আদপে টিঁকবে তো, এবারে সুভাষণ অলংকারে সাজিয়ে একটু বিস্তারে পেশ করা যায় এই ব'লে যে, রবীন্দ্রসংগীতের ভবিষ্যৎ কেমন ? তা সুস্থভাবে বজায় থাকবে তো ? নাকি রবীন্দ্রসংগীত বলতে ভবিষ্যতে বোঝাবে এক ভিন্নতর বন্দেশ ও স্বেচ্ছাচারী গায়কি ?

সমস্যার উত্থাপন বা প্রাসঙ্গিক অন্যতর জিজ্ঞাসা আপাতত মুলতুবী রেখে প্রথমে বিচার করা উচিত হবে তাঁর রচিত গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের প্রত্যাশা কী ছিল। তাঁর একটা উক্তি তো উদ্ধৃত হ'তে হ'তে বিখ্যাত হয়ে গেছে। সেটা এই যে, 'বিশেষ করে বাঙালিরা, শোকে দুঃখে, সুখে আনন্দে, আমার গান না গেয়ে তাদের উপায় নেই। যুগে যুগে এ গান তাদের গাইতেই হবে।'

এই মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথ একটা কথা খুব স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন : তাঁর গানের উত্তরাধিকার বর্তাবে শুধু বাঙালিদের ওপর। এ উক্তির প্রসারণে আমরা বুঝে নিই বিদেশ বা ভিন্ন প্রদেশে যে রবীন্দ্রসংগীত চলবে না তার একটা কারণ সেই গানে বাণীর মহিমা। কীর্তন ও রামপ্রসাদী গানের যুগ থেকে বাংলা গানে কথা ও সুরের যে একটা সহজ অনুপাত ছিল, সেই গানের সংস্কার মেনে নিয়ে তাকে আরও ব্যঞ্জনাময় বাণী সংসর্গে দীপ্ততর করে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্য রেখে গেছেন। এখানে 'আমাদের' মানে সামগ্রিক বাঙালি হয়তো নয়, শিক্ষিত বাঙালি সম্ভবত। আর যেহেতু বাংলার গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষ এমনকি সাক্ষরও নন, তাই রবীন্দ্রনাথের গানেই রয়ে গেছে একধরনের সংকীর্ণতা তথা ধ্বংসের বীজ।

এবারে দেখা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর গানগুলি লিখেছিলেন ও গাইয়েছিলেন তখন কী ধরনের বাঙালিরা তাঁর আশেপাশে ছিলেন। একেবারে প্রথম পর্বের গান রচনায় ঠাকুর পরিবারের মনন সংসর্গ আর উন্নত রুচি তাঁকে উৎসাহিত করেছে। ব্রাহ্মসমাজের সুগম্ভীর অভিজনস্পর্শ তাঁকে একেবারে গোড়া থেকে গূঢ় গানের উচ্চতায় তুলে ধরেছে। তাঁর গান কণ্ঠে ধারণ করেছেন প্রতিভা-অভিজ্ঞা-ইন্দিরা, সরলা ও দিনেন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতনের সুদীর্ঘ আশ্রমিক-পর্বে তাঁর গান রচনার সদ্য সমীপবর্তী ছিলেন যেসব বঙ্গ সন্তান তাঁদের নাম অজিত চক্রবর্তী, ক্ষিতিমোহন, বিধুশেখর, জগদানন্দ, নিত্যানন্দ বিনোদ, নন্দলাল, প্রভাত-কুমার, অনাদি দস্তিদার, শৈলজারঞ্জন, শান্তিদেব প্রভৃতি। কলকাতা-শান্তিনিকেতন এই দুই কেন্দ্রে তাঁর সংসর্গে যাঁরা সর্বদাই ঘনিষ্ঠ থাকতেন তাঁরা হলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, রামানন্দ, প্রশান্ত মহলা-নবিশ, অমিয় চক্রবর্তী, কালিদাস নাগ, সুনীতিকুমার, অমল হোম, ধূর্জটিপ্রসাদ, পুলিনবিহারী সেনের মতো মরমী ও বিদগ্ধ মানুষ। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁর গান যাঁদের কণ্ঠে স্ফূর্ত হয়েছিলো তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী, দিনেন্দ্রনাথ, অমিতা সেন, ইন্দুলেখা ঘোষ, রমা কর, সাহানা দেবী, অমলা দাস, কনক দাস, মালতী ঘোষাল, চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত, সাবিত্রী কৃষ্ণান, অনাদি দস্তিদার, শান্তিদেব ঘোষ, কণিকা। রবীন্দ্রনাথের সামনে এইসব উন্নত বাঙালিরাই কি ছিলেন না? লক্ষ করলে দেখা যাবে এঁরা সবাই নিঃশর্তভাবে রাবীন্দ্রিক। বাংলার ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে উৎসর্গীকৃত এই মানুষগুলির জীবনসাধনা ছিল বিদেশী সংক্রামকে প্রতিহত করে সবরকম ভারতীয়তার পুনরুজ্জীবন। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এই পর্যায়ের রুচিমান বাঙালিদের কথা মনে রেখে এডওয়ার্ড টমসনকে লিখেছিলেন :

> I know the artistic value of my songs. They have great beauty. Though they will not be known outside my province, and much of my work will be gradually lost, I leave them as a legacy.

রবীন্দ্রসংগীতের এই মহৎ উত্তরাধিকার তাহলে কাদের জন্য রেখে গেছেন তিনি? ঐ জাতের ও উন্নত স্তরের নন্দনবোধসম্পন্ন বাঙালিদের জন্য, নাকি এখনকার মিশ্র সংস্কৃতির অহংকারী অস্থিরচিত্ত বাঙালিদের জন্য? এই দ্বিতীয় ধরনের আধুনিক

বাঙালিদের সম্পর্কে পূর্বোক্ত জার্নালে শঙ্খ ঘোষ বিশেষণ দিয়েছেন 'সর্বজ্ঞ, আত্ম-সম্পূর্ণ, প্রশ্নহীন'।

এখন সমস্যা এই যে একাকী গায়কের গান জিনিসটা নয়, তার শ্রোতা দরকার। সংগীত-রচয়িতার বাড়তি সমস্যা এইখানে যে তাঁর রচনা অন্যের কণ্ঠ আশ্রয় ক'রে তবে আত্মপ্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ যতদিন সক্ষম ছিলেন নিজের গান নিজে গেয়েছেন এবং নিজের আস্থাভাজনদের দিয়ে গাইয়েছেন। তাঁর জীবিত-কালেই তবু এমন অস্বস্তি তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে যে, ঠিক ঠিক ভাবে তাঁর গান গাওয়া হচ্ছে না। তাঁর গানে 'যাতে একটু রস থাকে, তাল থাকে, দরদ থাকে, মীড় থাকে' তার জন্য বারবার আবেদন করেছেন। গান সম্পর্কে তাঁর উৎকণ্ঠা ছিল। খানিকটা কৌতুকের টানেই হয়তো তিনি বলেছিলেন গান জিনিসটা কন্যার মতো, উভয়েই 'পরের কণ্ঠ নির্ভর করে'। এইখানেই সংগীতকারের অসহায়তা। কণ্ঠে যিনি কোনো বিশেষ ধরনের গান ধারণ করবেন এবং সাধারণ্যে প্রচার করবেন তার উপরেই তো সেই গানের ভবিষ্যৎ। নজরুলের গান তো অনেকটাই বিকৃত হয়ে গেল, আমাদেরই চোখের সামনে, খামখেয়ালি গায়নে আর তার অলস প্রশ্রয়ে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রসংগীতের উজ্জ্বল কিংবা পরিম্লান যে-ভবিষ্যৎই হোক, তা নির্ভর করছে ভাবীকালে সেই গান কারা গাইবেন, কেমন ক'রে গাইবেন তার ওপর। ভাবীকালের দেরি আছে, আপাতত তাই বর্তমানের দিকে চোখ ফেরানো যাক। অনন্তকুমার চক্রবর্তী তাঁর 'সে অগ্নিতে দীপ্ত গীতে' বইতে বর্তমান সময়ে রবীন্দ্রসংগীতের অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

> কিন্তু, আজ আমাদের অবস্থাটা কি? চারিদিক চেয়ে দেখতে পাচ্ছি, রবীন্দ্রসংগীতের শুধু খ্যাতিটাই আছে, তার সঙ্গে পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা সুদুর্লভ। মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিল্পী অনেক যত্নে অনেক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই ক'রে হয়তো দীপবর্তিকাটি ধ'রে আছেন; বাকি ক্ষেত্রটা অন্ধকার।

এখানে প্রশ্ন ওঠে 'মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিল্পী' কেন লড়াই ক'রে দীপবর্তিকাটি ধ'রে আছেন, অনেকে নেই কেন? সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে অনন্তবাবুর মন্তব্যে খানিকটা ফাঁক থেকে যায়। কেননা এই সময়ে, সংখ্যাতত্ত্ব সাক্ষ্য দিচ্ছে, রবীন্দ্রসংগীতে গাইবার মতো ছেলেমেয়ে অনেকগুণ বেড়েছে। রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষাক্রম এবং সংগীতবিদ্যালয়ের বেড়জালে ধরা পড়ছে বছর বছর অগণিত স্নাতক। বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী, গীতবিতান, দক্ষিণী, কবিতীর্থ, সুরঙ্গমা ইত্যাদি থেকে বছরে অন্তত

এক হাজার দীক্ষিত গায়কগায়িকা বেরোচ্ছেন। প্রয়াগ সংগীত সমিতি ও প্রাচীন কলাকেন্দ্র অকাতরে শিক্ষার্থীদের রবীন্দ্রসংগীতের ছাড়পত্র দিচ্ছেন। কৃতী এবং সম্ভাবনাপূর্ণ গায়কগায়িকা পাচ্ছেন সুনিশ্চিন্ত বৃত্তির দাক্ষিণ্য। বেতার দূরদর্শন আর প্রাত্যহিক জলসা বিনোদনে প্রচুর রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী এখন সদাব্যস্ত। সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের তালিম দিয়েও এখন ভাল রোজগার হয়। তবু রবীন্দ্রসংগীতের দীপবর্তিকাটি কেন যে দুয়েকজনের প্রযত্নে বেঁচে থাকে, এই ধাঁধার মধ্যে একটা সত্য আছে।

সত্য এই যে এখনও পর্যন্ত আমরা শান্তিদেব-সুবিনয়-সুচিত্রা-কণিকা-নীলিমার গান শোনবার জন্য কান পেতে রই। কনক দাস, অমলা দাশ, সাহানা দেবী, অমিয়া ঠাকুর, সুনীল রায়, মালতী ঘোষাল, রাজেশ্বরী দত্তদের মতো প্রয়াতদের রেকর্ড শোনার জন্য উৎকর্ণ হই। নিদেন অশোকতরু, অর্ঘ্য সেন, অরবিন্দ বিশ্বাস, ঋতুগুহ, বনানী ঘোষ, চিত্রলেখা চৌধুরী, গীতা হাজরা, অমল নাগ, পূর্বা দাম, গীতা ঘটকদের গান শুনতে চাই। কেননা এঁদের তালিম পাকা, গায়কী পরিচ্ছন্ন, সুর ও বানানে নিঃশব্দ দখল আছে। খোঁজ করলে দেখা যাবে আমাদের শুদ্ধতম রবীন্দ্রগীতশিল্পীদের বয়স ষাট পেরিয়েছে, কারুর সত্তরও। দ্বিতীয়বর্গের নির্ভরযোগ্য শিল্পীরাও সকলে পঞ্চাশ বয়সের এপাশে ওপাশে। তথ্য হিসেবে এ কথাটাও খেয়াল রাখা চাই যে রবীন্দ্রগীতি পরিবেশনে কুড়ি পঁচিশ বছর থেকেই তাঁরা নির্ভরযোগ্যতা ও নিষ্ঠার জন্য স্বীকৃতি পেয়ে আসছেন, সেকথা এখনকার কুড়ি পঁচিশদের সম্বন্ধে বলতে অনেকে দ্বিধান্বিত। প্রসঙ্গক্রমে রেকর্ডবিক্রির বাণিজ্যিক সফলতার কথা উঠলে (সংগতভাবেই আশা ভোঁসলে ও কিশোরকুমারকে বাদ রাখছি) হেমন্ত, দেবব্রত, সুচিত্রা, কণিকা, চিন্ময়, সাগর সেন, অশোকতরু, দ্বিজেন, ঋতু গুহ ও অরবিন্দ বিশ্বাসের কথা যতটা আসবে, শান্তিদেব, সুবিনয়, অর্ঘ্য সেনের কথা ততটা আসবে না।

রবীন্দ্রসংগীতের যে-শ্রোতার দল এই গান ও তার প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের সম্পর্কে আবেগ ও কৌতূহল পোষণ করেন তাঁদের একটা বড় অংশ পঞ্চাশ বছর বয়সের আশেপাশে বা তার কিছু বেশি। অনন্তকুমার চক্রবর্তী একটু বাড়িয়েই হয়তো বলেছেন :

> আজকাল রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তার কথাও শোনা যাচ্ছে। এটা আনন্দের কথাই হত যদি জনপ্রিয়তার কাঁধে বিকারের ভূত চেপে না বসত। এই বিকার যখন রেকর্ড টেপ ইত্যাদি মারফৎ স্থায়ী রূপ নিয়ে

> হাজির হয় তখন ভবিষ্যতের কথা ভেবে শঙ্কিত না হয়ে উপায় থাকে না। এর বাইরে রবীন্দ্রসংগীত আমাদের যুবমানসে বলতে গেলে প্রায় অনুপস্থিত।

আমাদের যুবমানস বোধহয় রবীন্দ্রসংগীতের বাইরে অনেক ভিন্নতর বিনোদনে মশগুল এখন। পপ্ গানের চীৎকৃত উচ্চতাল তাঁদের জীবনদর্শনের সঙ্গে হয়তো অধিকতর সংগতিসম্পন্ন ও রোচক। কিন্তু অন্য একটা স্ববিরোধও চোখে না প'ড়ে পারে না। এখনকার যুবমানসের যে-অংশ রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে উৎসাহী ও সক্রিয়, তাঁরা তরুণ গলার গান শুনে অবাক হ'তে চান না। ফলে অগ্নিভ, অভিরূপ, শ্রীনন্দা, রীতা, এনাক্ষী, সংঘমিত্রা, আশিস, পূবালী, প্রমিতা, রমা-র গলায় রবীন্দ্রসংগীত না-শুনে তাঁরা শুনতে চান দেবব্রত হেমন্ত সুবিনয় সুচিত্রার গলায়। তাহলে তো এই প্রশ্ন আমরা করতেই পারি যে তরুণ সংগীতশিল্পীরা কাদের জন্য তবে তৈরি হচ্ছেন, কোন্ সমাদরের প্রত্যাশায়?

এইখানে এসে আমাদের প'ড়ে নেওয়া দরকার পার্থ বসুর নিবন্ধ থেকে ('তরুণ গলার গান শুনে', দেশ, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৮৭) অন্য এক বক্তব্য :

> দুই বাংলাতেই ছড়িয়েছে তাঁর গান, শহরে এবং শহরতলিতেও, স্কুলের প্রার্থনাসভা কিংবা যে-কোনো সভাসমিতির অধিবেশনে, নাটকে বা চলচ্চিত্রে এবং বৈঠকে আর নিভৃতে আলাপেও রবীন্দ্রনাথের গান আজ যেন এক নিয়মানুগ প্রথা। কবির শতবর্ষের বছরেই সেই প্রথার সূচনা : ক্রমশ সমাদৃত এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠল তাঁর গান। তারই আকর্ষণে সেই গানের সরণীতে প্রবেশ করলেন বহু খ্যাতনামা আধুনিক গানের শিল্পী এবং জাত হলেন এমনসব গায়ক-গায়িকা যাঁদের সঙ্গীতশাস্ত্রে জ্ঞান পরিমিত, ধ্রুপদী সঙ্গীতে তালিম নেই, স্পর্শস্বর লাগে না, কণ্ঠ একটি সপ্তকেই সীমায়িত, শ-খানেক গান স্বরলিপি থেকে তুলে নিতে জানেন, স্বরকম্পনমাত্র টপ্পা জ্ঞান করেন, রবীন্দ্রনাথের কিছু লোকপ্রিয় গানের হদিশ জানেন।
>
> এঁরা রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী : যে কোনো অনুষ্ঠান মঞ্চে পাদপ্রদীপের আলোয় আসবার কৌশলটি তাঁরা জানেন, তাঁরা জানেন তালিমহীন নৃত্যনাট্যের নেপথ্যে গলা মেলাতে। ব্যতিক্রম সেই ষাটের দশক থেকে কিছু দেখা গেছে নিশ্চিত, যেমন ঋতু গুহ পূর্বা দাম এমনতর কিছু সঙ্গীত-সাধিকাও এসেছেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ অ-শিক্ষিত শিল্পীরা যশ এবং অর্থ অর্জন

করেছেন, আর তাঁদের প্রয়াসেই রবীন্দ্রনাথের গানের অনুষ্ঠান ক্রমশ ক্লান্ত এবং অবসন্ন হয়ে পড়ল। এই মুহূর্তেও সেইসব শিল্পী আসর জাঁকিয়ে বিরাজমান, কারণ 'রিটায়ারমেণ্ট' শব্দটি রবীন্দ্রনাথের গানে অস্পৃশ্য।

এমত পরিবেশে আজকের তরুণরা রবীন্দ্রনাথের গানের জগতে প্রবেশ করছেন। তাঁদের জন্য আসন হয়নি পাতা, রবীন্দ্রসদন থেকে শুরু করে রেডিও বা রেকর্ড কোম্পানীতেও দুস্তর, অস্পষ্ট, অভাবিত কতিপয় বাধা তাঁদের সামনে।

পার্থ বসু এখানে স্পষ্ট নাম করেননি কিন্তু তাঁর উদ্দিষ্ট রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীদের নাম আমরা অনুমান করতে পারি, কেননা তাঁরা এখনও 'বিরাজমান', যশ ও অর্থ অর্জনকারী অথচ অবসর নিতে অনিচ্ছুক। অবশ্য তাঁদের অশিক্ষিত বলতে আমাদের বাধে। তার চেয়েও বড় কথা, কণ্ঠ যাঁদের 'একটি সপ্তকে সীমায়িত' তাঁরা কি শ্রোতাদের বোকা বানিয়ে তাঁদের গালে চড় মেরে যশ ও অর্থ আদায় ক'রে নিয়েছেন? এইসব শিল্পী যে আজও রিটায়ার করেননি তার একটা কারণ অবশ্যই তাঁদের জনাদর, আরেকটা কারণ তরুণগলার নবীন শিল্পীরা তাঁদের স্থান অধিকার নিতে পারেননি। কে আর কবে নতুন শিল্পীকে আসন পেতে সমাদর ক'রে আহ্বান করেন? পারফরসিং আর্টের রাজ্যে বরাবরই প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা জোরালো। প্রাথমিক আগ্রহনীয়তা কাটিয়ে সুবিনয় রায় শান্তিদেবের মতো শিল্পীকেও কি কঠিন পরিশ্রমে জনপ্রিয়তার রাজ্যে আমরা ফিরতে দেখিনি পাঁচ থেকে সাত দশকের মধ্যে?

একথা কি সত্য নয় যে, নবীন শিল্পীদের রেকর্ড বা ক্যাসেট আদপেই বাণিজ্য-সফল হয়নি? কেন হয়নি? কী তাঁদের ঘাটতি? পার্থ বসু নিজেই লক্ষ করেছেন যে শান্তিনিকেতন নামে রবীন্দ্রসংগীতের 'সেই আদি উৎসভূমি মধ্য ষাটের দশক থেকেই প্রায়-শুষ্ক; সেখানে শিক্ষক তৈরি হয়েছে, শিল্পীর দুর্ভাব'। এ বড় আশ্চর্য বৈপরীত্যে। শিক্ষক তৈরি হচ্ছে যেখানে, সেখানে শিল্পী তৈরি হচ্ছে না। তাহ'লে ভবিষ্যতে শিখবে কে? গাইবেই বা কে? অ-শিক্ষিত কৌশলবাজ শিল্পীদের হঠাবে কে?

তাই প্রশ্ন ওঠে, নতুন ভালো শিল্পী তৈরি হচ্ছে না অথবা যোগ্য নবীন শিল্পীর সমাদর হচ্ছে না, এ দুটি ধারণার মধ্যে কোন্‌টি সত্য কে বলবে? এখানে ১৯৮৬ সালের ১০ মে তারিখের 'দ্য স্টেটসম্যান' কাগজ থেকে দুটি প্রাসঙ্গিক সাক্ষাৎকারের সারকথা তোলা যেতে পারে। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে বলেছেন :

> Santiniketan is no longer an ashram. Degrees are now more important than music but it has not improved quality. The difference among my past and present students is that the former learnt for joy and were spontaneous. Teaching was a pleasure. The present students are more competitive and very confident even without knowing much. I feel a little scared in pointing out their mistakes.

সুবিনয় রায় শিক্ষার্থীদের এবম্বিধ মনোভঙ্গীর একটা সমাজ ও দেশকালগত ব্যাখ্যা সহ মন্তব্য করেন :

> Their approach to music depends on the patterns of their life-styles. There is less time for thought. I would not call it a deterioration but a change, brought in by the new consumer culture... The Radio, TV, Press mould an artiste's approach. Music is now a career.

দুই সমর্থ ও কৃতবিদ্য শিল্পী নতুন রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে যা বলেছেন তা ভাবিয়ে তোলে। তার কারণ রবীন্দ্রগীতের সৃজনের নিজস্ব মান যত উন্নতই হোক তার ভবিষ্যৎ কিন্তু নির্ভর করছে তরুণদের সফলতার ওপরে। যাঁদের থাকা উচিত ঐ বিশেষ গান বিষয়ে প্রার্থিত আন্তরিকতা, শ্রম, শ্রদ্ধা ও স্বতঃস্ফূর্ততা। এই সবের অভাব থাকলে তাঁদের পারফরমেন্সের মান হবে নিচু এবং নতুন শ্রোতাদের আগ্রহ যাবে কমে। ফলে ভবিষ্যতের শ্রোতা রবীন্দ্রসংগীতের সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে নতুনতর বা অন্যতর গান খুঁজবেন। কেউ কেউ অবশ্য এমনও ভাবেন যে এখন রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে যেমন একটা উদাসীন ভাব এসেছে সেটা কেটে যাবে। এক দুই দশকের উপবাস আবার বাঙালির চিত্ত-পিপাসিত ক'রে তুলবে, সন্ধান হবে গূঢ় জটিল আবার সাবলীল স্নিগ্ধ রবীন্দ্রসংগীতের। কিন্তু তখন সেই চটজল্‌দি পিপাসা মেটাবার জন্য কোন্ শিল্পী তৈরি থাকবেন?

তথ্যহিসাবে আগেই তো আমরা জেনেছি যে রবীন্দ্রনাথের ১৫৯৮ খানি গানের মধ্যে মাত্র দুশো তিনশো গান ঘুরে ফিরে চলছে। তারমানে এখনই অনেক রবীন্দ্র-গীতির অন্তঃশীল মাধুর্য আমাদের অজানা রয়ে গেছে।* তবু চেষ্টা করলেও, এখনও

* 'What is sung in the name of Rabindrasangeet is vapid and lifeless.

শান্তিদেব-সুবিনয়-সুচিত্রা-কণিকা-অশোকতরুদের ধরলে, অনেক অপ্রচলিত গানের স্বরূপ জানতে পারবো। তাঁদের প্রয়াণের পর নতুনরা এ-গানগুলি গাইতে পারবেন না, কেননা, নিছক স্বরলিপি অনুধাবন ক'রে রবীন্দ্রসংগীতের সঠিক মর্ম ফোটানো যায় না। এ-গানের ক্ষেত্রে গুরুমুখী শিক্ষণেরও একটা আলাদা মূল্য আছে। এখনও শিল্পীরা সচেষ্ট হ'লে, শৈলজারঞ্জন শান্তিদেব, শুভ গুহঠাকুরতা কিংবা নীলিমা সেনদের কাছে কোনো কোনো গভীর গোপন গানের রসলোকের চাবি পেতে পারেন। সে চেষ্টা গড়পড়তা শিল্পীরা করেন না, কারণ সেই অজানা গান বাজারে 'খাবে' না। নতুনরাও সাহসী হন না গাইতে, কারণ, বন্দনা সিংহ যেমন জানিয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে সেটা ধৃষ্টতা বা পাকামি ব'লে বিবেচিত হবে। এইসব কারণেই প্রচলনের অভাবে অনেক রবীন্দ্রসংগীত আমাদের পক্ষে থেকে যাচ্ছে এবং যাবে অচেনা, তাকে আর ধরা যাবে না কণ্ঠবন্ধনে। কাজেই ভাবীকালে কখনও যদি সেইসব অশ্রুত গানের খোঁজ পড়ে তবে বাঙালি পাবে তার স্বরলিপিবদ্ধ কাঠামোটুকু কেবল, রসরূপটুকু থেকে যাবে দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু আপাতত ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা বাদ দিয়ে বরং এই প্রশ্নের মীমাংসা জরুরী যে কেন তিন, চার বা পাঁচের দশকের রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পীরা এত ভালো গান করেন, এতখানি কর্তৃত্ব, ব্যক্তিত্ব দিয়ে? অথচ সাত বা আটের দশকের শিল্পীরা তাঁদের নিখুঁৎ প্রশিক্ষণ, কণ্ঠসাধনা, রীতিনীতি ও শুদ্ধ স্বরচালনা সত্ত্বেও কেন সেই স্বতঃস্ফূর্ত আবহ ফোটাতে পারেন না? এর জবাবে হয়তো শৈলজারঞ্জনেরই অন্য এক উক্তি ব্যবহার করে বলা চলে: 'রবীন্দ্রসংগীতের সমগ্রতার মধ্যে স্বচ্ছন্দ পরিক্রমণ করতে হ'লে সংগীত-সাধকের জ্ঞানের সীমা বহুবিস্তৃত হওয়া দরকার।'

সেই বিস্তার নতুন প্রজন্মের রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীদের অনেকটাই নেই, কারণ তাঁদের সাধনসিদ্ধির আগে খ্যাতি আর সুযোগ হাতছানি দেয়, আহ্বান আসে প্রচার মাধ্যম থেকে। অথচ উল্টো ঘটনা এই যে, প্রথম থেকে রবীন্দ্রনাথের গানের আভিজাত্য আর শান্তিনিকেতনী সংবৃতির মহিমা এবং জনতুষ্টির বিপরীত স্রোতে-মুখ ফেরানো স্বাভিমান তাকে এক গজদন্তমিনারে রেখেছিল। স্বরলিপির শুদ্ধতা

There is no rhythm, no beat, no vigour. It sounds like an ululation wailing of mourners, It is astonishing and not a little regrettable that music has come to such a pass in a state so progressive, so culturally rich as Bengal' বলেছেন প্রখ্যাত গায়ক পণ্ডিত নিবৃত্তি বুয়া সারনায়েক।

(দ্রঃ 'Preserving a great tradition'—Delhi Recorder, January 1987)

নিয়ে শুচিবাই, মিউজিক বোর্ডের অনুশাসন এবং স্বরবিহারনিষিদ্ধ তার নিজস্ব অন্তর্গূঢ় গায়নরীতি রবীন্দ্রনাথের গানে কখনও খোলা হাওয়া লাগাতে দেয়নি। তার থেকে ক্রমে ক্রমে এ-গানের এমন এক অহংকৃত গায়ক-শ্রোতার বৃত্ত তৈরী হয়েছে, গ'ড়ে উঠেছে তার সুভদ্র মার্জিত পরিমণ্ডল ও চিহ্নিত শ্রেণী যাঁদের অনুচ্চার দাবী: এ-গান সকলের জন্য নয়।

রবীন্দ্রনাথের এই পল্‌কা অহংকৃত দুর্গে প্রথম আঘাত করেন পঙ্কজ মল্লিক আর সায়গল, পরে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমন্ত ও দেবব্রত এমনকি কোনো কোনো গানের গায়নে সুচিত্রাও। জনভিত্তির অভিজ্ঞতা থেকে এঁরা তাঁদের ব্যক্তিচিহ্নিত গায়ন-শৈলীতে রবীন্দ্রসংগীতের বেড়া ভেঙে তাকে মিশিয়ে দেন জনস্রোতে, তুলে দেন তাদের কণ্ঠে। বুঝিয়ে দেন কেমন ক'রে রবীন্দ্রসংগীত হয়ে উঠতে পারে সকলের হৃদয়ে সমবাদী, এমনকি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বাণীময় বাহক। এখন তাই অনেকে ভাবছেন, খেদের সঙ্গে ভাবছেন, কেন অনেকে তাঁদের পথ নিলেন না। কেন রবীন্দ্রসংগীত ক্রমেই চলে গেল স্বরলিপি বিষয়ে অতিসতর্ক 'সাবধানী পথিক'-দের পরিশীলিত বদ্ধতার মধ্যে। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে রবীন্দ্রসংগীতের এমন বদ্ধতার বিরুদ্ধে মতামত পৌঁছচ্ছে আমাদের বিবেচনার দ্বারে। যেমন ওয়াহিদুল হক দাবী করছেন 'রবীন্দ্রসংগীতের অনুশীলন অধ্যাপনা ও মুক্তি' নিবন্ধে:

> রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনার বর্তমান সাংগীতিক দীনতা ঘুচিয়ে তার যথাযোগ্য সাংগীতিক মূল্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সমস্ত গায়ককে এখনকার চাইতে অনেক বেশী কলাকৌশলগতভাবে পারদর্শী হতে হবে।
>
> এবং পাশাপাশি, বিপরীত মুখে, সংগীতে যাত্রাভিনয়ের রাজপরিচ্ছদাদি করতে হবে যথাসাধ্য বর্জন। তবলা, হারমোনিয়াম, মঞ্চ ছেড়ে রবীন্দ্র-সংগীত গায়কের নিরাভরণ কণ্ঠটিকে আশ্রয় করুক।
>
> ফলটা এই হতে হবে যে রবীন্দ্রসংগীত-গায়ক গায়িকা সংগীতের স্বপক্ষ অধিকারী হয়ে গানটি গাইবেন নিজের অধিকারে, গানকে নানাবিধ বাদ্য ও শব্দের তলায় চাপা না দিয়ে।···তালে-ছন্দে-সুরে গায়ক থাকবে সবার অগ্রে এইরকমই শাস্ত্রে লেখে। রবীন্দ্রসংগীতের বেলায়ও তাই হতে হবে।

তলিয়ে ভাবলে বোঝা যায় যতখানি কণ্ঠের ঐশ্বর্য থাকলে, তালিম থাকলে ও

গুণপনা থাকলে ঐ পর্যায়ের সাবলীলতা ও ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে রবীন্দ্রগানের রূপ শুধু নয়, তার মর্মটুকুকেও ফোটানো যায়, ততখানি প্রতিভা নতুনদের বোধহয় নেই। পঙ্কজ-হেমন্ত-দেবব্রতদের সাফল্যকে তাই অনেকে স্বরচ্যুতি কিংবা স্বেচ্ছাচারের অভিযোগে মলিন করতে চান। এইভাবে তাঁরা হয়তো মাঝারি-পণাকেও রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে খানিকটা প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেন। পারফরমেন্সের চেয়ে শুদ্ধতা, জনতোষের চেয়ে স্বরসংরক্ষণ, নান্দনিকতার চেয়ে অনুশাসন এই-ভাবেই বড় হয়ে ওঠে। শিল্পীদের 'উপবেশন ভঙ্গী এবং অবশ্যই তাঁদের পোষাকও' 'গানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে' পার্থ বসুর মত বোদ্ধা সমালোচকের তারিফ পায়। তথ্য হিসাবে এমনও দেখা যাচ্ছে যে ঢাকার জাহিদুর রহিম স্মৃতি পরিষদ ১৯৮২ সালে জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত প্রতিযোগিতায় যেসব নিয়মকানুন জারী করেছিলেন তাতে প্রতিযোগীদের 'আগমন, নির্গমন ও উপবেশনের' প্রতি লক্ষ রাখতে বলা হয়েছিল। বাংলাদেশের মরমী সমালোচকরা এই আয়োজনসর্বস্বতার ফাঁকি সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলেন এবং গোলাম মুরশিদ তাঁর 'গায়কের স্বাধীনতা এবং রবীন্দ্র-সংগীতের ভবিষ্যৎ' নিবন্ধে ঘটনাটির উল্লেখ ক'রে লেখেন :

> মূল স্বররূপ অক্ষুণ্ণ রাখার চেয়ে গায়কের 'আগমন, নির্গমন, উপবেশন' এবং অন্য পাঁচটা তুচ্ছ জিনিস যখন প্রাধান্য পায়, তখনই প্রাণের চেয়ে প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠান প্রকট হয়ে ওঠে।

এ সবই আসলে ব্যক্তিত্বের সমস্যা। পার্থ বসু জানিয়েছেন কলকাতার এক নামী সংগীত শিক্ষালয়ের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েও জনৈক নবীন শিল্পী মঞ্চে উঠবার অনুমতি পাননি কারণ তাঁর পরনে পাঞ্জাবির সঙ্গে প্যান্ট ছিল। তাঁকে কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় বোঝাতে চেয়েছিলেন—'চলো নিয়মমতে'। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? নবীন শিল্পীদের কেনই বা আগ বাড়িয়ে নিয়ম বোঝাতে হয়, কেনই বা তাঁরা গানের চেয়ে সতর্ক হবেন 'সজ্জা, চলন এবং মঞ্চে উপবেশনভঙ্গি'-র সঙ্গে? তাকি পার্থ বসু যেমন ভাবেন, সত্যিই 'বৃহত্তর অর্থে রবীন্দ্র-সংস্কৃতির সঙ্গে ভারসাম্য রাখে'? রবীন্দ্র-সংস্কৃতি কি এতটাই পোষাকী ও দর্শনধারী? আসলে এতসব ধরাকাটার মূলে কোথায় যেন একটা মান অবনয়নের সমস্যা ঢাকার চেষ্টা আছে। 'রবীন্দ্রসংগীতে ভাববার কথা' লেখাটিতে সত্যজিৎ রায় প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দেন :

> রবীন্দ্রনাথের গান যে আজকাল খুব ভালোভাবে গাওয়া হচ্ছে না তার একটা সোজা কারণ অবশ্য হচ্ছে এই যে ভালো গাইয়ে ছাড়া ভালো গান ভালোভাবে কেউ গাইতে পারে না। এসব গাইয়েদের অধিকাংশই, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, মাঝারির দলভুক্ত। অথচ এই মাঝারিদের মধ্যেই রবীন্দ্রসংগীতের প্রচলন, অথচ এই মাঝারিদের মধ্যেই রবীন্দ্রসংগীতকে যথাসম্ভব বিশুদ্ধভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

খুব সহজ উচ্চারণে সত্যজিৎবাবু এখানে অনেক ইঙ্গিতবাহী বক্তব্য বলেছেন। প্রথমে শুনলে মনে হয়, শৈলজারঞ্জন যেমন রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীদের জ্ঞানের সীমা বিস্তারের দাবী তুলেছিলেন সত্যজিৎবাবু তেমনই বোধহয় চাইছেন, ভালো গাইয়েরা এই গান করুন। ভালো গাইয়ে বললে বোঝায় প্রথম বর্গের কলাবৎ শিল্পী, বোধবুদ্ধিসম্পন্ন, কণ্ঠলাবণ্যে ধনী এবং গানের রূপায়নে মননশীল। কে না জানেন যে আমাদের শিল্পসংস্কৃতির এ এক দুরপনের দুর্ভাগ্য যে, প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত বাংলার প্রথমশ্রেণীর ভালো গাইয়েদের কণ্ঠসংসর্গ পায়নি রবীন্দ্রসংগীত। প্রথমদিকে তো তাঁদের তেমন ক'রে চাওয়াই হয়নি, এখন চাইলেও তাঁরা আসবেন না। কেননা রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁর গান নিয়ে 'গেল গেল' ভাবটা বরং একটু কম ছিল, এখন তা চরমে। অথচ এটা ঠিক যে দিলীপকুমার রায়, জ্ঞান গোঁসাই, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ভীষ্মদেব বা ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতো পারফরমার যদি রবীন্দ্র-গানে তাঁদের কণ্ঠ ও মনন যোগ করতে পারতেন তবে এই অসামান্য গানের ভুবন মাঝারিদের দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচতো এবং তার ভবিষ্যৎ নিয়ে এমন আশংকা আজ জাগতো না। কৃষ্ণচন্দ্র ও ধনঞ্জয়ের একটি দুটি রেকর্ডে এমন গায়নের সুন্দর নমুনা আছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নিজেরই অস্বস্তি ছিল তাঁর গানের অন্যতর রূপায়নে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর গান ঘরানা চীজের মতো তেমন অন্তঃরুদ্ধ থাকলো না, মাঝারিরা এসে তাকে রূপ আর স্বভাবের দিক থেকে একঘেয়েমিতে ভরে দিলেন কিংবা গায়নের ভঙ্গীতে এনে দিলেন হয় কাঠিন্য নয় তারল্য। দু-তিনশো গানেই তাই থমকে গেল রবীন্দ্রগানের অপরিমেয় জগৎ। তার বাইরে আর যে জাতীয় রবীন্দ্রগানকে সসম্ভ্রমে মঞ্চে আনা হয় মার্গসংগীতের আদলে খুব শুদ্ধ গম্ভীর আয়োজনে, আমরা নিঃশ্বাস চেপে তা শুনি, পাছে আমাদের দিক থেকে কোনো বেচাল প্রকাশ হয়ে পড়ে। ফলে অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে, নতুন ক'রে পাবো ব'লে আমাদের এই ভালোবাসার ধনের কাছে তেমন ক'রে আর দাঁড়াই না আমরা। সত্যিই আর তরুণ গলার গান শুনে অবাক হবার প্রত্যাশা হয়তো নেই আমাদের ততটা, কেননা ভেতর ভেতর এও বোধহয় জানা হয়ে গেছে যে ক্রমাগত যান্ত্রিক শিক্ষণে আর স্বরলিপি-নিষ্ঠার অতিরেকে তরুণদের কণ্ঠের গভীরের কোনো তৃণে কোনো অস্ত্র নেই আর।

৫

তাহলে রবীন্দ্রসংগীতের ভবিষ্যৎ নিয়ে এই যে আমাদের এতক্ষণকার ভাবনা তাকে একটা উন্নত প্রশ্নের সূচিমুখে এইভাবে দাঁড় করানো যায় যে, সামনের সমাসন্ন দশকগুলিতে রবীন্দ্রসংগীত গাইবেন কারা এবং কেমনতর গায়নে? এখন-কার তরুণ-তরুণীরা যে-পরিমার্জিত ও অনুশীলিত পথে এখন রবীন্দ্রনাথের গান পরিবেশন করছেন তা-ই চলবে, না অন্যতর কোনো দৃপ্ত গায়নভঙ্গী ভবিষ্যতে আসবে? যেসব গান শান্তিদেব-সুবিনয়-সুচিত্রা-কণিকা-নীলিমাদের কণ্ঠে এই সেদিন পর্যন্ত স্ফূর্ত হ'লো তা কি হয়ে থাকবে এক শ্রদ্ধেয় স্মৃতি মাত্র? যেসব গান বাজারচলতি গানের তাৎক্ষণিতার দাবীর চাপে আজ তলিয়ে রইলো সেসব গানের আবার কি উত্থান ঘটবে? পঙ্কজ-হেমন্ত-দেবব্রতদের মতো নিয়ম-না-মানা শিল্পীরা যেমন ক'রে সাধারণ মানুষের ভালো লাগার রঙিন ধূলিপথে রবীন্দ্রনাথের গানকে সহর্ষে টেনে এনেছিলেন তেমনই কি আরেকদল পঙ্কজ আসবেন? যন্ত্রানুষঙ্গে নবতর নিরীক্ষা মিশিয়ে রবীন্দ্রগান পরিবেশনে কি কোনো নবভাবনার জনমনজয়ী প্রবর্তনা আসবে? এ সবই নির্ভর করবে আগামী দশকগুলির শ্রোতার মর্জির ওপর। কারা হবে সেই সম্ভাব্য শ্রোতা?

কান পেতে রই বারেবারে

এখনও পর্যন্ত ধূসর সেই গ্যালারি অর্থাৎ সামনের দশকগুলিতে কোন্ ধরনের বাঙালি শ্রোতা শুনবেন রবীন্দ্রনাথের গান? সে তো আমরা নই। আমরা, যারা অনেকটাই রবীন্দ্রযুগকে পেয়েছি, পড়েছি তাঁকে আমূল, দেখেছি রাবীন্দ্রিকতার মহিমা, তখন হয়তো থাকবো না। আমাদের সামনে পরতে পরতে খুলে গেছে রবীন্দ্রসংগীতের অন্তঃশায়ী বিস্ময়ী আর পরিকীর্ণ বিশ্ব। আমাদের সামনের মঞ্চে ব'সে, এখনকার প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীরা, আমাদেরই আহ্বানে আর আকাঙ্ক্ষায়, মেলে ধরেছেন তাঁদের গানের ডালি, তাঁদের সাধনার স্বর্ণশস্য। তিলে তিলে সঞ্চয় করেছি তাঁদের গানের রেকর্ড আর লাইভ প্রোগ্রামের ক্যাসেট। বাকি জীবনের জন্য সেগুলি আমাদের উচ্ছলতম উপার্জন। আমরা অনেকে রবীন্দ্রনাথকে হয়তো চাক্ষুষ দেখিনি কিন্তু অন্তরের ভেতরে পেয়েছি তাঁর পদধ্বনি। তাঁর ডাকেই আমরা ভিতরপানে খুঁজে পেয়েছি নিজেদের। সে তো আজকে নয়, তাঁরই গান গেয়ে তবু আমাদের প্রাত্যহিকের জীবনচর্যা।

তাই আমাদের এই যুগে সবচেয়ে বড় আবিষ্কারের অহংকার হ'লো রবীন্দ্র-সংগীতকে ঘিরে। এ কথা তো সত্যি যে, তাঁর সমীপবর্তী মানুষগুলি তাঁর অব্যবহিত

সময়ে রবীন্দ্রনাথকে যতটা ভেবেছিলেন কবি ততটা পাননি গীতিকার সত্তায়। একেবারে সামনাসামনি তাঁর গলাতেই তাঁর গান শুনে হয়তো তাঁকে মনে হয়েছিল শুধু একজন সুকণ্ঠ গায়ক। তাঁরা তখন বোঝেননি, আসলে তিনি উত্তর-পুরুষদের জন্য রেখে যাচ্ছেন পরাক্রান্ত এক গানের সম্পদ। আবু সয়ীদ আইয়ুব যে-গানকে তাঁর জিজ্ঞাসাসংকুল জীবনপথের সখা বলে জানবেন, অমিয় চক্রবর্তী বুঝে নেবেন সেই গানকে 'প্রাণের সঙ্গে পৃথিবীর সেতু' ব'লে। শামসুর রহমানের মতো কবির মনে হবে রবীন্দ্রসংগীত এক 'অবিনাশী গীতিমালা'। শঙ্খ ঘোষের উপলব্ধি হবে 'তাঁর মনের এক ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে তাঁর গানগুলির মধ্যে'। রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে মরমীদের এইসব অনুভূতি ও উপলব্ধির উন্মোচন ঘটেছে তাঁর প্রয়াণের পরে, নিবিষ্ট হ'য়ে গান শুনতে শুনতে।

আবার অন্য দিক থেকে দেখলে দুই বাংলা রবীন্দ্রনাথকে এবং মূলত তাঁর গানকে পেয়েছে দুই বিভাজিত সত্তায়। পশ্চিম বাংলার কাছে রবীন্দ্রসংগীত এক সাবলীল উত্তরাধিকার যেন, তাই তার মাত্রাহীন ব্যবহার-বিলাসিতা কিংবা মননহীন হেলাফেলা দুরকমই চোখে পড়ে। অথচ বাংলাদেশের কাছে সেই রবীন্দ্র-সংগীত লড়াই-ক'রে জিতে-নেওয়া এক অমূল্য অর্জন। সেই পরিপ্রেক্ষিত মনে রাখলে, সনজীদা খাতুন যেমন বলেছেন: 'সমগ্র জাতিসত্তার ঐক্যবদ্ধ জাগরণের দিনেও রবীন্দ্রনাথের গান বাঙালিকে গাইতেই হয়' তা সত্য হয়ে ওঠে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে। রক্ত-গভীরে জাতিগতভাবে অর্জিত এই গানকে বাংলাদেশের শিল্পী ও শ্রোতারা তাই বাঁচাতে চান প্রাণপণ মূল্যে, গভীর আত্মমমতায়। ঐতিহাসিক এক সংগ্রামে রত থাকবার কালে ওপার বাংলার মানুষ তাঁদের নিঃসঙ্গ সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথের গানকে খুঁজে পেয়েছিলেন শস্ত্রের মতো। তাঁদের এতদূর মনে হয়েছে, যেমন বলেছেন ওয়াহিদুল হক, যে,

> সমাজকে স্বভাবে ফেরাবার, জাতীয়তার ঐকলক্ষ্য উদ্‌যোগে সমাজকে সংহত করবার, বাঙালীর জাতীয় বিলুপ্তির প্রক্রিয়াকে রোধ ক'রে তাকে বিকাশের ত্যাগ-তপস্যার পথে আনবার একটি বড় উপায় পাওয়া গেল রবীন্দ্রসংগীতে। এই গান মস্ত হাতিয়ার ছিল বাঙালীর পাকিস্তান প্রত্যাখ্যান করার যুদ্ধে। এই গান আবারও সকল বাঙালীকে সকল বাঙালীর সাথে যুক্ত করবার, বাঙালীকে সংস্কৃতিতে, মননে বিশিষ্ট করবার, নবতর সকল সমাজবৈরী শক্তি ও প্রক্রিয়াকে প্রতিরোধ করবার বড় হাতিয়ার হতে পারে। হয়ে উঠেছে।

আশংকা হয়, ওপার বাংলার নবীনতর প্রজন্মের সন্ততিরা হয়তো রবীন্দ্রসংগীতের এই মহৎ সংগ্রামলব্ধ অর্জনের ভূমিকাটি ভবিষ্যতে তেমন ক'রে বুঝবেন না, যেমন সম্ভবত বুঝবেন না এপার বাংলার নবীনতররা যে, কত প্রযত্নে কত মমতায় কত কত তিল তিল সঞ্চয়ে আমরা এই গানকে আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আপন ক'রে নিয়েছিলাম। যার জন্য আমাদের কাছে এই গানের পেছনে অনিবার্যভাবে সর্বদাই দীপ্ত থেকে যায় রবীন্দ্রনাথের এক শুদ্ধ বিগ্রহ। শুধু গান শোনা বা শোনানো তো নয়, তার নেপথ্যে বেজে ওঠে কেবলই এক মহামানবের জায়মান জীবনের ওঠাপড়ার ধ্বনি। এই অতিমর্ত্য মানুষটিকে আমাদের সামনে উন্মোচিত ক'রে দিয়েছেন প্রভাতকুমার, পুলিনবিহারী, শোভনলাল, শৈলজারঞ্জন, ইন্দিরা কিংবা শান্তিদেবের মতো আজীবন অস্খলিত রবীন্দ্রপূজারীরা নানাভাবে। নতুন কালের নবীনরা তো রবীন্দ্রনাথকে পাবেন না এই স্তবমন্ত্রের মতো শুদ্ধ মাত্রায়। বিপরীতভাবে তাঁরা বরং দেখবেন ততদিনে পৌনপুনিকভাবে বর্ধিত বস্তুবাদী রবীন্দ্রব্যবসায়ীদের, জন্মগত উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে যাঁরা কেবলই পুঞ্জিত করেন 'রবিশস্য দগ্ধস্তূপ'।

সেই সঙ্গে এ প্রশ্নও না-জেগে পারে না যে, নতুন কালের বৈদ্যুতিক বিশ্বে, দ্রুত ধাবনশীল স্বতোশ্চলতায় নিক্ষিপ্ত আমাদের সন্তানরা তাদের প্রবর্ধমান শিক্ষাক্রমের চাপ, সাফল্য-প্রতিযোগিতার ইদুর-দৌড় সামলে কখন শুনবে কান পেতে রবীন্দ্রনাথের গানের নির্জন উপচয়? পাবে কি তারা আমাদের মতো অবকাশ-ঘেরা অন্তর জীবনের স্নিগ্ধ সমারোহ? ভয় হয় পাছে তারা সুর ভোলে, পাছে ছিন্ন সময়েরই জয় হয়। আনুষ্ঠানিকতা থেকে ভিন্ন উদ্‌ভাসে, ক্যাসেটের ফিতে থেকে মুক্ত ক'রে প্রাণসংসর্গে, উদাত্ত গায়নে শুনতে চাইবে কি তারা এই গানের সম্পন্ন বাণী ও সুর? ভয় হয়, কেবলই জানতে ইচ্ছে কে তারা, কেমন তারা, কী তাদের মর্জি?

গত কয়েক বছর যেমন দেখছি, সবচেয়ে ঝকঝকে মেধাবী ছেলেমেয়েরা তাদের মেট্রোপলিটন মন নিয়ে ইংরাজি মাধ্যম আর কারিগরিবিদ্যার প্রতি উৎসুক চিত্তে ঝাঁপিয়ে পড়ছে অর্থ আর সামাজিক প্রতিষ্ঠার দিকে। তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি এখনকার মতো নিরঙ্কুশভাবে যদি বেড়েই চলে তবে রবীন্দ্রসংগীতকে তার মর্মে গভীর হৃদয়-ক্ষতের দাগ নিয়ে স'রে দাঁড়াতেই হবে। নিজের দেশ ভাষা ও সংস্কৃতির শিকড়-আলগা, নির্জন, স্ববিরোধী ব্যক্তিত্ব কি এখনকার চেয়ে ভাবী দশকগুলিতে আরো বেড়ে যাবে? অদ্ভুত পোষাক-পরা, ইংরাজি বুকনিতে চোস্ত, হাল্‌কা পর্ণো বা রহস্য-রোমাঞ্চ পেপারব্যাকে মগ্ন, বিলিতি বা মার্কিন গানের ভক্ত যুবকযুবতী, এখন

যারা কেবলই আমাদের শঙ্কিত করছে তারা তো রবীন্দ্রসংগীতকে তাদের জীবনের অংশভাক্ করেনি। এই শ্রেণী যদি বাড়তে থাকে তবে নিঃসন্দেহে বলা চলে রবীন্দ্রনাথের গানের আদর কমতে থাকবে।

সমাজবিজ্ঞানী মামফোর্ড আশঙ্কা করেছেন—নতুন কালের মানুষ নাকি কেবলই এগোবে লক্ষ্যহীন অর্জনের দিকে, নির্বাধ বস্তুগত ব্যাপ্তির দিকে, অসংগঠনের ভয়াবহ বিস্তারে। রবীন্দ্রনাথের গানে তো এই ভ্রান্ত বা উদ্‌ভ্রান্ত জীবনযাপনের স্বপক্ষে কোনো সায় নেই। সেখানে আছে গহন ঘুমের ঘোরে বৃষ্টি-নামা তিমির-নিবিড় রাতের উপলব্ধি, সায়ন্তনের অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনের গূঢ় অনুভব, মাটির কলস ছাপিয়ে যাবার উদ্বৃত্ত উপচিতি, দিনফুরানো সংসারীর ঔদাস্য, স্বপ্নে মনে-হওয়া কোন প্রত্যাশার কড়া-নাড়া, দুঃখ আর মৃত্যুকে ছাপিয়ে অন্যতর কোনো শান্তি ও আনন্দের অস্তিত্ব। নতুন দশকের ছেলেমেয়েদের দ্রুততম জীবনযাপনের ছন্দে এই সব মগ্নতার ভাবনা কোনভাবে তাদের টানবে কি? বরং তারা হয়তো শুনতে চাইবে এমন অনিকেত গান, যার বলার কথা হ'লো :

He is a real nowhere man
Sitting in his nowhere land,
Making all his nowhere plans
For nobody.
Does not have a point of view,
Knows not where he's going to,
Isn't he a bit like you
And me?

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে প্রতিদিন যে-জীবনস্বামীর মুখোমুখি দাঁড়াতে চান আস্তিক্যে ভালোবাসায়, তার এতখানি খর্বতা যদি নতুন গানের প্রসঙ্গ হয় তবে কোন্ আশ্বাস তাদের বাইরে চলার সাহস দেবে কিংবা ডাক দেবে ভিতর পানে? এসব আশঙ্কা জাগে। সেই সঙ্গে এই ভাবনা ওঠে, রবীন্দ্রনাথ যে দাবী ক'রে গেছেন 'শোকে দুঃখে সুখে আনন্দে' বাঙালি তাঁর গান গাইবেই, সেই বাঙালি কি থাকবে আদপে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যেমন বাঙালি-মডেল ভেবেছেন? নাকি ক্রমে ক্রমে তৈরি হবে আন্তর্জাতিক কৃৎকৌশলের সর্বাধুনিক মাপে কতকগুলি মনুষ্যদেহধারী অস্তিত্ব, যাদের হয়তো কোনো বিশেষ জাতিসংস্কৃতিগত আলাদা পরিচয় থাকবে না। এখনকার উদাসীন যে-প্রজন্মকে মনে হচ্ছে 'সর্বজ্ঞ, আত্মসম্পূর্ণ, প্রশ্নহীন', তাদের

ভবিষ্যৎ সন্ততিরা হবে আরও কতোটা আত্মবৃত্তে বন্দী, নির্বিকার ও সংখ্যাতত্ত্বনির্ভর তা কল্পনা করলে দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক এবং সেই সূত্রে রবীন্দ্রসংগীতের অস্তিত্বের আশংকা। সেই চিন্তার গায়ে গায়ে উঠে আসে আরেকটা দুর্ভাবনা যে, রবীন্দ্র-সংগীতের শিল্পী আর শ্রোতার যেমন সংখ্যাহানি ঘটতে পারে ভবিষ্যতে তেমনই অসদ্ভাব ঘটতে পারে ঐ বিষয়ে লেখকেরও। ব্যাপারটি খুলে বলা দরকার।

রবীন্দ্রনাথের গান রচনার মধ্য-পর্ব থেকে বোদ্ধাদের সংসর্গ ঘটেছিলো ব'লে তাঁর গানে নানা নিরীক্ষার সাহস ও বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছিলো। প্রথমে প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী এবং পরবর্তীস্তরে দিলীপকুমার রায় ও ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁকে নানাভাবে গান রচনায় যেমন প্রবুদ্ধ করেছেন জিজ্ঞাসা ও তর্ক তুলে, তেমনই বাংলা গানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসংগীতের অনন্যতা ও নতুনত্বের দিকগুলিও তাঁরাই নানাভাবে লিখে লিখে আমাদের বুঝিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পরও এই বোদ্ধাদের অভাব ঘটেনি বরং বেড়েছে। নানা বিচার আলোয় নানা ব্যক্তিদৃষ্টির সম্পাতে রবীন্দ্রগীতের নানাদিক আমাদের কাছে খুলে গেছে প্রধানত এই বোদ্ধাদের রচনা প'ড়ে। এ ব্যাপারে বিশেষভাবে মনে পড়ে—শান্তিদেব ঘোষ, অমিয় চক্রবর্তী, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, রাজ্যেশ্বর মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, সত্যজিৎ রায়, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, গৌরীপ্রসাদ ঘোষ, সন্‌জীদা খাতুন ও অনন্তকুমার চক্রবর্তীর নাম। দেখা যাচ্ছে এই সব বোদ্ধাদের অনেকেই তাঁদের অন্যতর জীবিকা ও কাজকর্মের ফাঁকে রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে ভাবতে আর লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। হিসেব নিলে দেখা যাবে এঁদের মধ্যে প্রয়াতদের (অমিয় চক্রবর্তী, সৌমেন্দ্রনাথ, আইয়ুব, বুদ্ধদেব) বাদ দিলে অন্যান্যদের বয়সের গড় এখন ষাট বছর। এঁরাই গত তিরিশ বছর রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে ভেবেছেন এবং আমাদের ভাবিয়েছেন। এঁদের পরই শূন্যতা। তার মানে আমাদের যুবসমাজ আজকাল রবীন্দ্রনাথের গানবিষয়ে তাঁদের বোধবুদ্ধির দিকটি লিখে জানাবার কোনো দায় নিচ্ছেন না, কিংবা ভিন্নতর বিষয়েই হয়তো তাঁরা লিখতে আগ্রহী। এদিকে যে-হারে মানবিকীবিদ্যায় মেধাবী ছাত্রছাত্রী কমছে এবং বস্তুবিদ্যাব্রতীর সংখ্যা বাড়ছে তাতে প্রশ্ন ওঠে যে, ভবিষ্যতে রবীন্দ্রসংগীতের সপক্ষে কলম ধরবেন কে? কম্পুটার বিজ্ঞান, পরিসংখ্যানবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, কারিগরি ও বাস্তুবিদ্যা, হিসাবশাস্ত্র এবং বৈদ্যুতিক বিষয়ে যদি দেশের সেরা ছেলেমেয়েরা চলে যায়, তবে গান বোঝা ও তাকে বোঝানোর চেয়ে ক্রমে বড় হয়ে উঠবে গানের বিনোদনের ভূমিকা। ভবিষ্যতের

শ্রোতারা তাই বড়জোর তাঁদের কর্মকাণ্ড অবকাশে যন্ত্রে শুনবেন রবীন্দ্রনাথের গান। সেই গান তাঁদের কেমন লাগবে তা তাঁদের লেখনীমুখে আর ফুটে উঠবে না হয়তো। অথচ নবীন ভাবনাই যুগে যুগে শিল্পবোধের দরজা খোলে। বিশেষত রবীন্দ্রসংগীত এমন এক সূক্ষ্ম ও ক্রমোন্মোচনযোগ্য শিল্প যা আগামী দশকগুলিতে বিতর্ক-বিশ্লেষণ-প্রেরণার বিষয় হ'তে পারে। কিন্তু কে করবে সেই কাজ? শিল্পী-শ্রোতা-বোদ্ধার এই ত্রিমুখী ভাবী শূন্যতার হাত থেকে তাই রবীন্দ্রনাথের গানকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় হলো ভালো শিল্পী সৃষ্টি করা কিংবা এই গান পরিবেশনে কোনো নতুন ভাবনা ও সৃজন পরিকল্পনা যোগ করা। যেমন সত্যজিৎ রায় মনে করেন, রবীন্দ্রোত্তর যুগে রবীন্দ্রসংগীত বেঁচে থাকতে পারে কেবল তার সুর আর ছন্দের জোরে এবং যেটার আসল দরকার সেটা হল এই দুটো দিককে উপযুক্ত সংগতে আরো সমৃদ্ধ করা। ভালো শিক্ষক ও উন্নতমানের শিক্ষণ ব্যবস্থা একটা বড় সমাধানের পথ। আমাদের চিন্তাকে এবারে সেদিকে বিস্তার করা যেতে পারে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে রবীন্দ্রসংগীত শেখাবেন কে এবং কীভাবে?

বাজাও আমারে বাজাও

প্রথমেই কবুল করতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের গান শেখানোর সবচেয়ে কার্যকর ও ফলদায়ী পথ এখন আমাদের করায়ত্ত নয়। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ যেমন ক'রে চাইতেন তাঁর গানের রূপায়ন, বা দিনেন্দ্রনাথ গাইতেন যে ধরনে, সেইটা যাঁরা জানেন তাঁদের সংখ্যা এখন হাতে গোনা যায় এবং তাঁদের বয়স গড়পড়তা আশির কোঠায়। অনাদি দস্তিদার প্রয়াত। আছেন ভগ্নকণ্ঠ শৈলজারঞ্জন, উদাসীনা সাহানা দেবী। আছেন সক্রিয় শান্তিদেব ঘোষ, কিন্তু তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক আসন নেই আর। তাই একেবারে রাবীন্দ্রিক কালের শান্তিনিকেতনী ঘরানার আন্তরিক নিবেদিত গায়নভঙ্গী এখন অস্তমান। এঁদের গায়ন থেকে ইঙ্গিতটুকু নিতে পারি শুধু। কিন্তু এই মুহূর্তে পূর্ণ মহিমায় আছেন এঁদের তৈরি শিক্ষকের দল। আছেন সুবিনয় রায়, শুভ গুহঠাকুরতা, সুচিত্রা-কণিকা-নীলিমা। আছেন কমলা বসু, গীতা সেন। আছেন অশোকতরু আর অরবিন্দ বিশ্বাস, সিতাংশু রায়, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার দাস। এঁদের সকলের বয়সের গড় ষাটের উপরে এবং এঁদের গান-শেখানোর পরিধি প্রধানত কলকাতা, বড়জোর শান্তিনিকেতন। তার বাইরে রয়েছে এক বিরাট পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ, তারও ওপারে বাংলাদেশ। শতবর্ষের পর থেকে এইসব ভূখণ্ডে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার আগ্রহ খুব বেড়েছে, সেই অনুপাতে

শিক্ষায়তন বেড়েছে, ডিগ্রী বিতরণের আয়োজন বেড়েছে কিন্তু যোগ্য শিক্ষক বাড়েনি। এই মুহূর্তে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষণ ও শিক্ষকের ব্যাপারটি খুব জরুরী এইজন্য যে ১৯৯১ সালের পর রবীন্দ্রগানের সুর-গায়কী-মেজাজের সংরক্ষণ বিষয়ে যে-আশংকা দেখা দিচ্ছে তাকে প্রতিরোধ করতে গেলে যোগ্য শিক্ষক ও যথার্থ শিক্ষণের আদর্শ সামনে থাকা চাই। এখনই এই ব্যাপারে দুর্ভাবনার কারণ ঘটে, যদি আমরা বুঝতে চেষ্টা করি, এখনকার হাজার হাজার রবীন্দ্রসংগীতশিক্ষার্থী কোথায় কীভাবে ও কার কাছে গান শেখে। সবাই তো রবীন্দ্রভারতী, বিশ্বভারতীর সংগীত-ভবন, দক্ষিণী, গীতবিতান, রবিতীর্থ, ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তন জাতীয় স্থানে সুযোগ পায় না। তাই ব'লে তাদের আগ্রহ নিবে যায়নি কিংবা তাদের উচ্চাভিলাষী অভিভাবকরা নিরস্ত হননি। সেই আকুলতার সুযোগে ঐকান্তিক আগ্রহের কারণে ছোট বড় নানা শহরে, গঞ্জে, গ্রামে, নতুন-গড়ে-ওঠা উপনিবেশে, ইস্পাতনগরে, বঙ্গ-ভাষাভাষী পাহাড়ি এলাকায় গ'ড়ে উঠছে শিক্ষালয় কিংবা বাড়ি বাড়ি ঢুকে পড়ছেন অদক্ষ অদীক্ষিত রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষক। এই সব শিক্ষকের রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে কতটুকু জ্ঞান আছে, শিক্ষা আছে, বোধ বা কণ্ঠসম্পদ আছে সে প্রশ্ন কেউ তোলেন না, তাহলে ডিপ্লোমা ডিগ্রি মিলবে না। কিন্তু মুস্কিল যে, রবীন্দ্রসংগীতের অভিজ্ঞানপত্র আর গ্রামসেবক বা ফার্স্ট এড ট্রেনিংয়ের ডিপ্লোমা তো এক বর্গের নয়। এ যে জীবনের এক মহৎ অর্জন, এ যে রসলোকের চাবি! সেইজন্যই কি বাঞ্ছনীয় অতিরিক্ত সতর্কতা, জাগ্রত বিচারবুদ্ধি? এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের একজন মুক্তবুদ্ধি গীতিপ্রেমিকের আবেদন এখানে উদ্ধারযোগ্য। বলছেন তিনি :

> সকলের চাইতে কঠিন শিক্ষক-সন্ধান।...শিক্ষক এদেশ থেকে হারিয়ে গেছে। এমন কি শিক্ষার, শিক্ষকতার আদর্শটিও। সেই আদর্শটিকে ফিরে আবিষ্কারের অভিযান আরম্ভ হোক। শিক্ষককে মাইনে-গোনা গানের মাস্টারের ভাবমূর্তি থেকে উদ্ধার করতে হবে, শিক্ষকনামীয় কচিকণ্ঠের সর্বনাশসাধনকারীদের কবল থেকেও সুকুমার শিশুকিশোর ও ততোধিক অবোধ তাদের গুরুজনকে উদ্ধার করতে হবে।

এখানে উদাহরণ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের কিছু প্রতিষ্ঠিত সংগীতশিক্ষকের অভিজ্ঞতা পেশ করা যেতে পারে 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকার ২ মে ১৯৮৪ সংখ্যা থেকে। রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পী ও শিক্ষিকা বন্দনা সিংহ একটি রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষায়তনে ক্রিয়াত্মক পরীক্ষা নিতে গিয়ে এক শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'জোড়াসাঁকো কোথায়'?

শিক্ষার্থীর চটপট জানান, 'সাঁকরাইলের কাছে'। এখানে বন্দনা সিংহের সংগত-ভাবেই মনে হয়েছে শিক্ষার্থীর চেয়ে শিক্ষকের অপরাধ বেশি।

আরেকটি সরেজমিন তথ্য এইরকম :

> এক জায়গায় পরীক্ষা নিতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের নিচু মান দেখে অবাক হয়েছিলেন (বন্দনা সিংহ)। ব্যক্তিগত অনুসন্ধান বলে দিল, এঁরা সকলেই শিখেছেন এক কৌতুকগীতি শিল্পীর কাছে। সুতরাং ফল যা হবার তাতো হবেই। ব্যাঙের ছাতার মত এখানে-ওখানে স্কুল। তার চাইতে বেশি শিক্ষক।...এঁদের অধিকাংশেরই নিজের শিক্ষা সম্পূর্ণ নয়। বোধও সম্পূর্ণ শিক্ষিত নয়।

'প্রতিক্ষণ' পত্রিকার সাক্ষাৎকারে সংগীতশিক্ষক প্রফুল্লকুমার দাস একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। প্রতিবেদক জানাচ্ছেন,

> রবীন্দ্রসংগীতের ভবিষ্যৎ বিষয়ে প্রশ্ন উঠলে সমস্ত দায়িত্ব প্রফুল্লবাবু শিক্ষকদের কাঁধে, অর্থাৎ নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। বললেন, আমরা কি রকম মানুষ থাকব তার ওপরই তো সব নির্ভর করছে।

সেই দূর ভবিষ্যতের রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষকদের বিগ্রহ ও মতিগতি এখন খুবই অস্পষ্ট। আপাতত এই সূত্রে বাংলাদেশের সমস্যার কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করা উচিত। সেখানে এখনই শিক্ষক সংকট চরম। স্বরবিতান দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যেসব রেকর্ড ও ক্যাসেট সেখানে যাচ্ছে তার মধ্যে কোন্ গায়নটি যে অনুসরণযোগ্য তা নিয়ে দ্বিধা ও দোলাচল তীব্র। সন্‌জীদা খাতুন সরাসরি আক্রমণাত্মক সুরে জানিয়েছেন :

> রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে এপার বাংলার মানুষ ভারতীয় শিল্পীদের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এসেছে বরাবর। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন শিক্ষালয় ভারতে অবস্থিত হওয়ায় এবং সাক্ষাৎ শিষ্যদের বাস ওপারে হওয়ার স্বভাবতই এমন হয়েছে। ভারতের প্রচারযন্ত্রগুলি যদি আদর্শনিষ্ঠ থেকে সৎভাবে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারে নিরত থাকত, তবে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে এত বিভ্রান্তি সৃষ্টি হত না। রবীন্দ্রসংগীতের যে-বিকৃতি বাংলাদেশে দেখা দিয়েছে তার জন্য দায়ী ভারত। পপ স্টাইলে ঘুঙুমার বাজনা বাজিয়ে রবীন্দ্রসংগীত গাইবার আদর্শ প্রচার হয়েছে ভারত থেকে। সংস্কৃতির অপমৃত্যু ঘটাবার কৃতিত্বে পপ স্টাইলে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার পদ্ধতির তুল্য আর কিছু নেই।

সন্‌জীদা অবশ্য বিশাল ভারতের উপরে যে-দোষটা চাপিয়েছেন তা নিতান্তই পশ্চিমবঙ্গের উপর বর্তায়। তবু সমস্যা সমস্যাই। বাংলাদেশ বড়জোর কলকাতার সম্প্রচারকে উপেক্ষা করতে পারে। কিংবা ওয়াহিদুল হকের মতো তাঁরা বিকল্প ভাবতে পারেন—'সাক্ষাৎ অন্য কোন গুরুর অসদ্ভাবে তাঁর স্বরবিতানই আমাদের দ্রোণবিগ্রহ'। তবু বাংলাদেশেরই আরেক বুদ্ধিজীবী রফিকুল ইসলাম খুব খেদের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন,

> বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে আমাদের অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীর বিশেষত তরুণ ও নতুন শিল্পীদের যথার্থ রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে ধারণার অভাব রয়েছে। কেবল স্বরলিপি বা ক্যাসেট রেকর্ডিং কখনও সংগীত-শিক্ষকের অভাব মেটাতে পারে না। কেবল অনুসরণ বা অনুকরণ শিল্পীর নিজস্ব মৌলিক ব্যক্তিত্বের অভাব পূরণ করতে পারে না।

রাবীন্দ্রিক স্টাইলের নামে বেসুরো কণ্ঠে অস্পষ্ট উচ্চারণে নির্জীব প্রাণহীনভাবে বাংলাদেশের বহু শিল্পীর গান শুনে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন 'অধুনা ঐসব কারণে রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীরাই রবীন্দ্রসংগীতের সবচেয়ে বড় শত্রু।' সে দেশের আরেক বুদ্ধিজীবী গোলাম মুরশিদ ১৯৯১ সালের পর রবীন্দ্রগানের আশংকিত স্বরবিকৃতি প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত করেছেন, যা-ই হোক শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকবে শ্রোতাদের রুচি ও বিচার! সবরকম অপঘাত তাঁরাই ঠেকাবেন। তাই, মুরশিদের মতে,

> রবীন্দ্রসংগীতকে বিধি-বিধানের বেড়াজালে আটকে না-রেখে শ্রোতা-সাধারণের মধ্যে তাকে জনপ্রিয় করার এবং শ্রোতাদের রুচিনির্মাণের কাজই বরং অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, শেষ পর্যন্ত এঁরাই রবীন্দ্র-সংগীতের বিশুদ্ধতা রক্ষা করবেন।

তাহলে আমরাও কি শেষ পর্যন্ত শ্রোতাদের ওপরই দায়িত্ব চাপিয়ে এ আলোচনার সমাপ্তি ঘটাবো? কিন্তু মুশকিল এই যে, আগে শিল্পী তারপরে তো শ্রোতা। সেই শিল্পীর সাফল্য নির্ভর ক'রে যথার্থ আন্তরিক ও মননশীল শিক্ষণের ওপরে। আমাদের বাংলায় সনিষ্ঠ শিক্ষক-পরম্পরা কেবল কলকাতা আর শান্তিনিকেতনেই থাকতে পারে বড়জোর, তার বাইরে এতবড় দেশে রবীন্দ্রসংগীতের স্বরদূষণ রোধ করবে কে? ওপার বাংলাতেই বা শেখাবেন কে? শেষ পর্যন্ত স্বরবিতান আর ক্যাসেট থাকবে। সেই ক্যাসেটের একাধিক গায়নও নির্ভরযোগ্য বা গ্রহণীয় হবে কিনা তাতে এখনকার মতোই সংশয় আর সন্দেহ থাকবে। তাহলে বোঝা গেল, ভবিষ্যতে

থাকবে শুধু স্বরবিতানের দ্রোণবিগ্রহ আর নিঃসঙ্গ গায়কের একলব্য নিষ্ঠা। আমাদের পুরাণে একলব্যের নিষ্ঠা ও দ্রোহ খুব শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত। কিন্তু একলব্য অমর হননি সফলতায়।

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের সকল উদ্ধৃতি 'সঙ্গীত সংস্কৃতি' ঢাকার জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলন ১৯৮১-৮৫ স্মারকগ্রন্থগুলি থেকে গৃহীত।

মার্কসবাদ ও অস্তিতাবাদ : অবিচ্ছেদ্য বিচ্ছিন্নতা

পথিক বসু

১

হেগেলের সমালোচনা করেছিলেন মার্কস, কিরকেগোরও ; তবে দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দুরকম, মার্কস আত্মচৈতন্যকে বাস্তব সমাজ-রাজনৈতিক অর্থে বুঝতে চেয়েছিলেন, গ্রুণ্ডরিশেতে যেমন Social Individual ধারণার 'পর জোর রেখেছিলেন, অন্যদিকে কিরকেগোর তাঁর 'Postcript' এ আত্মচৈতন্যকে হেগেলীয় বিমূর্ত মানুষ দিয়ে না বুঝে মানুষটাকে একান্ত ব্যক্তিমানুষের সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে বুঝতে চেয়েছেন। দুজনের তফাৎ এখানেই, যদিও বলা যায়, দুজনের যাত্রাবিন্দু ছিল একই হেগেল ধরে, হেগেলের সমালোচনায়।

মার্কস একটা বৈপ্লবিক কর্মস্পৃহা কল্পনায় এনেছিলেন—মানুষ পরিবেশ পাল্টাবে আবার পরিবেশ মানুষকে পাল্টাবে, একে অপরের সাহায্যে বিকশিত হবে, তাই অর্থনীতিগতভাবে যত বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর কমিউনিজমে আমরা যাব, আমাদের মানসিকতার গণ্ডী ততই বিস্তৃত হবে—এরকম ছিল মার্কসের সক্রিয় ধ্যান। Early Writings-এ পাই [Marx K—Early Writings। Bottomore T (ed) : London : 1963]—The division of labour and exchange are the two phenomena which led the economist to vaunt the social character of his science, which in the same breath he unconsciously expresses the contradictory nature of his science—the establishment of society through unsocial particular interests. এতে মার্কস-গবেষণা শুরু হয়েছে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল ধরে : মার্কসের মানুষ এই শোষণসর্বস্ব সমাজে উৎপাদনে আসতে বাধ্য হয় ও আসে এবং দ্রুত হারে বিক্রয় করে থাকে তার শ্রমশক্তি, তৈরী করে পণ্য। এই মানুষ অর্থনীতির শ্রমবিভাজনী শক্তিতে আপনাকে কেনা গোলাম করে রাখে, ফলে তার সৃষ্টির সাথে তার কোন সম্পর্ক সে অনুভব করতে পারে না, জন্ম নেয় বিচ্ছিন্নতা—প্রথমে তার সাথে তার পণ্যের, ক্রমে তার সাথে তার

যাবতীয় সৃষ্টির, অর্থাৎ সবশেষে, তার সাথে তার নিজের—কারণ সে এবার তার প্রেরণায় স্রষ্টা হতে পারছে না, তাকে নির্ভর করতে হচ্ছে সামাজিক চাহিদা ইত্যাদির 'পর আর এ সমাজ যদি শোষকশোষিতের নগ্নতা মেনে চলে তাহলে মানুষের আত্মবিচ্ছিন্নতা আরো হয় কুৎসিত, বলাবাহুল্য। মার্কস আত্ম-বিচ্ছিন্নতার (self alienation) এমন বাস্তব যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা প্রেরণ করলেন, হেগেলীয় আত্মা কর্তৃক বিচ্ছিন্নতার (alienation created by spirit) ভাববাদী মোহ থেকে মানুষ ও দর্শনকে মুক্ত করলেন। এবং, এবার মার্কস এখানেই থেমে থাকলেন না, মানুষের মুক্তির কথা ভাবলেন, মুক্তির প্রসঙ্গেই এসে পড়ল তাঁর নিরবিচ্ছিন্ন বিপ্লবের তত্ত্ব (অবশ্য সোভিয়েত রাশিয়া একে মেনশেভিকী তত্ত্ব ও ট্রটস্কীয় কুচুটেপনা বলে জ্ঞানগম্যি করে থাকে) ও বৈপ্লবিক কর্মস্পৃহার (revolutionary praxis) আগুন, আমরা জানলাম মানবিক মুক্তি (আত্মিক ও অর্থনৈতিক) একটা নিরবিচ্ছিন্ন বিপ্লব মারফৎ, অবশ্যই।

আজকের দিনে, যখন অনেকগুলি বিপ্লব ঘটে গেছে, অনেকগুলো সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে, আবার অনেকগুলো সমাজতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদে ঘুরে গেছে তখন আমাদের সামনে পড়ে থাকে এক নির্মম প্রশ্ন : এই বিপ্লবে কি আত্মবিচ্ছিন্নতা ঘুচে যাবে ?

কিরকেগোর প্রায় একই জায়গা থেকে শুরু করেছিলেন—তিনি ব্যক্তির আত্ম-বিচ্ছিন্নতা ও উনবিংশ শতকের পুঁজিবাদী সমাজকে তাঁর গবেষণার উপপাদ্য হিসেবে আনলেন, কিন্তু কিছু সময়ের মধ্যেই তিনি মানুষের অন্তর দিকে চোখ ফেলে যখন দেখলেন মানুষটার নিজের মধ্যে যাবতীয় সংস্কার কুসংস্কারের দ্বন্দ্ব, তখন সমাজকে এই সংস্কারের সাথে মিশতে ভুলে গেলেন, গড়ে উঠল একান্ত ব্যক্তিক একটা মতবাদ।

যে ব্যক্তিমানুষকে হেগেল মহাজাগতিক আত্মার জলকণা হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন সেই ব্যক্তিমানুষে কিরকেগোর পেলেন ভঙ্গুরতা, চিরঅসমাপ্ততা, অন্যসাপেক্ষতা (contingency)। তিনি বললেন মানুষের এই অতিবাস্তব অস্তিত্বকে (existence) অস্বীকার করে তাতে মহাজাগতিক ইচ্ছার চালিকাশক্তি বসিয়ে হেগেল প্রকৃতপক্ষে ভুলই করেছেন (Kirkegward S : The Present Age : Wy, Harper and Row : 1962)। অতএব মানবচরিত্র উদ্ঘাটনে যদি কিছু ত্রুটি থাকে যে ত্রুটি তাহলে হেগেলের। কিরকেগোর প্রশ্ন করলেন এই ভঙ্গুর অস্তিমান মানুষের স্বাধীনতা (freedom) কিভাবে সম্ভব, এ স্বাধীনতা

তো সমাজ বা সমাজবিপ্লব দিতে পারবে না কারণ এটা নিকট অভ্যন্তরে নিয়োজিত আবার, হেগেলীয় সিষ্টেম দিয়ে এর মূল্যমাপ অসম্ভব যেহেতু হেগেল একান্ত নির্খুত মননের উত্তরাধিকারী হিসেবে মানুষকে কল্পনা করেছেন। অর্থাৎ মনস্তত্ত্ব-মূলক দর্শনের জন্ম দিতে এলেন কিরকেগোর, স্বীকারে আনলেন মানুষের চিরন্তন ঋণময়তা, মানুষ মানবিক আবার জান্তবও, ফলে জান্তব কিছু বৃত্তি মানুষের থাকবেই। এই ঋণাত্মকবোধকে দর্শনে আনতে চাইলেন কিরকেগোর, কিন্তু কোন সফল ব্যাখ্যা, অথবা সেই ঋণময়তা থেকে উদ্ধারণের কথা বলতে পারলেন না তিনি, যেটা পেরেছিলেন মার্কস ; অন্ততঃ তিনি সমাজবিপ্লবের কথা দর্শনে সম্পৃক্ত করার সাফল্য অর্জন করেছিলেন সে কথা নিশ্চয় অনস্বীকার্য।

কিরকেগোর জিজ্ঞাসু হয়েছিলেন স্বাধীনতা সম্বন্ধে, আমরা যাই করি না কেন আমাদের লক্ষ্য থাকা উচিত স্বাধীন হওয়া, স্বইচ্ছায় নির্বাচিত হওয়া ; এই স্বাধীনতা-বোধ কিরকেগোরের চোখে যথেষ্টই কাল্পনিক, কারণ আমরা সবসময়ই আমাদের অস্তিত্বের জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করে থাকি, আমাদের জন্ম শিক্ষা সবটাই অন্যের ওপর যথেষ্ট নির্ভরশীল, (একমাত্র মৃত্যু ছাড়া) সবসময় আমরা অ-স্বাধীন, সুতরাং এ স্বাধীনতা বুঝব কিভাবে, অনুভবে আনব কি করে ? প্রশ্ন করলেন এবং প্রায় অন্ধকূপে ঝাঁপ দিলেন কিরকেগোর। আদি ফ্রয়েডে (Early Freud) আমরা প্রায় একই সমস্যা পাই, ফ্রয়েডও মনে করতেন মানুষ এক হয়েছে পৃথক হবার ভয়ে, তার পাশবিকতা তাকে গিলে ফেলতে পারে সেই ভয়ে ; অন্যদিকে মার্কস মূলতঃ পজেটিভ, মার্কসের মতে মানুষ এক যেহেতু মানুষ মানবিক, মানবিক-রাজনৈতিক (Zoon Politikon)। হতে পারে মার্কস এইসব অনুমানে কল্পবিদ, কিন্তু তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা এ কারণেই যেহেতু তিনি মানুষকে মানবিক হিসেবে ঔজ্জ্বল্য দিয়েছিলেন।

আমরা যদি মার্কস ও কিরকেগোরকে স্বীকার করে (এতটার মধ্যে অস্বীকারের কিছু আছে কি ?) বলি মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব যেমন সত্য, তেমনি সত্য তার আত্মিক ব্যক্তিকতা (যাকে হেগেল Objectivier Geist ও Subjectivier Geist হিসেবে মানতেন) এবং যারা একে অপরের ওপর ক্রিয়াশীলও, তাহলে একটা যোগসূত্র পাওয়া অসম্ভব ছিল না, কিন্তু সে কাজ হয়নি। মার্কসের দিক থেকে এ' কাজের প্রয়োজন ছিল না কারণ তিনি হেগেলীয় কেনমেনোলজিতে আস্থাশীল ছিলেন, তাঁর প্যারী মানুস্ক্রিপ্টে দেখি : Let us examine Hegel's system. It is necessary to begin with the phenomenology because

it is there that Hegel's philosophy was born and that its secret is to be found। এছাড়া তিনি মানুষ ও প্রকৃতিকে essential being হিসেবে মানতেন, ম্যানুস্ক্রিপ্টে দেখি : Socialism no longer requires such a roundabout method ; it begins from the theoretical and practical sense perception of man and nature as essential beings। সুতরাং অস্তিত্যবাদের দিকে যাবার প্রয়োজন তাঁর ছিল না। ওদিকে অস্তিত্যবাদ পাশাপাশি চলতে লাগল, বিশুদ্ধ তাত্বিক কথোপকথনে আমরা একে একে হুসার্ল হাইডেগার নিৎসে বুবার জেসপার্সদের পেলাম—অথচ একটা শক্তিশালী দর্শন, মার্কসবাদের সাথে তাদের পরিচিত হবার কোন অভিপ্রায়ই দেখতে পেলাম না, যদিও দেখা গেছে মার্কসবাদের বহু নীতির সাথে তাদের সাদৃশ্য। উদাহরণে আনি মার্কসের মানুষ সম্পর্কিত ধারণা : মার্কসের মতে মানুষ অদ্বিতীয় (unique), তার সাথে শতেক ফারাক কি প্রাণী কি উদ্ভিদ কি বস্তুর, সে প্রজাতি-সত্তায় (specis-being), কারণ সে আত্মসচেতন ও মুক্ত, সে প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা দিতে পারে, তাকে জাগতিক করে তুলতে পারে, সে যে জানে সেটাই শেষ কথা নয়, সে জানে যে সে জানে, সে ভবিষ্যৎকে ছকে ফেলতে পারে, তার অস্তিত্বকে উপযুক্ত করে তুলতে পারে, আর এটা সে পারে একমাত্র এই কারণে যেহেতু সে মুক্ত দায়িত্ববান ও স্বতন্ত্র (EPM 1844)। প্রায় সমার্থক কথা পাই হাইডেগারে মানুষ অস্তিত্বসচেতনেই অস্তিবান (ontological being, ভাবানুবাদ আমার) কারণ সে আত্মসচেতন এবং বিশ্বজনীনতার সকল স্রষ্টা (Heidegger M : Being and Time : Wy, Harper and Row : 1962)। বুঝতে পারছি খুব কাছাকাছি থেকেও দুটো মতবাদ মিশ্রিত হতে পারে নি। ওলেন সার্ত, সম্ভবতঃ অস্তিত্যবাদের শেষ দার্শনিক, কারণ তাঁর মতে অস্তিত্যবাদের কবর তিনিই খুঁড়ে রেখেছেন, মার্কসবাদ পুনরুজ্জীবিত হলে সে বাদ অতঃপর অবমৃত হয়ে যাবে বলে মনে করেছেন প্রখ্যাত এই দার্শনিক। এই বোধ আমাদের প্রয়োজন, তাই একে সাথে নিয়ে আমরা চলে যাই সার্তে।

দুটো শব্দ আমাদের আকর্ষণে আসে : মার্কসবাদের পুনরুজ্জীবন ও অস্তিত্য-বাদের মৃত্যু ; মার্কসবাদের পুনরুজ্জীবন সংক্রান্ত সার্তিয় ধারণাকে নিদারুণ কটাক্ষ করেছিলেন, মার্কসতাত্বিক লুকাচ, জানা নেই অস্তিত্যবাদের মৃত্যুর 'পর সার্তিয় ঘোষণাকে কি চোখে নিয়েছেন অস্তিত্যবাদীরা, তবে একটা শিক্ষা আমরা পাই। সেটা হচ্ছে প্রয়োগীয় মার্কসবাদে কিছু অপরিহার্য ত্রুটির আবিষ্কার (এ শিক্ষায়

সোভিয়েত তাত্ত্বিকেরা নিদারুণ চটেন, সার্তকে বুর্জোয়ার দালাল বলতে কসুর করেন না)—ত্রুটি অনুসন্ধানে নামছি পরবর্তী অধ্যায়ে।

২

সার্ত ও মার্ক্সের বিয়োগ বিস্তৃতি আলোচনা করার আগে বুঝে নেয়া প্রয়োজন মার্কসবাদের প্রতি সার্তর কোন অবশেসান ছিল কি না, কারণ আমরা দেখেছি তৎকালীন মার্কসবাদের গোঁড়ামিকে সার্ত দুভাবে আপত্তি জানাতেন—রুশ সমাজতন্ত্র তথা ষ্টালিনী শাসনকে তিনি কমিউনিজম (আরো স্বচ্ছ কথায় হিউমানিজম) পরিপন্থি বলে মনে করতেন; দ্বিতীয়তঃ মার্কসবাদী নীতিকাঠামোয় ভ্যালেরী-ফ্লবেরদের সাহিত্য-কীর্তি সমালোচনাকে তিনি স্বীকার করতেন না। ফলে, অনুমান করে নিতে পারি মার্কসবাদের এই modern sclerosis হয়তো তাঁর মার্কসীয় বোধে কিছু অবশেসান তৈরী করতে পারে, তাই সার্ত-মার্কস আলোচনায় প্রথমে বুঝে নিতে হচ্ছে সার্তর আপত্তিকর অংশবিশেষ মার্কসবাদের কোথায় চিহ্নিত হয়েছে।

জন উইল্ড তাঁর গবেষণায় (Wild J : Marxist Humanism and Existantialist Philosophy, (in the book) : Dialogues on the Philosophy of Marxism : Somerville J and parsons HL (eds) : Greenword Press, Connecticut : 1974) সার্তর কয়েকটা আপত্তিকে তুলে ধরেছেন যারা মার্কসবাদী আলোচনায় উপস্থিতি অথবা বিঘ্ন ঘটায় বলে মনে করেছেন উইল্ড।

(ক) সার্তর চোখে সোভিয়েত সমাজ প্রকৃতপক্ষে অগণতান্ত্রিক, এখানে মানুষ ক্রীতদাসই। সার্ত তাই চাইলেন 'ব্যুরোক্রাসীমুক্ত বিকেন্দ্রীকৃত গণতান্ত্রিক' সমাজতান্ত্রিক সমাজ। কিন্তু, এ কথা বলার সাথে সাথে, তাঁর বোধ পর্যাপ্ত পরিমাণে অগণতান্ত্রিকতায় আবিষ্ট হয়ে গেল বলে মনে করলেন অধ্যাপক উইল্ড। যেমন :

(খ) সার্তর মানুষ অথবা বলা যায় প্রত্যেক অস্তিতাবাদী দার্শনিকের মানুষ যাত্রা শুরু করে একক বিচ্ছিন্ন হিসেবে, যার কারণে (এটা অস্তিতাবাদী দর্শনের পজেটিভ দিক) যে মানুষ আত্মবিশ্লেষণের সাথে সাথে চারপাশের জগৎকে বুঝতে পারে, কিন্তু এ মানুষ সমাজ অথবা গ্রুপ গড়তে পারে না (এটা অস্তিতাবাদী দর্শনের নেগেটিভ দিক)—এর অব্যবহিত ফল হল যখন সেই একক (ধরে নিলাম মুক্ত'ও) মানুষ ইতিহাসে প্রবেশ করে ততক্ষণে ইতিহাস কিন্তু চলতে শুরু করে

দিয়েছে (উইল্ড এ মানুষের নাম রেখেছেন Late-comer man), অতএব যে মানুষের চিন্তাভাবনা অস্তিত্ব সম্পূর্ণই ইতিহাসের কাঠামো তথা নিয়মের ওপর নির্ভরশীল, অতএব পরাধীন এবং অপ্রতিহত পরাধীন যদিও তার কাঠামোও যে স্বাধীন। সার্তর মানুষ, সার্তর উদাহরণে, বাস-ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে আছে, এ অপেক্ষার প্রতি পল নির্ভরশীল বাসকোম্পানীর নীতিব্যবস্থার ওপর, রাস্তা ট্রাফিক পুলিশ অথবা সিগন্যালের ওপর—কিন্তু কখনোই অপেক্ষারত সেই মানুষটির ওপর নয়। উইল্ড বলতে চেয়েছেন অস্তিতাবাদের এই নেগেটিভ প্রবণতা সার্তর মধ্যে কাজ করেছিল বলে সার্ত সোভিয়েত সমাজকে অগণতান্ত্রিক চিহ্নিত করেও কোন স্পষ্ট গণতান্ত্রিক মানুষের সৃষ্টি করতে পারেননি (এ অভিযোগের বিপক্ষে বহু কথা বলা যায়, এ অভিযোগ হয়ত আমাদের না থাকতেও পারে, তবু একে অভিযোগের পর্যায়ে রাখলাম এই কারণে যাতে পরিদৃশ্য হতে পারে সার্তর মার্কস বিরোধীতা।)

(গ) সার্ত যথেষ্ট হেগেল জানতেন (আইরিশ মারদোশ তো অভিযোগই এনেছিলেন সার্ত আসলে মতবাদের নিক্তিতে Hegel in modern dress), জানতেন হেগেল বাস্তব সামাজিক অস্তিত্বকে (হেগেল বলতেন objectivier Geist) স্বীকার করেছেন, কিন্তু সার্ত এই অস্তিত্বকে বিশুদ্ধ চৈতন্য (poures soi) অথবা বস্তু নিচয় (en soi)—কোনোভাবে বুঝতে চাননি, ফলে চলে গেলেন সত্তা ও শূন্যতায়, শূন্যতার (nothingsness) দার্শনিক সীমারেখা নির্ধারণে এবং বার্ধক্যে স্বীকার করলেন শূন্যতা নিয়ে সাড়ে সাতশো পাতার Being and Nothingness একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গিয়েছিল। সত্তার সামাজিক অস্তিত্ব (যদি সে সময় তিনি হেগেলকে অমান্য করতেন তাহলে অবশ্য অন্যকথা) নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছিল দেরীতে, ক্রিটিকে, ততদিনে তিনি 'গণতন্ত্র' ব্যাপারটায় সন্দিহান, ফলে 'সামাজিক অস্তিত্ব' শব্দটা তাঁর কোনই সহানুভূতি কেড়ে নিতে পারল না, যদিও তাঁর সমসাময়িক দার্শনিক মার্লো-পন্তি ব্যাপারটা ধরে ফেলেছিলেন।

আরেকটু বিষদে বোঝার চেষ্টা করি। ধরা যাক একটা ফ্যাক্টরী। তার একটা নিজস্ব সংগঠন আছে, সংগঠনের মাপঝোক অনুযায়ী সেই ফ্যাক্টরীতে মেশিনপত্তর লোহালক্কর সাজানো, এই সাজানোগোছানো ফ্যাক্টরিকে নিছক কতকগুলো বস্তুমণ্ডলী ভাবার কোন কারণ নেই যেহেতু তারা প্রত্যেকে মানুষের ক্রিয়াবিক্রিয়ার সার্থক উদ্দেশ্য নিয়ে সজ্জিত। এবং সে ফ্যাক্টরীর শ্রমিক ম্যানেজার তাদের নিজ নিজ জ্ঞান বুদ্ধি নির্দেশ অনুযায়ী বুঝতে পারে এইসমস্ত মেশিন কাঁচা-মাল ইত্যাদিরা অক্রিয় বস্তুনিচয় (en soi) নয়, রূপান্তরযোগ্যতা তাদের আবশ্যিক

চরিত্র—এই ঘটনাকে মার্লো-পন্তি বলতেন অন্তর্বিশ্ব (inter world / inter monde) যা কিনা জড়পদার্থে উদ্দেশ্য আরোপ করে তাকে কর্মযোগ্য করে তুলতে পারে (জ্যাক মোনো বলতেন projective artefact এবং এই দর্শন তিনি জিন তত্ত্বে প্রয়োগ করেছিলেন)। এই জটিলে সজ্জিত যন্ত্রমণ্ডলী ও তাদের প্রতি মানুষের সচেতন নজর একে কতকটা singular করে রেখেছে যেহেতু ফ্যাক্টরী নিজেই একটি singular সংগীন যে কিছু পণ্যের জন্ম দিয়েছিল, কিছু পণ্যের জন্ম দিচ্ছে ও কিছুর জন্ম দেবে। অর্থাৎ এই ফ্যাক্টরী এখন একাধিক এককের (একাধিক একক শ্রমিক অথবা ম্যানেজারের) মধ্যে থাকা একটি একক সংগঠন যার রয়েছে তীক্ষ্ণ একতা ও সম্পূর্ণতা, যার ফলে আমরা তার অতীতে উৎপাদিত পণ্যের রেকর্ড পাই, পাই বর্তমান পরিস্থিতির তথ্য এবং পাই ভাবী উৎপাদন সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তা অথবা পরিকল্পনা। আরেকটু এগোই : একক সেই ফ্যাক্টরী উৎপাদনের তাগিদে অথবা মাত্রাবৃদ্ধিতে নতুন নতুন শ্রমিক ম্যানেজারকে নিয়োগ করে, কিংবা training প্রথা চালু করে যাতে একক শ্রমিকের (বা ম্যানেজারের) চিন্তায় সেই একক ফ্যাক্টরীটির উদ্দেশ্য ভালমাত্রায় জারিত করা যায়। অথবা আরেক দিক পড়ে থাকে—এটাই অস্তিতাবাদী দর্শনের গবেষণার বিষয় : কখনো এমনটাও ঘটে যখন শ্রমিক ম্যানেজাররা তাদের অস্তিত্বের প্রতি জিজ্ঞাসু হয়েই ফ্যাক্টরীকে বুঝতে চেষ্টা করে (এখান থেকে 'মার্কসবাদী বিচ্ছিন্নতা' প্রকল্পের জন্ম, দেখা যাক্, অস্তিতাবাদ, সর্বোপরি সার্ত, কি ভাবেন)।

এই প্রবণতাকে হেগেল বলতেন Subjectivier Geist, সার্ত ব্যবহার করলেন দুটো শব্দ internalizing, মার্কস প্রভাবিত হয়ে totalizing। ঘটনাটা এরকম দাঁড়ায় : একক শ্রমিক একদিকে, চালু ব্যবস্থা অন্যদিকে ; একক শ্রমিক তার সৃষ্টি সম্বন্ধে সচেতন, সচেতন বলেই সে যেমন ফ্যাক্টরীকে বুঝতে পারে তেমনি নিজেকেও বদলাতে পারে। এতটা মেনে নিলেন সার্ত। কিন্তু এর দুটো ফল আছে। এই সৃষ্টিধর্মী totalizing ক্ষমতা কি প্রচলিত সিষ্টেমের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কাজ করবে নাকি তাকে পরিবর্তিত করতে সক্ষম হবে ? শেষ কি হবে ? সার্ত সমস্যাটাকে যতটা গভীরে দেখা উচিত তার চেয়ে অনেক অগভীরে রইলেন, অধ্যাপক উইল্ডের মতে এই ইনহিবিশানের কারণ হল সার্তর গণতন্ত্র সম্পর্কে অনীহা।

প্রচলিত মার্কসবাদের বিরুদ্ধে এই কটা অবশেসান বুঝে নেবার পর সার্তে গাঢ় নিশ্বাস নির্ভুলতা আনতে পারবে বলে মনে করি। যে (Citique of

Dialectical Reason-এ সার্ত মার্কসবাদ ও অস্তিতাবাদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ সাংশ্লেষণ করেছিলেন তার উৎকৃষ্ট আলোচনা পাই দেশানের বইতে (Desan W : Marxism of Jean Paul Sartre : Wy, Doubleday : 1965), লেইং ও কুপার সম্পাদিত ও সংক্ষেপিত সার্ত-দর্শনের বইতে (Laing RD and Cooper DG (eds) : Reason and Violence : Tavistock : 1964)—আমাদের পরবর্তী আলোচনা শুরু হচ্ছে দেখানকার সাহচর্যে।

ক্রিটিকে সার্ত ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের তুলনামূলক গবেষণা করলেন, দেখালেন দ্বন্দ্বের দুটো মৌলিক রূপ বর্তমান ও তা চিরকালীন—এক, বস্তুগত দ্বান্দ্বিকতা (material dialectic) যা প্রকৃতিতে মানুষের অস্তিত্ব ও কার্য-পরম্পরা ব্যাখ্যা করে, দুই সামাজিক দ্বান্দ্বিকতা (social dialectic) যা মানুষকে সমাজের মধ্যে ক্রিয়াশীল রাখার কথা বিধৃত করে।

৩

বস্তুগত দ্বান্দ্বিকতায় দ্বন্দ্ব শব্দের ব্যাখ্যা দিলেন সার্ত : man is mediated by things to the extent that things are mediated by man, অর্থাৎ মানুষ acts upon and forms the world and the world in turn reacts back upon and forms man (মার্কসের কয়ারবাথ সংক্রান্ত থিসিসেও এটি পাই)। এর ফলে, সার্তর ধারণা, মানুষ বাস্তবতাকে অতিক্রম করবে (transcend অর্থে), সেই বস্তু-শৃঙ্খলা দিয়ে আরেকটা কাঠামো গড়বে, পুনরায় সেই কাঠামোকে একইভাবে অতিক্রম করে যাবে ও পর্যায়ক্রমিক এক সৃষ্টির উদ্ভাসনী প্রক্রিয়া অরুদ্ধ সচলতা লাভ করবে। এখানে, এই কথা উচ্চারণে, আমরা স্বাধীনতা মনোনয়ন সর্বোপরি গতিশীলতার ইতিহাসকে খুঁজে পাই—সার্তর এই মত। অতঃপর সার্ত আরেকটু এগোন, মানুষের চাহিদা কোথায়, প্রকৃতির চাহিদা কোথায়—সার্ত ছাখেন, মানুষের অস্তিত্ব তার প্রয়োজনে এবং প্রকৃতি তার অনিশ্চয়তায় (scarcity অর্থে)। মানুষ প্রথম তার প্রয়োজনকে অনুভব করে, সেই অনুভব থেকে অনিশ্চয়তাকে চিহ্নিত করে, একটা উদ্দেশ্যপূর্ণ কর্মোদ্যোগের আবহাওয়া গড়ে তোলে ; অর্থাৎ মানুষ নিজেই সেই ঐতিহাসিক চালক যার শক্তিতে প্রকৃতির সাথে তার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, এগিয়ে চলে ইতিহাস।

অতঃপর আরেকটু তীক্ষ্ণতা আসে সার্তে। মানুষের চাহিদা মানুষকে ইতিহাস গড়তে সাহায্য করছে ঠিকই, কিন্তু চাহিদা যে অসীম অথচ জৈবিক কারণে

(মানসিক ঋণময়তাতেও বটে) আমরা যথেষ্ট সীমায়িত। সবাই কি রবীন্দ্রনাথ বা আইনষ্টাইনের মতো ক্রিয়াশীল হতে চাই ? হতে পারি না—সেটা আলাদা দুর্বলতা অথবা মেধাহীনতা, কিন্তু হতে কি চাই ? এই না চাওয়াতে জোর দিলেন সার্ত—সীমিত আমাদের প্রক্ষোভে অসীম চাহিদা কিভাবে আশ্রয় নেবে, কিভাবেই বা praxis কার্যকর হবে, যেখানে praxis এর সামনে অসীম চাহিদা আর সীমিত এই আমি সেখানে বাস্তব প্রক্রিয়া কোন্ দিকে মোড় নেবে—জানতে চাইলেন সার্ত। মার্কসতত্ত্বের সাথে পৃথগন্নতার গুরুত্ব এখান থেকে। বাস্তব জীবন ও সাধারণের থিতু থাকার মানসিকতা বিশ্লেষণ করে সার্ত অনুমান করলেন যে অসীম চাহিদা যখন এক ব্যক্তিকে উন্মাদ করে তোলে তখন তার সামনে দুটো পথ খোলা থাকে, প্রথমটায় সে হ্যামলেট হয় (হয়েছিলেন যেমন শ্রদ্ধেয় মার্কস), দ্বিতীয়তে সে ভুলতে চায়। মেজরিটি এই ভুলে যাবার ছন্দে বিভোর হতে চায় এবং নিজেকে ভুলিয়ে রাখার একটাই কৌশল থাকে : বস্তুর মধ্যে স্বআরোপিত হওয়া (objectity himself in matter), ফলে স্ব-প্রস্তুত পণ্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলা, অবশেষে what the praxis of man has produced and unities hits back at him ; man is indead produced by his own product। এখান থেকে জন্ম নেয় কর্ম-অনুৎসাহ (practico-inertness), একবার নিজেকে পলায়নে সাহায্য করে অবশেষে নিষ্ক্রিয়তার দাসে নির্যাতীত হতে থাকে সে মানুষ। অনুল্লেখ মন্দ নয় practico-inertness কথাটা লুকাচও মানতেন, তাকে তিনি এনেছিলেন এঙ্গেলসের 'প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা' সূত্রের সন্দেহে ও সেখান থেকে মার্কসবাদকে সংযোজনের দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন লুকাচ, এখানে কিন্তু সার্ত মার্কসবাদের দিকে আর ফিরে যেতে চাইলেন না, বারো ঘর অথচ এক উঠোন অব্যাহত রইল।

এবার সার্ত দ্রুতগতিতে তাঁর অবশেসান সাথে নিয়ে বিকশিত করে তুললেন স্ব-মতধারা, আমরা দেখি, সার্ত সিদ্ধান্তে আসছেন যে শুরুতে মানুষ মুক্তই, মুক্ত-ভাবে সে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তার নির্দিষ্ট মত অনুযায়ী কাজে নামে, কিন্তু যেই সে তার মতকে দৃঢ় করে পথে নামে অমনি চলে আসে তার মতের প্রতি তার কঠোরতা—সে মত তাকে গিলে ফ্যালে ; অর্থাৎ শুরু হয়ে যায় স্বেচ্ছাহনন, তার আত্মানুগত্য অবশেষে পরাধীনতায় হয় পর্যবসিত। প্রায় একই সাথে দুটো ঘটনা ঘটে—সে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আবার এই বিচ্ছিন্নতার মাঝে তার মতে চলার অর্থ হল তাকে খয়াটে করে তোলা, আরো, অবশেষে।

প্রায় একইরকম বিচ্ছিন্নতার কথা মার্কস লিখেছেন, মার্কস দেখিয়েছিলেন সমাজ ও সামাজিক শোষণ মানুষকে আত্মবিচ্ছিন্নতায় অসুস্থ করছে, সেখানে মার্কস সমাজকে দায়ী করেছেন, দোষী করেছেন, এখানে সার্ত বলছেন সমাজ নয়, সে নিজেই তার বিচ্ছিন্নতার জন্মদাতা, সমাজ তো সেই করছে, তার বিচ্ছিন্ন প্রবাহেই সমাজ কাঠামো রচিত হচ্ছে অতএব মনে হচ্ছে সমাজ তার বিচ্ছিন্নতার জন্য দায়ী, যদিও গভীরে লুকিয়ে আছে অপরাধী সে নিজেই। সার্ত ও মার্কস সম্মিলনে এই সিদ্ধান্তে সম্ভবতঃ আমরা পৌঁছতে পারি।

আরো কয়েক কদম এগিয়ে যান সার্ত। আমার প্রত্যেক কর্ম (সার্ত এবার থেকে সাধারণী দৃষ্টি আরোপ করেন) শেষতঃ জন্ম দিচ্ছে নিঃশেষকে (finality is associated with counter finality)—$E=mc^2$ জন্ম দিচ্ছে হিরোসিমা নাগাসাকিকে, 'আদিতে বিশ্ব ছিল কর্মময়' জন্ম দিচ্ছে ভূপাল চের্ণোবিলকে, অবশেষে চের্ণোবিলের রশ্মিলাগা স্বাস্থ্যকরোজ্জ্বল গাভীন দুধ ঘি মাখন খাচ্ছি আমরা, খেতে বাধ্য হচ্ছি।

নির্নিমেষ ধিক্কার অথবা ছড়াকার শমীন্দ্র ভৌমিকের নির্লিপ্ত স্যাটায়ার :

তাই নাকি ?

আর কটা দিন যাক্-না তখন অ্যাটম বোমা চিবিয়ে খাব।

তাই নাকি ?

হতাশা বিক্ষোভে আবদ্ধ হন সার্ত, এ সিদ্ধান্ত এক অর্থে অমোঘ, আর যদি হয়ও, তাহলে সভ্যতা সংস্কৃতি মানবতা ধ্বংসের পথে, প্রকৃতিবিজ্ঞান যেমন বলে : all spontaneous process leads to the increase in entropy, তাহলে স্বাধীনতা প্রকৃত অর্থে কি ? স্বাধীনতা কি তাহলে এই অর্থসূচক যে পরাধীনতা অনুভবের নাম স্বাধীনতা ? আমরা পরাধীন এটা বুঝতেই স্বাধীনতা ?

সার্ত বোঝাতে চাইছেন মানুষের প্রথম কর্মমুহূর্তে মানুষকে বেড় দিয়ে থাকে তার অস্তিত্ব (existence), অস্তিত্বের দাবীদাওয়া। এই দাবী, প্রকৃতির কৃপণতা ও মানুষের আহার নিদ্রা মৈথুনের প্রতি গাঢ়তম আসক্তি—তাকে ক্রমে নিষ্ক্রিয় যান্ত্রিক করে তোলে। এর ফলে, একবার একটা কর্মচক্রে পাক খাবার 'পর সে কাজের ফল ও সে কাজের ধারা তার থেকে ক্রমশঃ দূরে চলে যায়, অন্য অর্থে, তাকে ঘুরিয়ে দেয় সেই কর্মচক্রে—পৃথিবী যেমন ঘুরছে নিজের কক্ষে, সূর্যের দৌরাত্ম্যে। এবার যদি সে আত্মসচেতন হয়, যদি সে বোঝে কলুর বলদী দশা, তাহলে কি সে মুক্তির পথে যাবে ? এই সচেতনতা কখনোই সিষ্টেমের নাগপাশ

ভাঙবে না, বরং দেখাতে চাইবে তার বীভৎসতা, নির্মমতা—সে দেখবে তার এতদিনকার অচেতন জোয়াল। সচেতনভাবে এবার সে অচেতন জোয়াল আরেকটু ঘনিষ্ঠে ঘাড়ে পেতে নেবে—তার স্বাধীনতা তার অধীনতাবোধ, বললেন সার্ত।

এই পর্বে সার্তর আবিষ্কার আরো যন্ত্রণাময়। ইতিহাস অধ্যয়ন করে সার্ত পাচ্ছেন ইতিহাস কিছু সভ্যসভ্যতা সৃষ্টি করার নামে প্রকৃতপক্ষে তৈরী করছে সুবিশাল অমানুষ (subhuman) বাহিনী—দাস ভূমিদাস শ্রমিক সর্বহারা ইত্যাদি। এই ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকে মার্কস তীক্ষ্ণভাষায় শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস বলে জ্ঞান করেছিলেন, সার্ত যাচ্ছেন অন্য অর্থে, সার্ত দেখাচ্ছেন অমানুষ তৈরীই হল ইতিহাসের ধারা, এখানে মানুষ তার মনুষ্যত্বে পরিচিত হচ্ছে না, তার কর্ম কর্মজাত পণ্য তাকে পরিচিত করছে, আমরা মানুষের বিকল্পে পাচ্ছি একগাদা মজুর মুচি তাঁতী। সার্তর মতে এ সম্ভবতঃ মানুষের নিকৃষ্টতম অসম্মান যেখানে পণ্য মানুষের পরিচয় দেয় (matter defines him), আর এটাই তৈরি করে মহাবিচ্ছিন্নতার পরিমণ্ডল যাতে মানুষ দ্বিবাস্তবী (double materiality) চক্রে বদ্ধ, তার অতীত তাকে বর্তমানে আনতে বাধ্য করছে, আবার বর্তমান তার ভবিষ্যৎকে অতীতের পথে চলতে বাধ্য করছে।

হয়ত দীর্ঘশ্বাস, হয়ত নাস্তিকতা, তবু কি বিশ্বাস জাগবে না, প্রশ্ন কি করব না : সমাধান কোন পথে ? সার্ত নিরুত্তর, সম্ভবতঃ গণতন্ত্র ও মানবিক একবদ্ধতায় তাঁর গভীর অবশেসানএ নিরুত্তরের দ্যোতক, তবু আমরা কি থামব—এতটা জেনেও ?

৪

দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় রূপ হিসেবে সার্ত এনেছেন সামাজিক দ্বান্দ্বিকতা—যেখানে মানুষ মানুষের সাথে ক্রিয়াবিক্রিয়া করে গড়ে তোলে সমাজব্যবস্থা, যেখানে দ্বান্দ্বিক মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত থাকে এক মানুষ অন্যের সাথে। আমাদের দ্বিতীয় যাত্রাবিন্দু শুরু হয় এইখান থেকে !

সমাজ সম্বন্ধে সার্তর ধারণাকে অনুপুঙ্খ বিচারে ফেললে মনে হয় সার্ত ফ্রয়েডীয় গ্রুপ মনস্তত্ত্বে বেশী আস্থাশীল, কিংবা আরেকটু পিছিয়ে, যার থেকে ফ্রয়েড গ্রুপ ধারণা এনেছেন সে লে বন (Le Bon)-এর মতধারার প্রাধান্য দেখি সার্তে। লে বন ও ফ্রয়েড গ্রুপ মানসিকতায় অচেতন ইচ্ছার স্পৃষ্টতা দেখেছিলেন, সার্ত দেখি প্রায় একই কথা বললেন : society is the unconscious grouping of individual। এর পর থেকে আর ফ্রয়েডে বাঁধা থাকেননি সার্ত (অবশ্য এমন

কথা বলতে চাইছি না যে ফ্রয়েড থেকেই সার্ত সমাজ ধারণা নিয়েছিলেন, ওটা শুধুমাত্র অনুমাননির্ভর)—অচেতন ইচ্ছার সংযোগে যে সমাজ কাঠামো সে কাঠামো নির্ঘাৎ নিষ্ক্রিয় অলস অজৈবিক এবং হতচ্ছাড়া, এখানে ব্যক্তিমানুষ একাধিক অপরের মধ্যে এক এক অপর (other among others), নিজস্বতা দাবী করার যৌক্তিকতা তাদের কারোরই নেই। এদিকে আবার, আমিই গড়ে তুলেছি সমাজ, সমাজ আমার শক্তিতেই শক্তিমান যদিও নিষ্ক্রিয় (powerful but inert) অথচ শক্তিশালী রকমের নিয়ন জেনন ক্রিপ্টনীয় নিষ্ক্রিয়তা তার সর্বাঙ্গে, অর্থাৎ আমার সাহস আমার শক্তিতে বলীয়ান এমন এক নিষ্ক্রিয় সমাজ গড়ছি যার নির্লিপ্ততা আমাকে অপর (other) করে তুলছে, আমি হয়ে পড়ছি প্রতারিত। সুতরাং মহাবিচ্ছিন্নতা, অতঃপর।

এই দুটো রূপ কার্যকর হলে (বাস্তব ক্ষেত্রে ধরা যাক) দ্বিমাত্রিক ধাক্কার মুখোমুখি হচ্ছি আমি'রা—প্রকৃতি থেকে, সমাজ থেকে—উজ্জ্বল উদ্ধার অনালোকিতই থাকছে, ফলতঃ।

এতৎ সিদ্ধান্তে জিজ্ঞাসু হলেন সার্ত। তাহলে সংগঠন করি কেন ? গ্রুপ করি কেন ? অন্তরের তীব্রতা নিয়ে এক হবার স্বপ্ন দেখি নিশ্চয়ই, তাকে অস্বীকার করা সম্ভব ? অস্বীকার করতে পারলেন না সার্ত, দেখালেন : কখনো মানুষ সক্রিয়তেজে সংগঠন গড়তে চায়, যে সংগঠনে একটা বৈপ্লবিক প্রাক্সিস থাকে, নাম যার একীকরণীয় সংগঠন (group in fusion), যাতে সংগঠন থাকে, মানুষের সচেতন ইচ্ছা থাকে, সংগঠন তার চিরচরায়িত খোলসে বদ্ধ থাকে না। হ'ল ঠিকই, কিন্তু এখানেও মানুষটি, আমাদের চিরপরিচিত ব্যক্তি মানুষটি তৃতীয় ব্যক্তি (third subject) হয়ে যায়—গ্রুপ আর প্রাক্টিকোইনার্টের মাঝে সে মানুষ হয় তৃতীয় ব্যক্তি, যার অমোঘ নিয়তি তাকে নিষ্ক্রিয়তার পানে ঠেলে ; পুনরায় সমস্যা সমস্যায়িত হয়ে ওঠে। তাকে স্রষ্টা হতে হচ্ছে, একজায়গায় থামলে তার চলছে না, অতএব তার চলা, অর্থাৎ তার গ্রুপের তখন দুটো দিগ্‌যাত্রা : হয় নীতি-নিগড়ে পুনঃপ্রবেশ, নয় একীকরণী সংগঠনে জোরবৃদ্ধি। প্রশ্ন হচ্ছে সে কোন দিকে যাবে ?

যদি ধরে নিই গ্রুপ একটা উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়াতে ব্যাপৃত থাকবে, তাহলে একীকরণী সংগঠন বাড়াতে হয়, অর্থাৎ একটা বৈপ্লবিক ইচ্ছার প্রয়োগীয় চর্চা করতে হয়। সেক্ষেত্রে বাইরে থেকে আঘাত আসা অকল্পনীয় তো নয়ই বরং খুবই বাস্তব। তখন গ্রুপের মধ্যেকার মানুষের সামনে দুটো পথ খোলা থাকে—এক হও

অথবা ধ্বংস হও, এখানে এসে পড়ে এক ধরনের বাধ্যতামূলক সংঘর্ষে যাবার নাছোড় কর্তব্য, যার সম্ভাব্য ফল : নিষ্ক্রিয় ধারাবাহিকতার পরিবর্তে প্রায় সমার্থক একটা বলশালী সংগঠন যেখানে ব্যক্তির অস্তিত্ব স্টালিনীয় পার্জে নির্বাসন অথবা মৃত্যুদণ্ডের অনুমতি লাভ করা ছাড়া গত্যন্তর পায় না।

বুঝতে পারি এখানে সার্ত স্টালিন সময়কার লৌহ আবরণ ও কমিউনিস্টদের মধ্যকার যুদ্ধকে দার্শনিক পরিমণ্ডলে আনতে সচেষ্ট হয়েছেন, নাহলে তিনি বলতে পারতেন না এ ধরনের ফিউশান গ্রুপের নীতি হল আগে শপথ পরে হিংসা (first oath and later terror)। সার্ত বলছেন প্রথমে শপথ তৃতীয় ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করে, সুগঠিত সেইসব শপথ ব্যক্তির সচেতনা বৈপ্লবিক স্বপ্নের জায়গায় আলোড়ন তোলে, মূলতঃ এইসব শপথ বহিঅপহ্নবের অপহ্নব রূপ নিয়ে ব্যক্তিকে কাছে টানে ; ব্যক্তিটি চ্যাখে বর্হিদুনিয়ার যাবতীয় ঋণবোধের প্রতি ঋণধর্মী তথা বৈপ্লবিক প্রয়াসে শপথটি সমৃদ্ধ। তখন ব্যক্তিটি সেই oath-এ' মাথা পাতে এবং স্বেচ্ছায় তার আত্মস্বাধীনতাকে খাটো করে যে সংগঠনের একজন হতে আগ্রহী হয় —প্রথমে এ অবদমন সে নিজের থেকেই করে, অর্থাৎ, আর কিছু নয়, নিশ্চলতা জীবন্ত রূপ নেয়, ক্রমে তা বাধ্যতামূলক রথের রশি গড়ে, পরিণামে তার সামনে দুটো পথ—বিদ্রোহী হও অথবা বশ্যতা মান, ফল একটাই—নিশ্চিহ্ন হও ; শুরু হয়ে যায় অন্ধকারের রাজত্ব।

আরেকটা পথ খোলা থাকে। না যদি হয় স্টালিনী দৌরাত্ম্য তবে হোক গর্বাচবী গ্লাসনস্ত, সমাজতান্ত্রিক ব্যুরোক্রাসী। এখানেই আমরা সার্তর বিশ্লেষণী প্রতিভাকে সম্মান জানাই। সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক পদ্ধতির 'পর নির্ভর করে তিনি দেখালেন সংগঠন যদি তার লৌহশাসনে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য দেয়ও, তাহলেও মানুষ মুক্ত হতে পারে না। কিভাবে ?

ধরে নিচ্ছি আমাদের গ্রুপ আজ সুস্থির, বর্হিআক্রমণে ততটা বিচলিত নয়, অতএব তার কঠোর শাসনব্যবস্থায় সে কিছু ছাড় দিতে পারে এবং দিচ্ছেও (উদাহরণে আজকের গর্বাচবী রাশিয়াকে ভাবা যাক)। প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে কি মানুষ তার মুক্তির দিকে এগোতে পারবে ?

সার্ত দেখাচ্ছেন সুস্থির গ্রুপ তার স্থিরতার জন্যই একটা সাংগঠনিক নিয়মকে মেনে চলতে বাধ্য, অর্থাৎ যেখানে কার্যকর থাকে কিছু নীতি কিংবা ক্রিয়াকর্মের কিছু স্থির ছক যাকে রূপায়িত করার দায়িত্ব সেখানকার ব্যক্তিমানুষদের। সেখানে প্রায় আনুগত্যের সাথেই সে ঐ নির্দিষ্ট ছকে গ্রুপস্থিরতাসূচক কাজ করে চলে,

অর্থাৎ ক্রিয়া ব্যক্তির উর্ধ্বে চলে যায় (function domonant and individual become unessential). যেহেতু ক্রিয়া হয়ে পড়ে অধিক প্রয়োজন তাই ক্রিয়া ক্রমে বিমূর্ততার রূপে বাসা বেঁধে ফেলে, সমাজ অতঃপর কয়েকটা জি. এন. পি., জি. ডি. পি'র গাণিতিক মডেলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, শুরু হয় বন্ধনহীন ব্যুরোক্রাসীর বাঁধন।

কথা সেই একই—এ বন্ধন কি অবিচল অনড় ? সার্ত ক্রিটিকে তার সদুত্তর দিতে পারেননি, তাঁর অবশেসনের জন্যই সম্ভবতঃ, তবে অন্য কোন সময় (দ্রঃ নাস্তিকতার দর্শন : পথিক বসু : **অন্বর্থ** : মার্চ ১৯৮৬) কিছুটা কাল্পনিক অথচ বৈপ্লবিক কথা বলতেন, বলতেন ইনষ্টিটিউশান-বাদকে ভেঙে ফেলতে হবে। ভাঙবে কে ? সার্ত নিজেই তো মানুষের স্বেচ্ছাশৃঙ্খলিত রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন, তাহলে ?

প্রশ্নটা আপাততঃ অনুত্তরেই থাক।

৫

মার্কসীয় মানবতা ও অস্তিতাবাদী মানবতার তুলনামূলক গবেষণা করেছেন অধ্যাপক উইল্ড, যে কটা পয়েন্টে আমরা (প্রথম চারটি পর্ব শেষ করে) একমত হতে পারি তারা যথাক্রমে :

এক. হেগেলীয় মূল্যবোধের সংযোজনী-মার্কেস দেখি মানুষ অন্তঃ ও বহির্দ্বান্দ্বিকতায় নিয়ত সংগ্রামে বর্হিদুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় এবং বলে এই জগৎ তার আত্মিকতাকে সমাজ অভিমুখে বিকশিত করে তুলবে ; অন্যদিকে অস্তিতাবাদ আত্মিকতায় প্রাধান্য দেয় এবং বলে এই অন্তঃই অপসারী হয় ও বাস্তবতার রূপ নেয়।

দুই. মার্কসবাদ (এই মার্কসবাদের সাথে মার্কস সৃষ্ট মতবাদের ফারাক আছে, Thesis on Fenerbach পড়লে বোঝা যাবে) মূলতঃ মনে করে মানব ইতিহাস অর্থনৈতিক ভূমণ্ডলে ব্যাখ্যাত সেখানে মানবচৈতন্য বা ইচ্ছার স্থান গৌণ ; অন্যদিকে অস্তিতাবাদ মানুষের সচেতন ক্রিয়াকলাপে আস্থাশীল হয় ও বলে এই সচেতন প্রবাহ সমাজ পরিবর্তন তথা অর্থনৈতিক পরিচালনে সক্রিয় অংশ নেয়।

তিন. বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনী ক্রিয়াশীলতায় আশ্বস্ত মার্কসবাদ ব্যক্তিচেতনাকে আমল দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না, সেখানে ধরে নেয়া হয় পার্টি মানসিকতা ব্যক্তি মানসিকতার বিপরীত তো নয়ই বরং ঐক্যকামী সমার্থক ; এদিকে অস্তিতাবাদ দেখে ব্যক্তিমানসিকতার প্রাধান্য—ব্যক্তি-

মানসিকতাই বিপ্লবের দিকে চলিষ্ণু মৌলিক ঋত্বিক, তাকে খাটো করার অর্থ হল বিপ্লবকে অচেতনী অন্ধ বিশ্বাসে নিমজ্জিত রাখা। উদাহরণে অস্তিতাবাদীরা সাম্প্রতিক ম্যানেজারিয়াল গ্রুপের কথা তোলে, তারা তথাকথিত বুর্জোয়া নয়, প্রলেতারিয়েতও নয়, অথচ আজকের পুঁজিবাদ তাদের ইচ্ছায় সচল এবং তারা, অস্তিতাবাদের মতে, প্রধানতঃ ব্যক্তিক।

চার. আজকের মার্কসতাত্ত্বিকেরা (ট্রটস্কাইট, নিউ লেফট রিভিউয়ের তাত্ত্বিকদের বলা হচ্ছে) সার্তর লাইনে আসেন, তাঁরা স্বীকার করেন সমাজে স্থিরতা আনলে হয় বুরোক্রাসী নাহয় অত্যাচার কায়েম হবে, বিকল্পে তাঁরা চলিষ্ণু সমাজ পরিবর্তনকে স্বাগত জানান, ইনষ্টিটিউশান ভাঙার কথা ভাবেন ; কিন্তু অস্তিতাবাদীরা কাসফার নৈরাশ্যে থাকতে চান, তাঁদের চোখে সমাজ যত চলিষ্ণু হবে অরাজকতা তত বাড়বে এবং অরাজকতা ও নৈরাশ্যই একমাত্র বাস্তব—তা থেকে নিস্তার পাবার কোনই পথ নেই।

পাঁচ. স্বাধীনতা প্রসঙ্গে মার্কসবাদীরা (অন্ততঃ মার্কস নন) মনে করেন বহিঃবিপত্তির নির্বাসন অথবা বহিঃ কিছুকে অন্তঃ উপনীত করা ; এতে তাঁরা অনেকটাই হেগেলের কাছাকাছি, হেগেল বলতেন প্রয়োজনকে উপলব্ধি করার নামই হল স্বাধীনতা, এই প্রয়োজন ভিতরের চাইতে ঢের বেশী নির্ভরশীল বাইরের ওপর—এরকম একটা সংযোজন ছিল মার্কসবাদীদের আর সেটা চর্চার নাম ছিল স্বাধীনতা। অন্যদিকে প্রখ্যাত মার্কসতাত্ত্বিক যুগোশ্লাভ লেখক পেত্রোভিক (এরিখ ফ্রম সম্পাদিত Socialist Humanism বইতে তিনি এই মত রেখেছিলেন) মার্কসবাদের এ ভিশানে আকৃষ্ট নন। তাঁর মতে : স্বাধীনতা একেবারেই নিজস্ব, আত্মার আত্মীয় গোছের, মূলতঃ স্বাধীনতা স্ব-নির্ধারিত সৃষ্টি, যে সৃষ্টি মানুষের অতএব তার মনুষ্যত্ব তথা মানবতার মূল্যবৃদ্ধিকর। এখানে, যদি এ মতবাদকে একেবারে হালফিল মার্কসতত্ত্বের সংযোজন হিসেবে মেনে নেয়া হয়, তাহলে অস্তিতাবাদীদের সাথে মার্কসতাত্ত্বিকদের (মার্কসবাদী ও মার্কসতাত্ত্বিকদের মধ্যে একটা গুণগত প্রভেদ টেনেছি : মার্কসবাদ বলতে আমি সোভিয়েত সংশোধনবাদকে বোঝাতে চাইছি, মার্কসতত্ত্ব বলতে আমি সোভিয়েত বিরোধী ও মার্কসনির্ভর মতবাদকে বোঝাতে চাইছি) গুণগত কোন অসহজতা চোখে আসে না, কারণ অস্তিতাবাদ মানুষের ফ্রাজাইলিটির সবটাই মেনে প্রায় এই কথাটার বলার চেষ্টা করে। যদিও একটা প্রশ্ন থেকে যায়, যেটা এই ছকে কার্যতঃ অনুচ্চারিত। প্রশ্নটা হল : অবাধ আত্মিক সৃষ্টিধর্মীতা উন্মোচনের অবসরে মানুষ যদি মনুষ্যত্বের সাথে সাথে জান্তব

যথোচিত বৃত্তিদের প্রকাশ করে ফেলে ? ভাবনা অস্বাভাবিক অথবা অবৈজ্ঞানিক নয় কারণ আমরা মানুষ আবার প্রাণীও, আমাদের অতি অস্তিত্ব প্রাণীত্বের স্তরে লম্বমান, তাই আমরা সার্তীয় নড়বড়ে ফ্রয়েডীয় নিউরোটিক—সেটার কি হবে ?

এ প্রশ্ন আপাততঃ প্রশ্ন হয়ে থাকুক, পাঠকের সচেতনে ঘুরপাক খাক কারণ এখান থেকে অহ্নবী প্রতিভায় আমরা মার্কসকে পেয়েছি (মার্কস বলতেন nothing human is alien to me), এখানকার অনড় সমর্থনে আমরা কাফকাদের পেয়েছি (কাফকার কাছে জগৎ ছিল nightmare of nothingness) —অতএব এ সমস্যার আরো সুপরিসরী বিতর্ক-মূল্যায়ন কোন্ পথে সেটা পাঠকের মননে আপাততঃ উত্তাপ সৃষ্টি করতে থাকুক, আমরা সমাপ্তিতে যাই।

মনে হতে পারে, মনে হয়ও যে সার্ত প্রায় অপ্রতিরোধ্য একটা অসহায়তার ছবি এঁকেছেন, তার সাথে যদি রুশ সমাজতান্ত্রিক রীতিনীতিকে মিশোই (যাকে চীন নাম দিয়েছিল social capitalism) তাহলে মোটামুটি একটা নৈরাশ্য পাই —মার্কস যেখানে সর্বহারা বিপ্লবে মানবমুক্তির কথা বলেছিলেন সেখানে, সেই সর্বহারা বিপ্লবই, যখন শোষণের অবসান অর্থে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে মাত্র নজর রাখে (যেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা কদাচ উপস্থিত হয়), তখন সার্তর মানব ভঙ্গুরতাকে গবেষণায় আনা উচিত হয়ে পড়ে। সমালোচনা একটাই : নৈরাশ্য থেকে আশার আলো অবশ্যই আছে, তাকে সার্ত আনতে পারেননি, না পারার স্পৃহা এসেছে অস্তিতাবাদের প্রতি নির্ভরতার ফলে ; আমাদের শুরু সেখান থেকে হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ মানুষের অস্তিত্বের ভীষণ অস্তিত্বকে স্বীকার করেছিলেন সার্ত, সেই অস্তিত্বকে গবেষণায় আনেননি মার্কস। মার্কস মানুষ সম্বন্ধে, অথবা বলি, মানুষের সাবজেকটিভ দিক সম্বন্ধে নির্ভরশীল ছিলেন হেগেলের ওপর, কারণ হেগেলই সর্বপ্রথম তৎপ্রচলিত কাটিয় মানুষকে পরাধীন বলার সাহস রেখেছিলেন এবং স্বরচিত ভাববাদী ভাষায় ডায়ালেকটিক্যাল মানুষকে দর্শনে পরিচিত করেছিলেন, সেখানে মার্কস হেগেলের ভাববাদকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, এনেছিলেন সমাজ-অর্থনীতি, কিন্তু হেগেলীয় মানুষের সত্তাকে (essence) অস্বীকার করেননি, মানুষ ছিল মানবিক। যদিও কার্যক্ষেত্রে মার্কস বহু অমানবিক পাশবিক বৃত্তিময় মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন, পেয়েছিলেন ভস্ট প্রমুখদের—এইসব ব্যক্তিমানুষকে যদি তিনি দর্শনে আনতে চাইতেন, যদি বুঝতে চাইতেন মানুষের নৃশংস হবার সামাজিক কারণের সাথে ব্যক্তিক কিছু কারণও আছে—তাহলে ব্যক্তিমানুষের ফ্রাজাইলিটি

তাঁর নজরে আসত, অথবা আগে যা বলেছি, মানুষের অস্তিত্বের ভীষণ অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে পারতেন, যেটা হয়নি হেগেলীয় বিশ্বজনীনতার প্রভাবে—এটা জানতে পারছি, আবার সার্তে দেখি মানুষ ভঙ্গুর এবং এটাই শেষ কথা—অর্থাৎ সার্ত কিরকেগোর ছাড়তে নারাজ, অথচ সামনে জলন্ত মার্কসবাদ, না যদি হয় রুশ মতবাদ মার্কসের মতবাদ তো ছিলই, সার্ত অথচ আসতে পারলেন না। কিন্তু স্ববিরোধ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করে তুললেন (তাঁর 'শেষ সংলাপ' এই অস্পষ্টতার অসাধারণ দলিল), বলতেন ইনষ্টিটিউশান ভাঙতে হবে, তার মানে নিশ্চয়ই কেউ ভাঙবে, কিন্তু সে কে—সার্তর মানুষ নিশ্চয় নয় কারণ সে সর্বতোভঙ্গুর স্বভাবের, অথচ ভাঙতে হবে, সেটা সার্ত-মনোভাব, অর্থাৎ মানুষ যদি সার্ত কি মার্কস হয় তাহলে ভাঙচুর সম্ভব, অর্থাৎ মানুষ ব্যক্তিত্বে পজেটিভ অবশ্যই, অর্থাৎ সার্তীয় স্বাধীনতা মানে পরাধীনতা অনুধ্যানই শেষ কথা নয় (সার্ত নিজে যখন ইনষ্টিটিউশান ভাঙার কথা বলছেন তখন তিনি নিশ্চয় 'পরাধীন' নন), স্বাধীনতার আলাদা অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে যেহেতু মার্কস আছেন সার্ত আছেন···দুষ্টচক্রে বাঁধা পড়ি, বন্ধনমুক্ত হবার প্রয়াসে একটু স্বপ্নাচারী হই, কিংবা বলি, একটু অন্যরকম ভাবি : সার্ত যদি ভাবতে পারতেন—সবাই হিটলার নয় মার্কসও কেউ কেউ হন, এবং সবাই হিটলার হবে, এই প্রকল্প পরিত্যাগ করে যদি কেউ কেউ মার্কস হবে, এই প্রকল্পের কার্যকারণ খুঁজে বার করতেন (কাজটা তাঁর বুদ্ধিতে কঠিন ছিল না, তিনি মার্কস জানতেন ফ্রয়েড জানতেন, জানতেন কাণ্ট হেগেল হাইডেগার) তাহলে স্ববিরোধ থেকে মুক্তি পেতেন, আমরাও নতুন দিশা পেতে পারতাম।

সেটা হয়নি, হওয়া উচিত, প্রয়োজনও স্পষ্ট। নতুন কথার জন্ম, তাই, অনিবার্য, নতুনত্ব সত্ত্বেও।

সাধন মার্গ

রাধাপ্রসাদ ঘোষাল

হাতে দোতারা, প্রেমদাসী গিয়ে বসল বকুলগাছের ছায়ায়। নবীনদাসের হাতে ডুবকি।

মন কারে কয় প্রাণ কারে কয় কহরে কৃষ্ণপ্রিয়া, সেই প্রাণের লেগে আজ যে গো হায় কান্দে আমার হিয়া। আহা—। প্রেমদাসীর বাঁকা ঠোঁটে মোহন হাসি। কিছু বা দেমাক। কিন্তু কিসের দেমাক ভেবে পেল না নবীনদাস। শুধু তাকিয়ে মনপ্রাণ এক করে সুর শুনছিল সে। এই সুর জিনিসটি যে কি বস্তু! কিছুতেই ধরা দেয় না। ধরতে গেলেই অধরা—শিকল কেটে পোষা পাখির মত পালিয়ে যায়, তখন শূন্য খাঁচা।

কচি মুখ, গৌর বরণ, অল্প কয়েকটি রোম উঠেছে নবীনদাসের চিবুকে। তারই মধ্যে আনারস পাতার মত তার ধারাল নাকে এসে এই শেষ শীতেও ঘাম জেগে উঠেছে। ডুবকিতে মৃদু চাপ দিল নবীনদাস, গুব গুব করে শব্দ এলো সেই প্রাণের তারটি থেকে। এতক্ষণ পরে সে যেন একটি আসল তাল খুঁজে পেল। বেতাল মনটির তার বেজে উঠল সপ্তমে। এবার আর কোনো নষ্ট সুরে নয়। চোখ বন্ধ করল নবীনদাস, বুকের ভেতর যেন একটা আলো দেখতে পেল।

গান থামিয়ে প্রেমদাসী বলল, কিহে গোঁসাই। একেবারে মশগুল যে। এই পৃথিবীর বাইরে চলে গেছ বুঝি—

লালচে লাজের ছোপ পড়ে নবীনদাসের মুখেচোখে। শিবনেত্রে যেন অন্ধ হয়েছিল। এইবার চোখ খুলে দেখল প্রেমদাসীর দিকে। অল্প বয়সের যে যাদুটি চোখে চোখে চমকায় সেই যাদুতে নবীনদাস কানা। মুখ খুলে বলল, তোমার গানটি তো বেশ। কোন বাউলের কথা—

হাত থেকে একতারা মাটিতে নামিয়ে রাখে প্রেমদাসী। বেলা বেড়েছে, কিন্তু রোদে কোন জ্বালা নেই। শুধু শীতের মায়া। বাতাসের কি খেয়াল কে জানে, এলোপাতাড়ি ছুটে বেড়ায়। পিঠে সাদা থানটি তার বৈধব্যের ঘোষণা করে বুঝি। হাওয়ায় উড়ে যেতে চায় তার সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা। পান খাওয়া রঙিন দাঁত তার,

বিকশিত হ'লে জীবনের প্রতি বুঝি আসক্তি ধরা পড়ে। প্রেমদাসী বলল, কার আবার—নিজের কথা, পরাণের কথা—

বীরভূম বোলপুরের লাল কাঁকুরে মাটির মত প্রেমদাসীর দাঁতের রঙ। সবুজ পান খেয়ে খেয়ে দাঁত পেয়েছে রক্তের রঙ। নবীনদাস মুগ্ধ চোখে তাকিয়েছিল, সে মুগ্ধতা কি প্রেমদাসীর ভরা চেহারা তুক করেছে নাকি গলার স্বরে বিদ্ধ হয়েছে নবীনদাস। প্রেমদাসী তাকিয়ে দেখছিল ঘুরে—দুটি ছাগলের ছা খুনসুটি করছে কেমন। নবীনদাস বলল, গানের গলাটি তোমার বড় মিষ্টি লাগে গো। এ বুঝি সাধন যোগন, কোন্ মার্গের লোক গো তুমি—

মুখে জর্দা গুঁজে দিয়ে প্রেমদাসী বলল, সাধন যোগন সে তো আছেই। তবে মনুষ্যের সে তো একটাই মার্গ। শরীরমার্গ।

শরীরের জন্যই সব ?

তা না হ'লে আর কি বল। মন মান গান সবই এই শরীরে ধারণের গো। গাইতে গেলাম আমেরিকা, জার্মান। তারা বলল, নেচে নেচে গাও। এই তো বয়স, নাচের সেই বহর আর কি আছে। এখন আর বাউল বাউল নাই হে গোঁসাই। ইংরাজি আর হিন্দি গানের প্যারোডি চায় লোকে। মিশেল এই বাউল গানেই তো পয়সা। যার নাই টাকা, জেবনটাই তার কাছে ফাঁকা গো গোঁসাই, বয়স থাকতে বুঝে লাও—

কি বুঝব—

মাঠে মাঠে গাঁয়ে গেরামে ঘুরে বেড়ানোর বাউল আজ আর নাই গো। তার চে এসো আমার দলে। আখড়ায় আখড়ায় তুমি ডুবকি বাজাবে। আমি শুনেছি গলাটিও তোমার দরাজ। আসরে নাচ দেখালে দেখাবে ভালো। টাকাই হল গে জেবন। এসো আমার কাছে এসো, দেখবে নাম পাবে—রেডিওতে গাইবে। কলকাতার ডাকে আসরে যাবে। পাঁচজনে মানবে বাউল বলে—

তার মানে তুমি হলে গে মালকিন, বাউল—একি ব্যবসা নাকি গো। গান তো হল গিয়ে প্রাণের কথা, প্রাণ কি হাটে মাঠে বিকোয় নাকি গো গানের গুরু—

অল্প চাপা প্রেমদাসীর নাক। তারই দুই পাশ বেয়ে গণ্ডদেশ থেকে নেমে এসেছে মহাজীবনের দাগ। হাসলে পরে সে দাগ আরো জীবন্ত লাগে। কত মাস, কাল, বছর কেটে গেছে এই একটি জীবনের ওপর দিয়ে। গান কি তবু থেমেছে ! সে যে থামার সঙ্গ লয় গো। যন্ত্রী বাজায় যন্ত্র। মেয়েমানুষের ভেতরটি শুধু বাজে।

গান বিনা সুখ নাই, যত বাঁচবে তত গাইবে। প্রেমদাসীর ভরা রূপে যে ভাঁটা এসেছে গো। কে তাকে দেখবে—

পোষ মেলা ফুরিয়ে গেল কদিন আগে। আগের মত আর এই মেলাটিও তেমন ভাবে জমে না। এক মেলায় বহরমপুরের মুসলমান দরবেশের সঙ্গে দেখা—তার সেই গান, আয়রে চিঠি লিখি ব্যথার কাজলে। কি সে কুসঙ্গ ধরল কে জানে, সে কাল সঙ্গ। জীবনে ভঙ্গ দিল প্রেমদাসী। ভরা শরীরে দাগ পড়ল তার। নবীনদাসের কথার কোন উত্তর দেয়নি প্রেমদাসী। কি জবাব দেবে। কচি বয়সের একটা ঘোর থাকে, ভাবের বেলায় আনন্দ কোথায় আছে সে অখণ্ড জিনিসটি। বয়স বাড়লে ভেতরের চোখ দুটি তখন ফোটে। এ বালক, একে কি করে বোঝাবে প্রেমদাসী, মায়াময় নয়, সে তো মিথ্যে মহামিথ্যে—জগত আসলে রহস্যময়। আর সে রহস্যের চাবিকাঠি হ'ল স্বার্থ। নিজেরটাই তো বড় কথা হে গোঁসাই। নিজের কবে বুঝবে। আপনি বাঁচলে জগৎ বাঁচে। এসো, গান শেখ, খাও দাও ঘুমাও। এসো আমার সঙ্গে এসো।

আমার একা একাই ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে। একলাটি—

তবে ভজন তোমার, ভজবে কাকে নিয়ে। নর আর নারী—সেই তো বলেছে নরনারী—স্বজনে স্বজন ভজবে ভজন নামবে রস যোজন যোজন—

এই বলে প্রেমদাসী হাতে একতারা পায়ে ঘুঙুর আর গলায় ভবভুবনের গান নিয়ে যেন জেগে উঠল,—খেজুর গাছে হাঁড়ি বাঁধো মন

নইলে রস গড়িয়ে গা ভিজিয়ে
পা পিছলে ওগো, মরণ,
হায় মরণ—

চকিতে কোন আভাস না দিয়েই গানে ছেদ দিল প্রেমদাসী। তারপর খিলখিল করে হেসে উঠল। ভরন্ত শরীরের যে মায়া, কোথাও তার কোন নিদেন নেই। উঁচু বুক দুটিতে জনম জনম আকাঙ্ক্ষা। দেখে বোঝার উপায় নেই সে আশ তার মিটেছে নাকি হারিয়ে গেছে বসতবাটি গ্রাম গোলটিয়ায়। অজয়ের কূলে কূলে বান জাগে বর্ষায়, আর নারী শরীরে বাড়ে টান। সেই প্রেমদাসী, বেধবা বাউলানি আবার হেসে উঠল যেন অনেকদিন পরে। নবীনদাস বলল, তোমার সঙে কি যাব গো—

কেন, ভয় করে বুঝি—

গান জানি না, মান জানি না। ময়ূরাক্ষীর পাড়ে বাস—ভুবনডাঙার পার। কি

যাব আমি। না জানলাম সহবৎ—মন বলল বাউল হও। হলাম। বাউলের কোন জাত নাই। সব মানুষের মত আরেক মানুষ। বাবা হারালাম, মা হারালাম। নিজেও তাই হারিয়ে যাব—এই খেয়ালে। গাইব গান ভরবে মন—এই আর কি? সাধন সাঙাৎ সে তো কম কথা লয়, কি আছে আমার বলো। চলো আমি শিখব গান।

সেই ছিল পরিচয়ের সূত্র। তারপর কেটে গেছে ক'বছর। গান শিখেছে নবীনদাস। অজয়ের কূলে গোলটিয়া গাঁয়ে বেজেছে পায়ের ঘুঙুর। প্রেমদাসী শুধু তাকিয়ে দেখেছে বিস্ময়ে। কিভাবে পুরুষ বাড়ে। ভাঙা গাল দুটিতে মাস লাগল কবে।

জনছাড়া বেধবা মেয়েমানুষ, কবে ঠাণ্ডা যেন বুকের ভেতরের ধুক-পুকানির ভেতর দিয়ে একটা গাঁয়ের রাস্তা দেখেছে। সেটা আর কিছুই নয়, একটা ঘরের ছবি। এখনো যৌবন তার যায়নি। শুধু একটু ঢলেছে।

ভাবের হাটে একদিন কেন্দুলি এলো দু'জনায়। নবীনদাস অজয়ের জলের দিকে তাকিয়ে দূর দেখল। সবকিছু কেমন সুদূর।

প্রেমদাসী বলল, কি দ্যাখো গো গোঁসাই—

ওই দ্যাখো মাঠের ভেতর রাস্তা। আমার মন যে কেমন করে—

কেমন—

ভালো লাগছে। কেমন করে সে কথা বলব, কেমনে—

ভালো লাগার জন করে লও আমাকে। দেখবে কথা সব গলগল করে বেরচ্ছে। আমি ভেবেছি—বলব?

কি বলবে—

তোমার জন্য একদিন খুব কাঁদব গো গোঁসাই—

হাসির একটি সুর থাকে। বহুকালের অবহেলায় পড়ে থাকা তানপুরার তারে জমে থাকা ধুলোয় হাওয়া লাগলে যেমন ধুলো ঝরে যায় আর আনন্দে বাজে যন্ত্রটি, তেমনি। নবীনদাস অবাক চোখে তাকাল। আজ আর তার হাতে ডুবকি নেই। তবে বুকের ভেতর কি যেন গুব গুব করে বেজে উঠল, জয়দেবের সেই কদম-খণ্ডীর ঘাট। জলের দিকে তাকিয়ে ছিল নবীনদাস। চোখ তুলে জীবন্ত মেয়ে-মানুষটার দিকে তাকাল। বাউলের একতারার দুই বাঁশের ডাঁটির মত দুই কণ্ঠি হার প্রেমদাসীর গলার নিচে। আর চোখে তার জলের ফোঁটা চিকচিকায়। চোখের পাতা কাঁপে। ঠোঁটের রস শুকিয়ে যায়।

নবীনদাস বলল, কাঁদছ কেন—

কই—? বিষের জ্বালা গহীন জ্বালায় গো গোঁসাই। তাকে নেভাই কিসে বলো দেখি—

তবে যে সেদিন বললে, টাকাটাই জেবন। আজ রাতের আখড়ায় আমি তো খুব গাইব গো। নাম যদি পাই সে তো তোমারই। আর লোক দুষলে আবার কাঁদবে নাকি? বলো না, আবার কাঁদবে—? কত ধারণা ছিল আমার। বাউল মানে ভিক্ষা করে খায়। তুমি ভেঙেছ। জানলায় লেগেছে হাওয়া গো—কলকাতা দেখাবে আমাকে, বুঝি নাম হবে—পূর্ণদাস, পবনদাস। আচ্ছা গাইব আজ।

প্রেমদাসী তাকিয়ে দেখল পাথর খণ্ডের মত ছাতি নবীনদাসের। কথাগুলি সেই গুপ্ত গুহা থেকে শ্লোকের মত বেরয়। প্রেমদাসী বলল, আমি পারিনি গো গোঁসাই। মেয়েমানুষের অনেক বাধা। তোমার গানের ক্যাসেট হবে, রেকর্ড হবে। বাজবে এই দেশটার গাঁয়ে-গঞ্জে। টেলিভিশনে ছবি। তোমাকে কলকাতা যেতেই হবে গো গোঁসাই—

রাত্রে কেঁদুলিতে জমে উঠল রাত আখড়াটি। বাউল মেলায় হরেক বাউল। গাইবে গান, মাধুকরীর পয়সায় তাদের জীবন চলে। গাইল অঘোরদাস, ফুলবালা দাসী। তারা গাইল—

আঁখ বলে চাবালম বাঁশ
বাঁশের নাইকো কোন রস
কেবল শুধু গালের সর্বনাশ
রসগোল্লার স্বাদ কি পাবি
চিটাগুড়ে হায়
ও আঁখ বলে চাবালম আমি…

নবীনদাস তাকিয়ে হাঁ করে শুনছে। পাশে বসেছে প্রেমদাসী। বাউলরা সব এসেছেন গো। এসেছেন বাঁকুড়ার সোনামুখি বর্ধমানের আউস গাঁ থেকে। লক্ষ্মী-নারায়ণ বাউল এয়েছেন নদীয়ার শান্তিপুর থেকে। তার সঙ্গে এবার একটি কচি বাউলানি। কালো কালিন্দীর মত তার চোখের ছটা। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থেকে এসেছে দরবেশী বাউল অভয়ানন্দ। লোকটা মুছলমান, আদিতে নাম ছিল আনোয়ার আলি। চুল পেকেছে, চামড়া ঝুলেছে তার, প্রেমদাসীর দিকে তাকিয়ে ভানের হাসি হাসল। কেমন আছ গো গানের রানী—

হাসি এলো বটে, কিন্তু মুখটা একটু সাদা হ'ল প্রেমদাসীর। এই লোকটারই

তো সাঙাৎ ছিল মুহুরুর। প্রেমদাসীর পিরিতের লোক। লোকটা মরল। লোকে বলল, প্রেমদাসী বিধবা হয়ে গেল। ভেতরটা হাসিতে দুলকে উঠল প্রেমদাসীর। বলল, ভালো। ভাল আছি গো ভালমানুষ। তা কি গাইবে—

গলা কি আর আছে। ভেঙে তছনছ হয়ে গেল যে—

অ। তাই নাকি—

এই বলে প্রেমদাসী আবার আসরের দিকে তাকাল। এসেছে চব্বিশ পরগণা থেকে কৃষ্ণচরণ। ডিস্কো গানের মত তার বাউল গান। আসর মেতেছে বটে। আচ্ছা গায়েন। আচ্ছা হে—। ঘুঙুরের ঘুংঘুট আর গানের বোল—

ও—হো—হো
মেয়ে হল ভাই পুরুষ মারার কল

আনমনে চোখদুটি নবীনদাসের চলে গিয়েছিল সেই কদমখণ্ডীর ঘাটে। আকাশ থেকে ভগবানের আলোটি এসে নেমেছে ঘাটে। লোকে বলে এই ঘাটেই নাকি অসুস্থ জয়দেবকে ছুঁয়েছিলেন দেবী গঙ্গা। সেদিন ছিল এমনি একদিন। মকর সংক্রান্তির যোগ। এই দিনটিতে এখনো নাকি মা এসে কদমখণ্ডীর স্রোতে গা এলিয়ে শুয়ে থাকেন। এই ঘাটেই জয়দেব কুড়িয়ে পেয়েছিলেন রাধাবিনোদের মুকুটটি। কোথায় গেল, কোথায় গেল সেই সব দিন। সেই সব মানুষেরা।

প্রেমদাসী আস্তে করে হাতের চাপ দিল হাঁটুর ওপর, কি গো গোঁসাই। ভাবে যে একেবারে বিভোর। এবার তো উঠতে হবে আসরে। আজ দু'জনের তর্জা। হারাও তো দেখি আমাকে—

পায়ে ঘুঙুর, হাতে একতারা, প্রেমদাসী ধরল গান—

ও আমার ময়না পাখিরে—
আমার মন লইয়া পলাইয়া গেল
সোনার ময়না পাখিরে, ওরে প্রাণপাখি—
জন্মের মত আমায় দিয়া ফাঁকি—
বহু যত্ন করে পুষলাম তোরে পাখি ঘৃতমধু দিয়া
ওরে যাইবার কালে গেল চলে আমার
বুকে ছোবল দিয়া—
ওরে কেমনে এ প্রাণ রাখি।

নবীনদাস চোখ তন্ময় করে শুনছে। বাউলকলার মর্মকথা। যাতনার ইতি-

কথাটি—যাকে বাসলি ভালো সে দিল দাগ। খেয়ে বিষ, মন কেন মজলি মরণে।

একদিকে প্রেমদাসী অন্যদিকে নবীনদাস। ভরাট গলায় ধরল সে—

সময় বুঝে বাঁধাল বাঁধলে না—
জল শুকালে মীন পালাবে পস্তাবিরে মন-কানা।
তিরপিনির তীর ধারে
মীন রূপে সাঁই বিহার করে
তুমি ওপর ওপর বেড়াও ঘুরে
সে গভীরে ডুবলে না—

পাল্টা দিল প্রেমদাসী। সবাই তাকিয়ে নবীনদাসের দিকে। উপস্থিত বাউলরা সব বলে ওঠে, সাধু! সাধু! প্রেমদাসী তীব্র চোখে গায়—

আমার যেমন বেণী তেমনি রবে
চুল ভিজাব না
চুল ভিজাব না গো, আমার বেণী ভিজাব না।
জলে নামব, জল ছড়াব তবু জল তো ছোঁব না
এধারি ওধারি সাঁতার কাটি করি আনাগোনা।
আমি ভোগ লাগাব, ভোগে মরব না—

পায়ের ঘুঙুর থামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল নবীনদাস। সহর থেকে দেখতে আসা লোকেরা টেপ-রেকর্ডার ফিট করে গান তুলছে। রিপোর্টারদের ক্যামেরা দিচ্ছে ফ্ল্যাশ। হাতের দুবকি নামিয়ে রাখল নবীনদাস। গান থামিয়ে প্রেমদাসী স্থির। তার চোখের দিকে তাকিয়ে ধীর উদাত্ত গলায় নবীনদাস ধরল তার গান—

কে ডাকে, কে ডাকে গো হায়
সেই ঘরের অন্বেষণ,
ডাকে কেবা জন
ঘরের ভেতর আছে মানুষ কটি প্রাণ
আছে ঘরে পাক পাটাতন,
আত্মা পঞ্চজন।
সেই আত্মায় দিয়া করি আজ হে
আত্মার ভজন।

প্রেমদাসী স্থির, নির্বাক, চলৎশক্তিরহিত। গাইছে নবীনদাস—অনামী, অচেনা এক নাবালক বাউল। যার চোখ তেষ্টায় ফেটে পড়ে। যেন জল নামছে অঝোরে।

কি গাইছে, কি গাইছে নবীনদাস। এ গান সে কোথায় পেল। ক্ষতবিক্ষত যৌবন আজ মেয়েমানুষের বুকের ভেতর চমকে চমকে ওঠে। এ যে সব জানে, সব পারে গো অন্তর্যামী।

প্রেমদাসী দেখল নবীনদাস আসর থেকে নামতে নামতেই সবাই ভিড় করেছে তাকে ঘিরে। ঠিকানা চাইছে। নবীনদাস ফিরে এলো প্রেমদাসীর কাছে, চেয়ে হাসল। তারপর গেল বড় বাউলদের ডাকে। কলকাতার ফাঙ্‌শানে যাওয়ার ডাক এলো তার। লোকে এসে প্রেমদাসীর কাছে নগদ টাকার বায়না করে গেল।

আসলে জীবন যখন বাড়ে তখন এমনি হয়, লাউডগার মত হু হু করে বেড়ে যায়। কবে কবেই যে বছর ঘুরে গেল প্রেমদাসী তা খেয়ালে রাখতে পারে না। রেডিওতে গান বাজল, চিবুকের হালকা দাড়ির বন ঘন হল নবীনদাসের। গোলটিয়ায় শিমুল গাছের মাথায় লাল হয়েছে আগুন, এক বসন্তে। প্রেমদাসী একা একাই গিয়ে গাছের তলায় দাঁড়াল। নবীনদাস আজই সকালে গেছে আসানসোল। টাকা-পয়সা সবকিছুই এখন স্বচ্ছল। প্রেমদাসীর শুধু মনে হয় মানুষটা কেমন যেন একটু বদলে গেছে। তা বদলাক। বয়সে পুরুষ পাল্টায়। এটা ভালো লক্ষণ বলতে হবে। কিন্তু যা পাওয়ার আশা ছিল তা তো এখনো পাওয়া হল না প্রেমদাসীর।

কি আশা করেছে, কি আশা করেছে প্রেমদাসী, পোড়াকপালি। আশার কি আর মানুষের শেষ আছে গো। রইবে যার আশে সে আসবে সর্বনাশে। কে আসবে, কে বয়ে আনবে প্রেমদাসীর জীবনের সর্বনাশটি।

গাছ থেকে আগুনের একটি ফুল্‌কি খসে পড়ল প্রেমদাসীর গায়ে। জলল না, ফোস্‌কা পড়ল না কোথাও। প্রেমদাসী তাকিয়ে দেখল আগুনের ফুল্‌কি নয়, গাছের ফুল। সময়ে ঝরেছে। নামছে সন্ধ্যা। নবীনদাসের এই এত নাম—প্রেমদাসী কি খুশি হয়েছে?

গভীর রাতে ঘরে ফিরল নবীনদাস। বাউলের যে বস্ত্র গেরুয়া, কৌপিন তাই পরেছে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ—

কি হলো গো গোঁসাই। কি হ'ল তোমার মাথায়—কে করল এমন সর্বনাশ।

নবীনদাস কোন জবাব দিল না। ককিয়ে কেঁদে উঠল প্রেমদাসী। সে আদরে, উত্তেজনায় না ভালোবাসায়—সে-ই জানে। ক'জন বাউল এসেছে নবীনদাসের সনে। তারা বলল, দোষ দুজনারই।

কেন, কি হল আবার—

ফাঙশানে রেট নিয়ে কথা কাটাকাটি। হাওড়ার মুগকল্যাণ থেকে এসেছিল বাউল কিরণদাস। দু'জনায় মারামারি। এই আর কি!

এত কিছুতেও নবীনদাসের তেমন কোন বিকার নেই। কলতলার দিকে গিয়ে সরকারি টিউবওয়েল টিপে মুখ ধুয়ে এলো সে। কাপড় চোপড় খুলে শুতে গেল। ততক্ষণে চলে গেছে তার সঙ্গী-সাথীরা। বসন্তের মৃদু হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে নিজের দাপট দেখায়।

প্রেমদাসী শুধাল, ভাত খাবে যে গোঁসাই।

না। আজ খিদে নেই।

কিন্তু আমি যে আজ নারকল দিয়ে কলার মোচা রান্না করেছি গো। তুমি খাবে বলে। খেতে ভালোবাসো তাই—

পেট ভার যে প্রেমদাসী। তুমি খেয়ে লাও।

একা আমার খেতে রুচবে নাকি?

তবে গে শুয়ে পড়—

এত গোঁসা কিসের—

কোথায় গোঁসা। মাথার শিরা দপদপায়।

মারপিট কেন কর বল দেখি। তুমি না বাউল মানুষ। রাগ, হিংসা তোমার কি গো স্বরের গুরু—

কনটাক্ট করে সে টাকায় ফেল কেন, গান কি মাগনা আসে—

প্রেমদাসী তাকায় এই নবীনদাসের দিকে। বেশ তীব্র চোখ, পুরুষ মানুষের যেমন হয়। এত টাকার টান তো লোকটার ছিল না। প্রেমদাসী নরম স্বরে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করল, অত টাকার লোভ ভাল নয় গো গোঁসাই। অর্থই হল অনর্থের মূল—

আজ যে বড় অন্য কথা শুনি। তুমিই তো আমায় টাকা চেনালে গো প্রেমদাসী। আজ যে বড় অন্য স্বরে গাও।

সুখের জীবনে দুখ ডেকে এনে কি লাভ বলো—

চুপ কর। চুপ কর তো আজ। আমাকে একটা ঘুমতে দাও।

কি হয়েছে তোমার বলো তো? দিনে দিনে যাচ্ছ কোথায়?

ঘরের বউয়ের মত শুধায় প্রেমদাসী। কেউ কোন উত্তর দেয় না। শুধু এই রাতের আকাশে শেষ বসন্তের মেঘ সরের মত পাক খায়। নীলগুলি সব হারিয়ে যায় আকাশে। শুধু জেগে থাকে ডিমের ভিতরকার কুসুমহীন সাদা কাথ—এই

আকাশ মৃত্যুর মত ফ্যাকাশে মনে হয়। প্রেমদাসী ভাবে, বেঁচে কি লাভ? বাঁচতে ভালো লাগে না। বাঁচতে আর ভালো লাগে না তার।

তবু বাঁচা ছাড়া আর কি করা যেতে পারে। বাউল মানুষের আর কি আছে সংসারে।

বিদেশ থেকে ডাক আসে নবীনদাসের। নবীনদাস যায়। ফিরে আসে। প্রেমদাসী তার নিজের মত গায়। থাকে, আর বোঝে চাইলেই মানুষ সব কিছু পায় না। নবীনদাসকে সে যেমন করে চেয়েছিল তেমন করে পেল কোথায়। মানুষ কেমন করে পালটায় তা তো আর জানতে বাকি নেই প্রেমদাসীর। জগতে আত্মীয়-স্বজনহীন এক মেয়েমানুষ, আস্তে আস্তে যৌবন খুইয়ে তার শুধু পিছুটান বাড়ে। গাছের ছায়ায় বসে একতারা বাজায় প্রেমদাসী। কখনো বা ঊর্ধ্বচোখে চেয়ে কার উদ্দেশ্যে যেন গায়—

এ খেলাঘর ভাঙলে ও যদি
কেনই বা ঘর বাঁধলে
সবাইকে কাঁদাইলে যত
নিজেও তত কাঁদলে
মনের বনে লাগে গো আগুন
ফাগুন হাওয়া যায় না
দিল কি দয়া হয় না গো
খোদা দিল কি দয়া হয় না।

পুরানো কথা মনে পড়ে যায়, এক এক সময় প্রেমদাসীর মনে হয় সেই মুছলমান লোকটাই বুঝি ছিল ভাল। ভালমন্দ না বুঝে পালিয়ে এসেছিল প্রেমদাসী লোকটার সঙ্গে। দেয়নি কি কিছুই? শুধুই ছলনা? ঠকিয়েছে দুধের মেয়েটাকে। তবু যা পেয়েছিল সেই স্বাদ আর তো কোথাও পেল না প্রেমদাসী। এদিক ওদিক তাকালে গাঢ় বকুল গাছের আঁধারের ভেতর থেকে বসন্তের কোকিল ডাকে।

কোন কথাই চাপা থাকে না। একদিন জলে ওঠে লুকানো কথাটি। প্রেমদাসী শুনল নবীনদাসের একটি ভাবের মানুষ এসেছে। শান্তিপুরের মেয়ে। সেও বাউল গায়। বৈষ্ণব ঘরের মেয়ে। নাম চরণ।

ভাত খেতে বসেছিল নবীনদাস। মটরশুঁটি দিয়ে আজ খিচুড়ি রান্না করেছে প্রেমদাসী। শীতকাল—শরীরের ছাল-চামড়া এসময় শুধু ফেটে ফেটে ওঠে। আর

হৃদয়ের জ্বালাটি বাড়ে। নবীনদাস বলল, এত দূরে থেকে শহরের ফাঙশনে গাইতে যেতে আমার বড় কষ্ট হয়। ভাবছি লাইন-পোতের ধারে থাকব—

অ—

তুমিও যাবে আমার সঙে।

আমি কোথা যাবো। এই গোলটিয়া ছেড়ে আমার মন কি আর টিকবে গো গোঁসাই। আমাকে তুমি এখানে ফেলেই যাও। আর কি, ইবার তো তোমার লোক এসেছে—

কি বলছ তুমি—

কেন চরণ। সে হবে চরণদাসী—

বাঁকা চোখে হাসল প্রেমদাসী। কিন্তু হাসির সে যাদু আর নেই। জীবন যেমন ফুরিয়ে যায় তেমনি। নিভে যাওয়া মোমবাতির মত শুধু একটু ম্লান আলো চৌদিকে ছড়ায়। সে আলো তেমন কারো কোন কাজে লাগে না। বরং ভালো করে তাকিয়ে দেখলে দেখা যাবে এখন প্রেমদাসীর চোখেমুখে হেরে যাওয়া মেয়ে-মানুষের একটা দাগ। সেটা জ্বালাই বলো আর দুঃখই বলো। প্রেমদাসী বলল, তা গোঁসাই তোমার সেই ভালোবাসার জনকে আমাকে দেখালে না, কেমন দেখতে গো তাকে—

স্থির চোখে নবীনদাস তাকায়। আজকাল তার স্বভাবচরিত্র যেমন হয়েছে। একটিও কথা নেই। শুধু দেখা। আজ কিন্তু তেমন নিঃশব্দ নয় নবীনদাস। বলল, তুমি আমার জন্য অনেক করেছ প্রেমদাসী। তোমাকে আমার কিছুই দেওয়া হয়নি—

তাই নাকি। কি দেবে আবার। মেয়েমানুষকে দেবার কি আছে গো তোমার?

কলকাতা থেকে আসার সময় আমি কিনে এনেছি। অনেক টাকা তো কামালাম। যার থেকে এই রোজগার, মন বলল তাকে দাও—

কি এনেছ শুনি—

ভাত খেয়ে হাত ধুয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল নবীনদাস। কাপড়ের ব্যাগ থেকে বের করে আনল নূতন একজোড়া গেরুয়া কাপড়ের খণ্ড। বসন্তে পলাশ গাছে যেমন আগুন লাগে, তেমনি লেগেছে কাপড়ে। দু পাটি কাপড়। বাউল-বস্ত্র। নবীন-দাস এগিয়ে দিল প্রেমদাসীর দিকে। দেখে প্রেমদাসী হো হো করে হেসে উঠল। আর তার চোখের গহীন থেকে নেমে এলো জলের ফোঁটা। শুধু দু'হাতে তুলে

নিয়ে খুব আদর করে প্রেমদাসী বলল, বা বা, খুব সুন্দর। আমার জন্য এনেছ বুঝি ?

নবীনদাস নিরুত্তর।

এই তোমার দান। কবে যাবে গো গোঁসাই। কবে তুমি যাবে নতুন জনের কাছে—

চমকে ওঠে নবীনদাস, ফাটা একতারার তারের মত বাজে প্রেমদাসীর গলা। নিচু মুখে নবীনদাস বলে, কাল সকালে। আজ রাতটিতে থাকব এখানে। খাবো তোমার হাতের রান্না।

কে জানে কেন, আজ এতদিন পরে নবীনদাসের গলাও রুদ্ধ হয়ে আসে। এত দিনের ওঠাবসা, সে কি একদিনে ছিঁড়ে যাবার বস্তু !

তবু যেন থাকে দ্বিধা, সারাদিন অপরাধীর মত নবীনদাস ঘুরে বেড়াল। ঘরে, গ্রামে, প্রেমদাসীর চোখের সামনে। সন্ধ্যের পর জোছন রাত নামল পৃথিবীতে। ঠিক আগের মত আজ গেরুয়া পরল প্রেমদাসী। নবীনদাসের দেওয়া তার সেই প্রাণধন। যেমন আখড়ায় পরত প্রথম যৌবনে। যেমন গেরুয়া পরে গানের তালিম দিত নবীনদাসকে তেমনি প্রেমদাসী আজ। নবীনদাস বলল, এই রাতে কোথায় চললে প্রেমদাসী।

ও মরণ ! যাব আবার কোথা। আমার এ ঘরবাড়ি ছেড়ে। চল না ওই মাঠে। জোছন রাতে মোরা দুজন বাউল গাই—

আবদারের একটি সুর ছিল প্রেমদাসীর গলায়। নবীনদাস গেরুয়া পরল আজ। ধরল ডুবকি। প্রেমদাসীর হাতে তার পুরানো বহুকালের একতারাটি।

প্রেমদাসী গাইল প্রথমে—মন চলো যাই ভ্রমণে—কৃষ্ণ অনুরাগের বাগানে।

নবীনদাস শুনল মন দিয়ে তারপর নিজে ধরল—মায়া নদী কেমন যাবি বহিয়া—ওই রঙিলা দেশের নাইয়ারে—

এইভাবে রাত বাড়ল। প্রেমদাসীর চোখে ঘুম নেই। দূর থেকে ছুটে আসে বাতাসভাঙা কোপাইয়ের ঠাণ্ডা হাওয়া। নবীনদাস বলল, এবার ঘুমাবে তো, চল রাত যে বাড়ে।

প্রেমদাসী তাকাল নবীনদাসের দিকে। তারপর বলল, চলো—

গভীর ঘুমে কাদা হয়ে গেল নবীনদাস। গোলটিয়া গাঁয়ে রাতের প্যাঁচাটি শুধু জেগে জেগে ডাকে। ঘর থেকে মৃদু পায়ে বেরিয়ে আসে প্রেমদাসী। তার পরণে সেই নতুন গেরুয়া। ঘুম আসে না। শরীরটা কেমন জ্বালা জ্বালা করে গো।

ঘরের বাইরে এসে তাকিয়ে দেখল প্রেমদাসী, বকুল গাছটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তার ভেতর থেকে ডেকে ওঠে প্যাঁচা। আহা, লক্ষী প্যাঁচা। বার বার ডাকে প্রেমদাসীকে।

হাতে একতারাটি তুলে নিয়ে প্রেমদাসী গিয়ে দাঁড়ায় সেই গাছের তলায়। অলীক জ্যোৎস্নায় পৃথিবী অপরূপ হয়ে আছে। মেয়ে বাউল এই তুচ্ছ মানুষটা। তাকে দেখেও বুঝি কেউ ভয় পায়। গাছ থেকে উড়ে গেল প্যাঁচা। যাওয়ার আগে শেষবার ডেকে গেল যেন। হাতের একতারা মাটিতে নামিয়ে রাখে প্রেমদাসী। গেরুয়া বসন গলায়, গাছের ডালের দিকে হাত বাড়ায় সে। আহা কেমন সবুজ গাছ, কেমন নিশ্চিন্তি।

চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে প্রেমদাসী। সবাই ঘুমিয়ে। সে গলা খুলে গাইল—

ও সজনি, প্রাণো সজনি—
দেহের গরব কেউ কোর না, গো,
দেহের গরব—এ মানব দেহ মাটি,
হায়, সখি ভাঙলে হবে খণ্ড খণ্ড
আর তো জোড়া লাগবে না—

দুই হাত আকাশের দিকে তুলে ধরে গাছের ডালে ঝুলতে থাকে বাউল প্রেমদাসী। থেমে যায় তার গান। হায় ! একি হলো গো—একি হলো আজ !

আমাদের ঘরসংসার

বাসুদেব দেব

কাগজপত্র সই করতে করতে হঠাৎ তারিখটা খেয়াল হলো হিরণের। আজ জানুয়ারির সাত তারিখ। ভাগ্যিস, খেয়াল হলো। তাড়াতাড়ি ফাইলগুলো চালান করে দিল। গুছিয়ে ফেলল টেবিল। ঘড়িতে দেখলো চারটে বেজে গেছে। টেলিফোনে বলল : দিলীপদা, আজ একটু আগে বেরুচ্ছি। বাড়িতে একটা জরুরি কাজ আছে। অফিসের মেজোকর্তা দিলীপ সান্যাল অবাক হন কিছুটা। ছুটির পরও হিরণ কাজ করে। এম. ডি'র চোখে পড়ার জন্য, পরের প্রোমোশনটার জন্য হিরণ কয়েকবছর ধরে খুবই চেষ্টা করে যাচ্ছে। দিলীপ হালকা ঠাট্টা করলো : 'জরুরি কাজটি কি ভায়া জরু সাহেবার ? একটা কৃত্রিম হাসি কুলকুচো করে হিরণ বেড়িয়ে পড়লো। হালকা লাগছে বেশ। অনেককাল নিজের থেকে ভালো কিছু করা হয় না, কাউকে সুখী করার জন্য, কারুর কথা রাখার জন্য। কলেজ স্ট্রিট মার্কেট থেকে ফুল কিনলো কিছু, আর কখনো যা করে না, একা একাই ঢুকে গেল একটা শাড়ির দোকানে। বেশ কয়েকটা শাড়ি দেখে বাসন্তী রঙের একটা সিল্কের শাড়ি কিনে ফেললো। পছন্দ হবে তো ? রাকার যে কি পছন্দ কি অপছন্দ এতদিনেও ঠিক মুখস্থ হয়নি হিরণের।

অন্য দিন দুবার মাত্র কলিংবেল বাজায়। এক একজনের এক এক রকম স্বভাব, অভ্যেস। আজ সে ভিতরে ভিতরে একটা উত্তেজনার আঁচ টের পাচ্ছিল, ঘন ঘন ঘণ্টা বাজাতে লাগলো।

'আঃ, কে ?' বিরক্ত হয়েছে রাকা।

দরজা খুলেই 'ওমা, তুমি ?

'কেন ? অবাক হয়ে গেলে ?'

'না, তা নয়। রোজ তো আটটার আগে ফেরো না। আর দুবারের বেশি ঘণ্টাও বাজাও না। আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরলে ? শরীর ভালো আছে তো ? হাতে এগুলো কি ? নেমন্তন্ন আছে নাকি কোথাও ? বলোনি তো আগে !'

হিরণ ফুল আর শাড়ির প্যাকেটটা নামিয়ে রাখে। খুলে ফেলে টাই, জুতো।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে রাকার দিকে। যেন এই রাকাকে সে ভালো করে চেনে না।

'আজ নেমন্তন্ন তো আমাদের বাড়িতেই। প্রতিবার আমি ভুলে যাই বলে খোঁটা দাও। এবার তোমারই মনে নেই !' আজ সাতুই জানুয়ারি। মনে নেই ?

'ও' খুব উদাসীন ভাবে বলল রাকা। এলো চুল। অগোছালো শাড়ি।

'তোমার শরীর ভালো নেই ?'

'সে সব কিছু নয়।'

'তবে,' খুব উচ্ছল হয়ে ওঠে হিরণ। 'আমি সাত তাড়াতাড়ি চলে এলাম অফিস থেকে। চলো আমরা বেড়িয়ে আসি, রাত্তিরে বাইরে খেয়ে নেব। টুম্পা কোথায় ?'

'টুম্পাকে নিয়ে বীণা পাশের বাড়ি গেছে।'

'তুমি তাহলে তৈরি হয়ে নাও। টুম্পাকে ডাকবো ?'

'এই তো সবে এলে। বসো। হাত মুখ ধোও। চা করে নিয়ে আসি।' রাকা রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ায়। পেছন থেকে এসে জড়িয়ে ধরে হিরণ। 'আজ আমার পাওনা নেই কিছু ?' রাকা বলল : 'অধৈর্য হতে নেই। আমি তো এখুনি ফুরিয়ে যাচ্ছি না।'

'তুমি খুসি হওনি রাকা ? দেখো তো শাড়িটা—কি রকম মানাবে ?' হিরণই প্যাকেটটা খুলে শাড়িটা বের করে আনে।

'বাঃ, খুব সুন্দর হয়েছে।'

'পছন্দ হয়েছে ?'

'হ্যাঁ' শাড়িটা ভাঁজ করে রাকা প্যাকেটের মধ্যে রেখে দেয়। হিরণ এবার আরো অধৈর্য হয়ে পড়ে।

'তোমার কি হয়েছে বলো তো ! অন্যান্য বছর তুমি কত খোঁটা দাও, আমাদের বিবাহ-বার্ষিকীর তারিখটা আমি ভুলে যাই। তুমি ঘর গুছিয়ে, নিজে সেজে গুজে বসে থাকতে, আমি দেরি করে ফিরে এলে···এবার কি হলো ? তোমার মনে ছিলো না ?'

'ছিলো। মেয়েরা বিয়ের দিন ভুলে যায় না। সাত বছর হলো আমাদের বিয়ে হয়েছে।' 'সাত বছর' এমন টেনে টেনে উচ্চারণ করলো রাকা যেন মনে হলো সত্তর বছর। এখনো যার বয়স পঁয়ত্রিশ ছোঁয়নি, যার মেয়ের বয়স মোটে

পাঁচ, নিজের হাতে গড়া এই তিন কামরার নিজস্ব ফ্লাটে যে সংসারে সে সম্রাজ্ঞী, তার গলায় এই আলগা অচেনা স্বর হিরণের কাছে নতুন লাগলো। যেন স্বর কেটে যাচ্ছে কোথাও। অথচ ঝগড়াঝাটি হয়নি ইদানিং, এমন কিছু করেনি হিরণ দু'একদিনের মধ্যে যা রাকার পছন্দ নয়। পুরোনো বান্ধবী কেউ চিঠি লিখেছে বাড়িতে? খাম খুলে চিঠি পড়েছে রাকা? না, যে লিখতে পারে চিঠি, যে লেখে না। লিখলেও তাতে রাকার কষ্ট পাবার মত কিছু থাকবে না। কিসে যে কে কষ্ট পায়! না কি কোন আত্মীয়, পিসিমা বা নৈহাটির কাকীমা টাকা পয়সা চেয়ে চিঠি লিখেছে? না, রাকা তো স্বার্থপর, অনুদার নয়। টুম্পা যখন পাশের বাড়িতে খেলতে গেছে, সে-ও ভালো আছে। বীণার সঙ্গে ঝগড়া কথা কাটাকাটি হয়েছে? বীণাকে রাকা খুবই পছন্দ করে। আর কারুর মনে আঘাত দিয়ে কথা বলা রাকার স্বভাবে নেই। তা হলে, কি হয়েছে রাকার? ওকে চমকে দেবার জন্য আজ তাড়াতাড়ি চলে এসেছে হিরণ। কিন্তু যেন খুশি নয় রাকা। যেন কল্পনায় তৈরি ছবিটার একটা দিক ছিঁড়ে বিশ্রীভাবে ঝুলে আছে। সাত বছরেই ছিঁড়ে গেল তার? বাথরুমে মুখে চোখে জল ছিটোতে ছিটোতে ভাবছিল এইসব। ফিরে এসে ফর্সা দেখে তোয়ালে হাতে রাকা হাসি-মুখে। মানুষের মন-মেজাজ কখন যে কি রকম!

'তুমি একটু বসো, আমি চা আর জলখাবার তৈরি করে আনছি।' সেই পরিচিত রাকা। আশ্বস্ত হয় হিরণ। রেকর্ডপ্লেয়ারে একটা রবীন্দ্রসংগীতের ক্যাসেট ধরিয়ে দিয়ে হাত পা ছড়িয়ে বসে। খুব মৃদু স্বরে শীত-সন্ধ্যায় বাজতে থাকে: 'পুরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে আধেক আঁখির কোণে অলস অন্যমনে।'

চায়ের টেবিলে সন্ধেবেলা অনেককাল একসঙ্গে বসা হয় না। ছুটির দিনে কোথাও বেরুনো থাকে বা লোকজন এসে যায়। টুম্পা দুষ্টুমি করে। আজ যেন পুরোনো দিন কেউ ফিরিয়ে দিয়েছে কিছুক্ষণের জন্য। হিরণ রাকার পেয়ালায় ঠোঁট ঠেকালো। তারপর রাকার ঠোঁটে। চায়ের উত্তাপ আর স্বাদ। তার সঙ্গে অন্য কিছু। 'আজ তুমি যা চাইবে তাই আমি দিয়ে দেব রাকা। সমস্ত পৃথিবী তোমাকে দিয়ে দেব। বলো, কি চাই তোমার?'

'চাইলেই দেবে? তুমি কল্পতরু সেজেছো আজ?'

'চাও। কি আর চাইবে তুমি? নিজের জন্য কখনো তো কিছু চাও না। এই ফ্ল্যাট কিনতে কত সাধ আহ্লাদ বিসর্জন দিয়েছ তুমি। বলো না, কি চাও?'

রাকা একটু থেমে, স্পষ্ট করে বলল: 'আমাকে মুক্তি দাও।' প্রথমটায় কিছু

বুঝে উঠতে পারেনি হিরণ। পরে বলল: 'মুক্ত, তুমি মুক্ত পাখি। আমি কি বেঁধে রেখেছি তোমায়?' সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে সে।

'আমি ডাইভোর্স চাই।'

হিরণের হাত থেকে ছলকে পড়ে চা। অন্যমনস্ক থাকায় পিরিচটা পড়ে খান-খান হয়ে যায়। চিত্রিত চিনেমাটির টুকরোয় ভরে যায় ঘর। হিরণ যেন আচমকা একটা নোনা ঢেউয়ের আছাড় খায়।

'ডাইভোর্স!'

'হ্যাঁ, ডাইভোর্স' বলে রাকা হাঁটু মুড়ে নিচু হয়ে ভাঙা পিরিচের টুকরো কুড়ুতে থাকে। এবার হিরণ উঠে দাঁড়ায়। হাতের পেয়ালাটাও সশব্দে ছুঁড়ে দেয় মেঝের ওপর। খিমচে ধরে রাকার কাঁধ। নখ বসে যায় নরম চামড়ায়।—

'আঃ ছাড়ো'

হিরণ একটা জান্তব ক্রুদ্ধ গলায় চিৎকার করে: 'কে? কে সে?'

কলিংবেল বেজে ওঠে। রাকা দরজা খুলে বীণার কোল থেকে টুম্পাকে নেয়। হিরণ টুম্পাকে ছিনিয়ে নিলো। বীণা ঘরময় ভাঙা পেয়ালা পিরিচ দেখে চমকে ওঠে। রাকা বলল: 'তুই বাইরে থেকে ঘুরে আয়। খোঁজ নিয়ে আসিস তো টুম্পার দুধটা দোকানে এসেছে কিনা।' সন্দেহ ও কৌতূহলের দৃষ্টিতে সারা ঘর জরিপ করতে করতে বীণা চলে যায়। দরজা বন্ধ করে হিরণ এসে দাঁড়ায় রাকার সামনে, 'বলো, বলতেই হবে তোমাকে, কে সে?' টেপ-রেকর্ডার থেকে তখন গান ফুরিয়ে একটা অবিরল যান্ত্রিক শব্দ বেজে চলছে।

লুকিয়ে লুকিয়ে দেখলেও রাকা ঠিক বুঝতে পারে। মেয়েদের বোধহয় সহজাত থাকে এই বোঝার ক্ষমতা। কদিন ধরেই লক্ষ করছিল ব্যাপারটা। প্রথম দিকে অস্বস্তি আর বিরক্তি, পরে কৌতূহল, আর এখন? এখন কেমন যেন জড়িয়ে পড়েছে রাকা। আর এই জাল থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারছে না। সে প্রায় এক বছরেরও বেশি। হিরণকে বলা হয়নি। বলার মতনও ছিল না প্রথম দিকে। পরে অনেক ভেবে ইচ্ছে করেই আর বলেনি। একদিন তো বলতেই হবে। লুকোবার মত ব্যাপার নয়। রাকাকে মনস্থির করতেই হতো। কদিন আগে আর পরে। দু'নৌকোয় পা রেখে চলাটা আরো বোকামি। এই ঘর সংসার, এই নিজের হাতের সাজানো ফ্লাট, এই সাতবছরের দাম্পত্য জীবনের নানারঙের স্মৃতি,

টুম্পার জন্ম, তাকে নিয়ে পাঁচ বছর—একটা ঘোরের মধ্যে, একটা অভ্যাসের মধ্যে রেকর্ডের মত ঘুরে যাচ্ছিল রাকার জীবন, সচ্ছন্দ। হঠাৎ একটা তীব্র যন্ত্রণা···

সেদিন অকালে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ভারি স্নিগ্ধ হয়ে আছে চার-দিকটা। ভিজে সবুজ ঘাসের এক টুকরো মাঠ পেরিয়ে রাকা বড় রাস্তার দিকে হাঁটছে। টুম্পা বীণার কাছে। গানের মাস্টারমশায়ের কাছে যেতে হবে। কোথা থেকে রাস্তার বাঁকে একটা অচেনা গাছের মত গজিয়ে উঠলো ছেলেটি। ছেলেটি? না লোকটা? না যুবকটি? না সেই তরুণ? চোখে চোখ পড়ল আজ প্রথম। এই কয়েকদিন ধরেই মনে হচ্ছিল কোথাও যাবার বা ফেরার সময় লক্ষ করছে তাকে কেউ, হঠাৎ ঘাড় ঘোরালেই মাথা নিচু করে ভিড়ের মধ্যে মিশে যেত বা লুকিয়ে পড়তো কোথাও, নয়তো বা থেমে যেত। এই অনুসরণের ব্যাপারটা রাকার খুব খারাপ লাগছিল। কলেজে পড়ার সময় এ রকম যে দু-একবার হয়নি তা নয়, কিন্তু সময়মত হিরণ এসে পড়েছিল। এক ভালোবাসার খেলায় জড়িয়ে পড়েছিল রাকা। আজ তার টিপটপ সংসার। স্বামী কন্যা। এ সময় এ রকম এক নাছোড়বান্দার পাল্লায় পড়ার কোন মানে হয়?

চোখে চোখ পড়তেই মৃদু হাসলো সে। শ্যামলা রঙ। কত বয়স হবে? রাকার সমবয়সী, কমও হতে পারে। বোঝা যায় না ঠিক। এই'ক'বছরেই সংসার আর চাকুরি করে হিরণের যে রকম ভারিক্কি চেহারা হয়েছে সেরকম নয়। কোথাও বাধা পড়েছে মনে হয় না। ছি-ছি, এসব কি ভাবছে রাকা। মুখ গম্ভীর আর নিচু করে বাস স্টপের দিকে এগিয়ে গেল রাকা। আজ মাস্টারমশায়ের বাড়ি রিহার্সাল। প্রাক্তন ছাত্রী রাকা। এখনও নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রাকাকে ডেকে পাঠান বীরেনবাবু। বাস স্টপে ছোটখাট ভিড়। কি ভেবে বাঁদিকে চোখ ফেরাতেই অবাক। আবার সে। রাকার দিকেই তাকিয়ে আছে। ভিতরটা সিরসির করে উঠলো। যেন ঐ দৃষ্টি প্রতি রোমকূপ দিয়ে বৃষ্টির জলের মত ঢুকে যাচ্ছে রাকার ভিতরে, খুব ভিতরে। না, না, ছি, ছি, তার না ঘরসংসার, স্বামী কন্যা সব আছে। লোকে শুনলে বলবে কি, কিন্তু রাকার তো কোন দোষ নেই। বাসটা এসে পড়তেই যেন বেঁচে গেল এইসব চিন্তা থেকে। কলকাতার অকথ্য ভিড় বাস আপাদমস্তক গ্রাস করে ফেললো রাকাকে। বেশ কিছুদিন ভালোই গেল। এর মধ্যে দীঘাতে ঘুরে এল সবাই। বেশ মজা হলো। ছবি তোলা হলো একরাশ। হিরণের সঙ্গে গোপন চুক্তি হলো। না, এখন আর বাচ্চা নয়। রাকার কেন যেন মনে হচ্ছিল আর সে শিকড় মেলবে না। কোথায় যেন একটা

ফাটল ধরেছে, এক ঝলক সমুদ্রের নোনাজল ঢুকে গেছে সেখানে। ঢুকে গেছে তার অত সাধের সংসারের তলায়। এই ফ্ল্যাট-বাড়ি কিনতে দু'চারটে গহনাও বিক্রি করে দিয়েছে রাকা। শোনেনি হিরণের বারণ। মাসে মাসে অতগুলো টাকা ধার শোধ করতে হয় মাস মাইনে থেকে। হিরণ অফিসে চলে গেলে সারা-দিন ধরে সে ঘর গোছাতো। টুকিটাকি জিনিসপত্র দিয়ে সাজাতো বসবার ঘর। যে ঘরের স্বপ্ন দেখে মেয়েরা পুতুল খেলার কাল থেকেই।

দীঘা থেকে ফিরে টুম্পার জ্বর হলো। হয়তো ঠাণ্ডা লেগে গেছে। দুপুরে রান্না সেরে ডাক্তারখানার দিকে পা বাড়ালো। এ দিকটা বেশ নিরিবিলি এখনো। একটা পান বিড়ির দোকান। সেটা পেরুতেই টের পেল পেছনে আসছে কেউ। না, আর তাকাবে না রাকা। আসকারা পাবে ছেলেটা। কখন পাশাপাশি এসে পড়েছে সে। সামনেই ডাক্তারখানা।

'ডাক্তারের কাছে চললেন?'

কি আস্পর্ধা লোকটার! থমকে ভ্রূ কুঁচকে রাকা রাগের ঝাঁঝ মিশিয়ে বলল: 'কি চাই আপনার?'

'তোমাকে।' যেন পৃথিবীর কোথাও কিছু হয়নি এমন গলার স্বর। কি নির্লজ্জ বেহায়া মানুষ। আবার একটা আশ্চর্য সিরসিরানি রাকার শরীরময় ছড়িয়ে পড়লো। কোনো উত্তর না দিয়ে ঢুকে পড়লো ডাক্তারখানায়। ভাগ্যিস্ ডক্টর মজুমদার ছিলেন। ওষুধপত্র নিয়ে আধঘণ্টা পর বেরিয়ে পড়লো। একটা অস্বস্তির সঙ্গে নিষিদ্ধ একটা ভয় ভর করলো। ঘরে তার অসুস্থ মেয়ে। অন্য কোন দিকে তাকাবার তার সময় নেই। কিন্তু কি কাণ্ড, লোকটা কোত্থেকে এসে হাজির হলো, হাঁটতে লাগলো পাশাপাশি। 'ভয় পেও না আমাকে। আমি অপেক্ষা করে আছি।' চিৎকার করে লোকজন ডাকবে না কি? সে আরো বিশ্রী একটা কেলেং-কারি হবে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রাকা দ্রুত পায়ে হেঁটে গেল। সমস্ত মুখটা যেন তেতে লাল। এই ভাবেই শুরু হয়েছিল প্রথম দিকটা। তা বছর খানেক হয়ে গেল। মাঝে মাঝেই ধূমকেতুর মত তার উদয়। প্রতিটি মুহূর্তে ভয় হতো। এড়ানো সম্ভব হয়নি তাকে; একটু একটু করে চেনা পরিচয়, কথাবার্তা, দেখা-শুনো। 'আমি তোমাকে ছাড়বো না রাকা' বলতো তমাল। 'ভয় পাও কেন? কিসের ভয়?'

'কিসের ভয় তুমি জানো না?

'হারাবার ভয়? তোমার ঘর, সংসার, স্বামী, মেয়ে···

'ভয় আর কষ্ট'

'প্রথমটায় কষ্ট লাগে। অভ্যাস ভাঙতেই কষ্ট। তারপর আবার নতুন কিছু। নইলে তোমার মুক্তি কোথায়? ছিলে না তুমি বাপের বাড়িতে? ছেড়ে আসোনি তাদের? ছেড়ে আসোনি ছেলেবেলার জীবন? কিশোরী কালের বন্ধু? কলেজে পড়ার দিনগুলো? সবাইকে ছেড়ে দিতে হবে। ভালো লাগতে লাগতে ছাড়তে পারলেই তো ভালো? এই সংসার ঘর বাড়ি তোমার গৃহিনীপনা, এই পুতুলখেলার জীবন ফেলে আমার কাছে চলে এসো রাকা।'···কি যে থাকে ওর স্বরে। ভয়ে ভিতরটা গুড়গুড় করতে থাকে। রাকা চুপ করে থাকে, দেখে তমালকে। কতটুকু জানে ওর? প্রায় কিছুই না। কিন্তু যেন আজন্ম অধিকার তার রাকার ওপর, এমন ভাবে কথা বলে। ভেসে ওঠে টুম্পার মুখ। ঘুমুচ্ছে এখন বীণার কাছে। সেই ফাঁকে বেরিয়ে এসেছে। চলে যেতে হবে এখুনি। জেগে ওঠবার আগে। এই দু'নৌকোয় পা রাকার ভাল লাগে না। এমন নয় তার শুচিবাই আছে। হিরণের বউ বলে সে আর কাউকে ভালোবাসতে পারবে না, কারুর সঙ্গে মিশতে পারবে না, এরকম ভাবে না সে। তবু একটা কাঁটা খচখচ করতে থাকে। মৃদুস্বরে বলে: তুমি ও রকম করে বলো না। আমি পারবো না। মাঝে মাঝে দেখা হবে এই-তো বেশ। আর দুপুর বেলা বাড়িতে ওরকম করে এসোনা।'

'না। তা হয় না। আমি তোমাকে চাই রাকা। তুমি বুঝতে পারছো না তুমি যা নিয়ে আছো তা কিছু নয়। তুমি দিনদিন একটা অভ্যাসের মধ্যে, যান্ত্রিকতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ছো। আর তাই ভালো লাগাবার জন্য নিজেকে স্তোক দিচ্ছ, স্নেহমমতা, ভালোবাসা, দায়িত্ব···'

'এ সব কিছু নয়? কি বলছ তুমি? তাহলে আমাকে পাবার পরও আমাকে ছেড়ে দিতে পারো তুমি।'

'আমি ছাড়ি না। আমি বাঁধি না হিরণের মত, টুম্পার মত, তোমার সি বাই সেভেন ফ্ল্যাটের মত। অমি তোমাকে মুক্তি দেব।

'মুক্তি?'

'হ্যাঁ। তুমি কুয়োর জল হয়ে আছো। আমি তোমাকে বহতা ধারা করে দেব।' তখনই একদল ছেলে জাঁসি পরে বল নিয়ে ছুটতে ছুটতে পার্কের দিকে আসছিল। উঠে পড়লো রাকা।

'চলি।'

'আবার দেখা হবে।'

'ও রকম করে ডেকো না। আমার সময় সুযোগ হলে···'

'আমি সব সময় তোমাকে অনুসরণ করছি' তুমি জানো। তুমি চাও বা না চাও, আমি লুকিয়ে হোক, প্রকাশ্যে হোক, নির্জনে হোক, ভিড়ের মধ্যে হোক তোমাকে সব সময় লক্ষ করি, ডেকে নেব। তখন যে কোন ছুতোয় চলে এসো···'

সব কথা শোনে না। রাকা ছুটে এসে আশ্রয় খোঁজে তার ঘরে। ভেঙে পড়ে বিছানায়। জেগে ওঠে টুম্পা। টুম্পাকে সাজিয়ে বীণাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেয় পাশের বাড়ির রিংকুর সঙ্গে খেলতে। ছোটো ছোটো পরিবারে খেলার সাথী পায় না বাচ্চারা। তারপর চোখে মুখে জল দিয়ে এসে দেখতে থাকে তার নিজের সংসার। এই তার সংসার। তার জীবন! তিনখানা ঘর, তেতলায়। ঐ তো হিরণের সঙ্গে ছবি। বিয়ের পর তোলা। এতদিনে চেনা হয়ে গেছে লোকটাকে। তার কথা বলার ধরণ, তার রাগ, ভালোবাসা, পছন্দ-অপছন্দ, অভ্যেস, সব কিছুই জানা। তার গুণ, দোষ, দুর্বলতা কিছুই আর লুকোনো নেই। ঐ তারই রক্তমাংসে তৈরি টুম্পার জন্মদিনের ছবি। মনে পড়ছে সব কথা। প্রথম যখন ও পেটে এল, ডাক্তারের কাছে যাওয়া, মার কাছে গিয়ে থাকা। ভয় পেয়েছিল খুব। নার্সিং হোমে যাবার দিন হিরণের হাতখানা চেপে ধরে কত কেঁদেছিল। যদি আর না ফেরে সে? তখনও এই ফ্ল্যাট বাড়ি হয়নি। কথাবার্তা চলছিল। যেদিন টুম্পা হোল, শেষ রাতে, কি বৃষ্টি সেদিন। সে-ও ছিল জানুয়ারি মাস, কুড়ি তারিখ। আজ, আরে আজই তো সাতুই জানুয়ারি। কদিন ধরেই মনে করে রাখছিল। ভুলেই গিয়েছিল। তমালের জন্য আজকাল এ রকম হচ্ছে। ঐ ফ্রিজ কিনতে হিরণের বন্ধু অজয়কে নিয়ে গিয়েছিল দোকানে, ওর চেনাশোনা দোকান। তারপর টিভিটাও অনেক মডেল দেখে পছন্দ করেছিল রাকা। এই সোফা সেট, বইয়ের র‍্যাক, পর্দা, ফুলদানি, দেয়ালে ঝোলানো ডেকরেশন, খাবার টেবিল, এমনকি ঐ কাপ-প্লেট, নুন আর মরিচদানি, গ্যাসের উনুন, বেতের নিচু চেয়ার, পাপোষ, হিরণের ছাইদান, দুর্গার মুখ, যামিনী রায়ের ছবি—সবই সে নিজে দেখে শুনে পছন্দ করে কিনে এনেছে। এই সব কিছুর সঙ্গে তার এক এক টুকরো শরীর মন মিশে আছে। এই সব মিথ্যে? কিছু নয়! তখনই হঠাৎ সেই তীব্র যন্ত্রণাটা···

তমাল তাকে মুক্তি দেবে? এই সব কিছু থেকে? এখনো আলমারির কোন তাকে কি আছে মুখস্থ রাকার। লুকোনো কিছু টাকা, দু'একটা খুচরো গহনা

নিচের তাকে একটা ছোটো কৌটোর মধ্যে রাখা আছে, কয়েকখানা পুরোনো ছবি আর চিঠি একটা খামে ঐ আলমারির এমন জায়গায় আছে হিরণ জানবে না কোনদিনও। তোষকের তলায় ছোট ডাইরিতে লণ্ড্রির হিশেব। হিরণের একটা প্যান্টের কোনও হদিশ নেই দু মাস, একটা সিল্কের শাড়ির আঁচলে এক ইঞ্চি ছেঁড়ার জন্য রিপুর দাম হিশেবে চার টাকা বিল থেকে কাটা যাবে, কিস্তিতে শাড়ি আর স্টেনলেস স্টিলের বাসন কেনার টুকিটাকি অংক, কিছু ঠিকানা, ফোন নম্বর, বাবার মৃত্যুতিথি এ সব কিছু ঐ ডায়েরিতে আছে। আর কেউ তার পাঠোদ্ধার করতে পারবে না এমন সাংকেতিকভাবে লিখে রেখেছে রাকা। আর টুম্পা! কত ছোট। এ সব কিছু নয়? ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে রাকা। আর তখন একটু একটু করে মনে হয় এ যেন আর কার বাড়িতে সে ঢুকে পড়েছে। এ সব তার নয়, ছিলো না কখনও। মানুষ যেমন প্লাটফরমে এসে গুছিয়ে বসে, অথচ জানে এ সব লোকজন, ঘড়ি, বেঞ্চ কিছুই তাকে ধরে রাখতে পারবে না, তেমনি যেন হতে লাগলো। দূরে যেন ট্রেনের হুইসেলে টনটন করে উঠলো বুকের ভিতরটা, যেন কতগুলো শিকড়ের সূক্ষ্ম তন্তু ছিঁড়ে যাচ্ছে, টান লাগছে, দু'চোখ বেয়ে জল নেমে এল রাকার। অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন মনে হতে লাগলো সব। এই খাওয়া-দাওয়া, একসঙ্গে থাকা, ঘুমোনো, রাগ-ভালোবাসা, এই নির্ভরতা আর ক্লান্তি, এই অভ্যেস আর আশ্রয় এর মধ্যে মিশে থেকেছে যে রাকা, হিরণের বউ, টুম্পার মা, বিমলের দিদি, (বিমল গতমাসেও চিঠি দেয়নি ভিলাই থেকে), রেণুকার মেয়ে (মার প্রেসার খুব বেড়েছিল যে, নইলে এ মাসে একবার আসবার কথা আছে), তাকে যেন অন্য কেউ বলে মনে হচ্ছে। যেন সে একটা সিনেমার দৃশ্যে ঢুকে পড়েছে দর্শক হিশেবে। চেনা চেনা সবই, কিন্তু এসব তার নয়। তার জন্য তবে কি অপেক্ষা করে আছে মুক্তি? যা এসব কিছুর থেকেও স্বাদু, এসব কিছুর থেকে অন্যরকম, আরো ভালো? আরো নতুন। কি করে তমাল সেই মুক্তি তাকে দেবে? দেখতে ইচ্ছে করে। ঘুম, ঘুম পাচ্ছে তার, আঃ যন্ত্রণাটা, সেই যন্ত্রণাটা···এরই মধ্যে ক্যালেণ্ডারে চোখ পড়ে। একটা পাহাড়ি পথের দৃশ্য। যেন তার ভাগ্য যেন দূরের ইশারা। দূরে বরফে ঢাকা পাহাড়। পথের দুদিকে পাইন দেওদারের বীথি। জানুয়ারি মাস। আজ সাতুই। যেন জন্মান্তরের স্মৃতি একটু একটু করে মনে পড়ছে। আজ তাদের বিবাহ-বার্ষিকী। গতবছরও দুপুর থেকে ঘর সাজিয়েছিল। খাবার তৈরি করেছিল। ফুল কিনতে বেরিয়েছিল

চারটে নাগাদ। হিরণ তো আর সাতটা আটটার আগে ফেরে না। মনে আছে কি না আজকের দিনটা, তাই-বা কে জানে!

ফুলের দোকানে ভিড় নেই। লাল গোলাপ বেছে বেছে রাখছিল রাকা। খুব কাছে চলে এসেছে ছেলেটি। 'লাল গোলাপ তুমি খুব ভালোবাসো না?'

'তাতে আপনার কি মশাই?'

'না. আজ যখন সন্ধেবেলা সাজবে, আর খোঁপায় লাল গোলাপ পরবে, তখন জেনো আমার জন্যই তুমিই সেজেছ। আমি ঠিক তোমাকে দেখবো।' এত সহজে তুমি বলতে পারে অচেনা মানুষ!

'অদ্ভুত। কি করে?'

'যেমন করে আকাশ দেখে নদীকে! কি করে লুকোবে তুমি? আমি সবসময় তোমাকে লক্ষ করছি।'

গম্ভীর হয় রাকা। 'পথ ছাড়ুন।'

কোনো অসভ্যতা করেনি তমাল, তখনও। বদমায়েস লোভী ছেলেদের শায়েস্তা করতে রাকা জানে। কিন্তু এ সে রকম নয়। এ ভিখিরি নয়, এ দস্যু। প্রবল। এ কামুক নয়। প্রেমিক। ··· আহ্ আর পারছে না সে, এক বছর ধরে নিজের সঙ্গে এই ধস্তাধস্তি···ছুটি চাই, বিশ্রাম চাই, মুক্তি, হ্যাঁ, মুক্তি চাই তার। এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠলো? একবার নয়। একবার ঘণ্টা বাজায় তমাল। —'সুযোগ যেমন একবারই ডাকে, বারবার নয়, আমি তোমার সুযোগ, আমি একবার ডাকলেই তুমি আসবে।' হিরণ বাজায় দু'বার। সামান্য আত্ম-বিশ্বাসের অভাব। চায়ে চিনি মেশাতে চামচের শব্দ করে। কিন্তু এ আর কেউ, বারবার ঘণ্টা বাজাচ্ছে। আর কে? এমন সময় তো হিরণের ফেরার কথা নয়। উঠতে পারছে না রাকা, সমস্ত শরীর অবশ, এই শীতেও ঘামে ভিজে গেছে বুকের অন্তর্বাস। দরজা খুলে দিল রাকা। 'ওমা, তুমি?' হিরণ। হাতে ফুল। আর একটা প্যাকেট। এই তো নিয়ম, এই তো স্বাভাবিক। ঘর সংসারী মানুষ এ রকমই তো করে। মনে পড়লো আজ তাদের বিবাহ-বার্ষিকী।

কথা বলতে বলতে রাকা চিনেমাটির ভাঙা টুকরোগুলো তুলে নিয়েছে। মুছে নিয়েছে মেঝের গড়িয়ে পড়া চায়ের দাগ। কোলে তুলে নিয়েছে টুম্পাকে। ভয় পেয়ে কাঁদছিল মেয়েটা। শান্ত করলো তাকে। এক ফাঁকে উঠে টেপ-রেকর্ডারের ঘসটানো শব্দটা বন্ধ করে দিয়ে জেলে দিল ঘরের আলো। শীতের সন্ধ্যা কখন

গাঢ় হয়ে দু'জনের মাঝখানে দুলছিল, আলো জ্বালতেই বদলে গেল ঘরের চেহারা।

রাকা বলল : 'তুমি আমার ওপর রাগ করো না গো। টুম্পাকে একটু ধরো, আমি চা করে আনছি। আজকের দিনে ঝগড়া করতে নেই। সব ঝগড়া আমি মিটিয়ে নেব।' টুম্পাকে হিরণের কোলে বসিয়ে দিয়ে রান্নাঘরে গেল রাকা।

গলির ওপারে হলুদ বাড়িতে একটি মেয়ে থাকে। বছর কুড়ি বাইশ বয়েস। ভারি সুন্দর তার চোখ দুটো। দোতলার বারান্দায় সে বসে থাকে আর গ্রিলের মধ্যে দিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখে রাস্তার মানুষজন, গাড়ি ঘোড়া—শবযাত্রা, মিছিল, বাচ্চাদের প্রভাত-ফেরি। ওর দুটো পা-ই অকেজো। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। সেই মেয়েটির চোখ দিয়ে যেন হিরণ আজ রাকাকে দেখছ। ওকে আর ছোঁয়া যাবে না। ওর সঙ্গে মিলবে না আর তার চলার ছন্দ। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের ঝড়ে তোলপাড় হতে থাকে তার বুকের ভিতরটা।

'নাও, খেয়ে নাও চা-টা। অত রাগ করতে নেই। দেখলে তো, একটা কাপ ভাঙলেও আর একটা কাপে চা খাওয়া যায়!' শাড়ির প্যাকেটটা নিয়ে শোবার ঘরে চলে যায় রাকা। বাসন্তী রঙের সিল্কের শাড়িতে মানিয়েছে ওকে খুব। এসে পাশে বসলো হিরণের।

'সত্যি, তুমি চলে যাবে রাকা? মন স্থির করে ফেলেছ?'

'হ্যাঁ। আমি তো করিনি। তমাল করেছে। আমি মেনে নিয়েছি। বেশ তো কাটালাম তোমাদের নিয়ে একটা জীবন। এবার অন্যটাও চেখে দেখি।'

'কতটুকু জানো তুমি ঐ লোকটার?'

'বেশি জানি না। আমি তো আর এ রকম একটা সংসার করতে যাচ্ছি না। হিশেবপত্র করিনি তাই। আমাকে তমাল মুক্তি দেবে বলেছে। সমস্ত বাঁধন থেকে মুক্তি।

'ও সব বড় বড় কথা। বাজে কথা। ওতেই তুমি ভুলে গেলে!'

'থাক ও সব কথা। আজই তো যাচ্ছি না।' আদুরে গলায় বলল রাকা : যাবার সময় এই নতুন শাড়িটা পরে যাবো। আর সব কিছু, আমার টুম্পাকেও রেখে যাবো তোমার কাছে। চলো, আজকের দিনে আর কোন ঝগড়া নয়। এই দিনটা আর তো ফিরবে না কোনদিন···'

বলতে বলতে আষাঢ় আকাশের মত কেঁদে ফেলল রাকা। টুম্পা চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বলল : কাঁদে না মা-মণি, কাঁদে না। যত বলে, কাঁদেও তত নিজে। হিরণ রাকার এলিয়ে পড়া হাতখানি তুলে নিয়ে বলল : 'বেশ, তুমি যা

চাইছ তাই হবে।' ঠিক সেই সময় বেজে উঠল কলিংবেল। একবার। 'কে?' উঠতে গেল হিরণ। হাত ধরে টানলো রাকা। 'থাক।' আহ্, সেই তীব্র যন্ত্রণাটা···। দরজা তো খুলতেই হবে, এক সময় না এক সময়। 'ফুলদানিটা নিয়ে এসো না।' হিরণ ফুলদানি নিয়ে এল। রাকা শালপাতার বাঁধন থেকে খুলে একটা একটা করে সাজিয়ে রাখতে লাগলো ফুল। আবার বেজে উঠলো কলিংবেল। 'আহ্,' বিরক্ত হলো হিরণ। রাকা ফুলদানিটা ঘরের মাঝখানে ছোট টেবিলের ওপর বসিয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

'লুকুবো না। আজ আমাদের উৎসবে একজন নতুন অতিথি আসবে।' যেন কত দোষ করেছে সে এমন শোনালো তার গলা, 'তুমি রাগ করো না। আজ আমি তমালকে আসতে বলেছিলাম।'

রাকার সেই দুর্লভ হাসির বিষ এক মুহূর্তে শূন্য, নষ্ট করে দিল হিরণের ফ্ল্যাট-বাড়ি, তার এত কষ্টের সাজানো সংসার। একরাশ মিহি ছাই যেন উড়তে লাগলো বাতাসে, সারা ঘরে, চোখে মুখে, চুলের মধ্যে।

মেলায় মানুষের রক্ত

কমল চক্রবর্তী

দেবতার গ্রাস

পরপর তিনদিন বৃষ্টি হওয়াতে আজ সকাল থেকে আকাশ ঝকঝকে। তবু কিছু মেঘ কালাঝোর, কানাইশর পাহাড়ের মুণ্ডুতে আটকে। কিছু রুয়াম পাহাড়ের শালের জঙ্গলে। শরতের এই সময়টা বৃষ্টি হলে মন খুশী হবেই। মুসা আল ধরে হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝে চারধারে তাকাচ্ছে। ধান চারার নবীন যৌবন, সূর্য লাগা সবুজ তিড়িং বিড়িং করে তাড়ছে। গাছপালা ধান ক্ষেত থেকে একটা সবুজ ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছিল।

ষাট পেরিয়ে গেলেও মাথায় ঝাঁকড়া চুল। করঞ্জ তেলে চকচকে। নিম কাঠিতে দাঁত সাদা ঝকঝকে। চামড়া নিম তেলে খয়েরী কালো মেশানো গাঢ় কফি রঙে ট্যান। এমন নয় যে মুসা একাই সুন্দর, এই সব তেলাইপাট, ধাতকিটি, ঘিকুলহি, ইচাবনীতে এরকম সুন্দর সুঠাম মানুষ এখনও কিছু কিছু বিজাশাল, নিম, পরাশী হয়ে রয়ে গেছে। এখনও কিছু কিছু হরতুকি, বহেরা মহুল।

মুসা হাঁটতে হাঁটতে সুবর্ণরেখার দিকে এগোচ্ছিল। ক্ষেতে মেয়ে-মুনিষ ভাতুয়া কাজে ব্যস্ত। গাছ-গাছড়ার ফাঁক দিয়ে প্রথমে নজরে এল রাজবাড়ি। ভাঙা খিলান গম্বুজ তারই মধ্যে খানিকটা জোড়াতাপ্পি দিয়ে টিঁকে থাকার চেষ্টা। রাজবাড়ি থেকে চোখ ঘোরালে রঙ্কিনী মন্দির। পোড়ামাটির বিশাল নবরত্ন মন্দির ছিল, আজ আর সব চুড়ো অবশিষ্ট নেই। শেষ গোটা পাঁচেক, যার দুটি যে কোনদিন কোন দর্শনার্থীর ভবলীলা সাঙ্গ করবে।

মন্দিরে দৃষ্টি যেতে মুসার চোখ বাঘের মত জলে উঠল। মনে হল দেবী মহাভোজ চায়, তাই মানুষের এত কষ্ট। বাপ-ঠাকুর্দার মুখে শুনেছে, এক সময় রঙ্কিনী মন্দিরে জিতুয়া অষ্টমীতে মানুষ বলি হত। মাত্র ষাট-সত্তর বছর আগের কথা। কাঁড়া বলি হতই তবে সাত-আট বছরের শিশু বলি প্রশস্ত ছিল। তখন রাজাদের রমরমা। ফি দিন হরিণ খরগোশ বনবরার মাংস হত। বাড়ির কাছে বাঘ ডাকত। কি জঙ্গল! মানুষের রক্তে ধরিত্রী সর্বদা তৃপ্ত হয়েছে। অথচ রুপণ চতুর মানুষ পশুপাখি বলি দিয়ে কাজ সারতে শিখেছে। পায়রা, তিতির

খুখরা, পাঁটা এসব ঘুস। এতে হয় না। মুসা জানে রঙ্কিনী বহুদিন ধরে অভুক্ত, সে প্রধান পুরোহিতের কাছে মানুষ চাইছে। সরল, নরম, নিবেদিত একটা ছ-সাত বছরের শিশু যে এখনও শরীরের মধ্যে বিষ মেশাতে শেখেনি। রঙ্কিনী মানুষের রক্ত চায়। নিষ্পাপ নরম শিশু।

মুসার মনে হল মন্দিরের চুড়ো থেকে কঙ্কালসার দেবীর দুই হাত তার দিকে বাড়ানো। সবুজ গাছপালা, পেছনে নীল পাহাড়, তার মাঝখানে দুটো সাদা রক্তমাংসহীন জীর্ণ শীর্ণ হাত। মুসাকে ডাকে। মুসা জানে এখন এত সৎ আন্তরিক মানুষ এদেশে পাওয়া যাবে না যে নিজের ছেলেকে রঙ্কিনী মন্দিরে বলির জন্য নিবেদন করবে। এরা বাচ্চাকে খেতে দিতে পারে না। চোর ছ্যাঁচোড় হয়ে যাচ্ছে। কত ছেলে আট দশ বছর থেকে বেগারে নাম লিখিয়েছে। কত ছেলে গ্রাম ছেড়ে টাটা, চাইবাসা, রাঁচি চা-দোকানে, বাবুর বাড়িতে বাসন মাজতে চলে গেছে। তবু শুয়োরের জাত বলির জন্য একটা শুয়োর তুলে দেবে না। অথচ পেলে সবার মঙ্গল হত। আজ ষাট সত্তর বছর ধরে কেবল কাঁড়ার রক্ত, ছিঃ ছিঃ। সমস্ত দেশচার, লোকাচার ব্যবস্থার উপর মুসার ঘৃণা হল। থুঃ থুঃ।

মাত্র কিছুদিন আগে রাজবাড়িতে চুরি হয়ে গেছে। শেষ সম্পদ। ডাকাতের আর কি দোষ, সে রমরমা তো আর নেই। এতদিন যে চুরি হয়নি সে তো ভাগ্য। কারণ, কে কাকে পাহারা দেয়? রাজবাড়ির তো আর তাকত নেই। পুলিশ! ঘৃণায় মুসার চোখ জলে উঠল। পুলিশ সুপার বলেছে, ওসব হীরে জহরত যেখানে মানায় সেখানেই গেছে। যে সামাল দিতে পারে মাল তো তার কাছেই থাকবে। পড়ত মুসার হাতে, ডাকাতের গলা ধড় থেকে নামিয়ে দিত। যেভাবে গত চল্লিশ বছর ধরে বিন্ধ্যায় কাঁড়া নামিয়েছে। রাজা কেঁদে কেঁদে বলেছিল, 'সব নাও মুকুটটা নিও না, এ আমাদের শেষ সম্বল, বংশের গৌরব।' অমন ডাকসাইটে রাজা একজন লিকপিকে গুণ্ডার সামনে হাঁটু মুড়ে কাঁদছে। গুণ্ডা বলল, 'মুকুট তো নেবই, এতেই সব থেকে বেশী টাকা আসবে, কত দামী দামী মুক্তা বসানো। অত যদি কষ্ট হয় তবে মুকুট ধারণ করার জায়গাটাই কেটে ফেলি।' ভোজালি দিয়ে রাজার গলা উড়িয়ে দেয় প্রায়। রাজা রাণী ছেলেপুলে নিয়ে এক কোনায় কেঁদে কেঁদে রক্ষন ভগবানকে ডাকল, এ কি করলে ভগবান, এ কি করলে! রাজার ঐশ্বর্যের সঙ্গে ভগবানের সোনাদানাও ডাকাত পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে।

এ সমস্ত ব্যাধির চিকিৎসা মুসা জানে। ক্ষয়িষ্ণু এই পাহাড়ী রাজবাড়ির

একমাত্র দেবী, জাগ্রত। তাকে মানুষের রক্তে স্নান করাতে হবে। ভোগ দিতে হবে। মুসা ভাবল সে চুরি করবে। যে সব বাগাল ছানারা সুবর্ণরেখার ধারে ধারে সারাদিন গরু মোষ ছাগল চরায়, তাদের বয়েস আট দশের বেশী নয়। কচি ছেলের রক্ত খুব জরুরি। মুসা গত চল্লিশ বছর ধরে জিতুয়া অষ্টমীর দিন কাঁড়ার রক্তে নেচে উঠেছে। আজ যখন সব যেতে বসেছে তার মনে পড়ে গেল বাপ-ঠাকুর্দার কথা, রক্ষনের মানুষের রক্ত চাই। ইংরাজ বন্ধ করল তবে দেশে এত পাপ। মুসা দেবীর জন্য মানুষ ভোগ চুরি করবে।

রোদ থাকলেও কখন ধাঁ করে এক টুকরো পাহাড়ী মেঘ ধানক্ষেতে ছায়া না ফেলে ঝিরঝির বৃষ্টি দিয়ে গেল। কিছুক্ষণ। শালবনের সবুজের ওপরে চিমনি ছাড়া বেগুনী ধোঁয়া। সে দুপুরের স্নান করার জন্য নদীর দিকে এগোয়। এই সময় জল ঘোলা, বর্ষার তোড়ে কাদা গুলে গুলে হা হা ছুটছে। অনেক দূর থেকে শব্দ পাওয়া যায়। নদীর বুকে কালো পাথরের মেঘগুলো সব ডুবে গেছে। ডাহি সবুজ ঘাসে মোলায়েম। রোদের এত তেজ যে কিছু আগের বৃষ্টির যে ফোঁটা মুসার ঝাকড়া চুলে, ঢাল পিঠে, ঈষৎ ঝুঁকে পড়া নির্লোম বুকে পড়েছিল শুকিয়ে যায়। এখন পিঠ চটচট করে।

—'হেই খুড়া,' বিকেলে রঘুর দোকানে, আরও কিছু দূরের আল দিয়ে স্মৃতি-কণ্ঠ গোপ ছাতা বগলে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে, 'পাঁচটায় হে পাঁচটায়,' পাঁচ আঙুল নাচিয়ে দেখাল।

—হঁ রে, মুসা দেখে স্মৃতিকণ্ঠ অনেক দূরে চলে গেছে। অথচ তার সেই খুব সাধারণভাবে 'হঁ রে' উচ্চারণ আশপাশের পাহাড়ে, নদীতে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসছে। বিস্মিত চোখে চিরকালের দেখা গিরি-প্রণালীর দিকে তাকায়। বিকেলে আজ বিন্ধ্যা নিয়ে কথা হবে। মেলা, পুজো, খরচখরচা। কাঁড়া কিনা হয়ে গেছে। কিন্তু সে কি বলবে? বরাভূমের নাচনি না খরসোয়ানের নাচনি, কোন গাঁ ইবার কাঁড়ার মুড়া নিবে, কাদের ভাগ্যে ধড়, ব্যাস এই তো কথা। কিন্তু কেউ তো বলবে না একটা খোকা জোগাড় কর। সব তো শেষ হতে বসেছে। রাজা, রাজবাড়ি, রাজধন সব তো গেল। এবার এই সমাজ, মন্দির সব যাবে। কে বুঝবে যে একটা খোকার কি কিছু দাম আছে? কিন্তু যদি এই সমাজ শেষ হয় তবে কি থাকে? পাথর কেটে কেটে কোয়ারি হয়ে যাচ্ছে, চিমনি চিমনিতে শালবন যুদ্ধক্ষেত্র। নদীর জলে কুম্পানির বিষ। মাছ মরে যায়। ব্যাঙ পোকামাকড়ও বাঁচে না। আমাই নগরের ধীবররা, মাঝিরা আর নদীতে মাছ ধরে না। দূরে

দূরে বিলে চলে যায়, জন খাটে। আগে বর্ষার নদীতে ইলিশ পাওয়া যেত, পাবদা উঠত, ইয়া মোটা মোটা চিংড়ি। সব শেষ হে বাবু, ধানক্ষেত কালা চিমটা মারা। এসব বিচার কে করবে? বিডিও আপিস বিলাইতি সার দিচ্ছে, শালা ঘন্টা হবেক।

মুসা জানে, বিকালে যাত্রাগান নিয়ে কথা উঠবে, কিন্তু কে বুঝবে খোকা চাই। মা রক্ষন মানুষ ছানার রক্ত খুঁজছে। বিকেলে কথা হবে, খুখরা পাড়ার জন্য কতয় নিলাম হবে, হাস্কা-ডাস্কার বোর্ড কত টাকার দেওয়া যায়।

মুসা নদীর জলে নামল, ঘোলা জল মুখে নিয়ে কুলকুচি করল। এখনও ধীবরদের মেয়েরা পাটায় বালি তুলে তুলে সোনার জন্য চেলে যাচ্ছে। ওপার থেকে গরু, ছাগল, মুরগি নিয়ে নৌকা পার হল। অনেক লোকজন। সব বাজারে যাচ্ছে। যাবার সময় অনেকেই মুসাকে জানান দিয়ে যায়, 'হেই খুড়া ভাল,' 'হেই খুড়া বিন্ধ্যা কবে?' এইসব গ্রাম সম্পর্কের শ্রদ্ধা।

স্নান করে ফিরতে ফিরতে বেলা হয়ে যায়। বাবলা গাছের হলুদ ফুলের ফোটা, বেগুনা নীল নীল ফুটফুটি। সমস্ত জগৎ একটা নীরব ছাতার নীচে। কপালে সিঁদুরের টিপ বিন্ধ্যা বলির জন্য কেনা কাঁড়াটি আরও অন্য গরু ছাগলের সঙ্গে মাঠে চরছে। দু'তিনটে বাগাল ছানা দূরে পাথর চোট খেলতে ব্যস্ত। তাদের মধ্যে সাবির ছেলে নুনা। সাবি বছর চারেক পর বাপের ঘর এসেছে বিন্ধ্যা দেখবে বলে। আসানবনীতে এ পরব হয় না। বড় মিনমিনা গাঁ। সাবির সঙ্গে এনেছে দু'ছেলে। বড় ছেলে নুনা আট বছরের। কুলহির অন্য বাগাল ছানাদের সঙ্গে গরু চরাতে এসে, এখন মাঠে, পাথর চোট খেলছে। ছেলেটি ফনফনে, ছটফটে, বলে, দাদা তুমাদের বিন্ধ্যা দেখব, রাজা দেখব, আমাদের নাই। মহুল খায়ে নাচব, তীর চালাব। আট বছরের কথা শুন!

হঁ, তবে বিন্ধ্যা দেখাব। মুসার চোখ কড়কড় করছে। তার মাথায় রক্ত খেলে যায়। জিতুয়ার দিন রক্ষন-মন্দিরে কতকাল পরে মানুষের রক্ত পড়েছে মহাভোজ। পাহাড়ী মা খুশী হয়ে সমস্ত সবুজ পাহাড়, রাজমুকুট, নবরত্ন মন্দির, নদীতে খেয়ে যাওয়া রাজবাড়ি সব ফিরিয়ে দিয়েছে। মুসার হাতে রক্তমাখা খাঁড়া লেলে লেলে করে ফেঁপে যায়। একদিকে মোষের মুণ্ড, অন্যদিকে খোকার।

সে হঠাৎ ধানক্ষেতের আলে দাঁড়িয়ে, ওপরে নীল, চীৎকার দেয়-আ-আ-আ-আ-রে-রে-। একপাল হরিয়াল মুহূর্তে ঘাস পোকা ছেড়ে দিয়ে উড়ে যায়। জমাট নীরবতায় শুধু ভীম দত্তের ডিজেল পাম্প ডিগ্ ডিগ্ ডিগ্ ডিগ্। পাহাড়ে চোট খাওয়া প্রতিধ্বনি ফেরে—রে-রে-রে-রে আ-আ-।

মেলা যখন জমল :

কট কট করে ব্যাঙ ঘুরছে। গাঁয়ের নিজস্ব ধামসা, সানাই এসেছে। পেঁ-পেঁ-পোঁ-পোঁ সানাই বেজেই চলেছে। আর মাঝে মাঝে ধামসার ধাম্ ধু দুম্ ধৈ। মহুয়ায় আক্রান্ত বাজিয়ে তিন-চারজন ডিং লা লা ডিং মুখে আওয়াজ দিচ্ছে। রঙ্কন মন্দিরের চাতাল আশপাশের অন্ধকারে তালপাতার ছাউনি, পাশের মাঠে সব জমে লাশ।

দুপুর থেকে খেপে খেপে মেলা জমছে। দুপুরে এক পরস্থ পাশের মাঠে খুখরা নিয়ে লড়ালড়ি। এক পরস্থ হাঁড়িয়ার জালা শেষ হলে, আবার নতুন মাল এসে পড়ে। মদের কমি নেই। মহুয়া, হাঁড়িয়া সে তো এখানকার আকাশে বাতাসে সর্বক্ষণ। আজকাল রংচিং-গারা তুরন্ত নেশা করার জন্য টাউনের সন্তারা, পাক্কি চালিয়ে দেয়। পুরোনো মদ্যপেরা অবশ্য টাউনের মালে আশা রাখে না।

নকুল মহাতোর দল বরাভূম থেকে এসেছে। দারুণ নাচনি। একসময় নাচনি মেয়ে দুটো মেলা দেখতে বেরিয়েছিল, তাতেই মেলার অর্ধেক জান হাপিস। পেছনে ছেলেদের টুকরো উল্লাস। এসব অবশ্য নাচের অঙ্গ। যেখানে যত উত্তেজিত পাবলিক, সেখানে নাচগান তত জমে। নাচ আরম্ভ হতে হতে রাত একটা বাজবে। কারণ কাড়া বলি, পাঁঠা বলি হতে হতে বারোটা। বলি হয়ে যাবার পর সমস্ত মেলায় এক ধরনের মজার হাওয়া খেলে যায়। বেহুঁশ মদ খাওয়াখায়িই চলে। মদ্যপদের শোরগোল। শেষে তামাসা আরম্ভ।

বৃষ্টিভেজা মাটি গর্তে খানায় জল জমে। বিনুধা পরবে বৃষ্টি হওয়া শুভ। প্রত্যেক বছরই। শরতের খেয়ালী মেঘ, পাহাড়, অষ্টমীর চাঁদ, হাওয়ায় নড়েচড়ে বেড়ানো নক্ষত্র নীলিমা। শাল অর্জুনের বনে রহস্যময় নাচানাচি।

মন্দির প্রাঙ্গণ ঘিরে জটলা বহুদূর অবধি ছড়াতে থাকে। ধানখেত অবধি। কখন পার হয়ে যায়। যেখানে এখন সবুজ সীতাশাল, রামশাল তারাকাটা ধানের উচ্ছ্বাস। খোড় দুধে টুসটুস। একটু বাইরে জুয়ার আসর। মদের আসর ছেড়ে দু-কদম, তালদীঘি, অন্ধকারে দীঘির পাড়ে যৌবনের জোয়ার। একধারে অনেক গরুর গাড়ি পরপর। আশেপাশে বাঁধা বলদ। কালাঝোর থেকে মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা ভেজা হাওয়া। ছুটন্ত শেয়ালের পাল। আর কিছু দূরে পরিতৃপ্ত নদী সুবর্ণরেখা শরতের চাঁদে মোহিনী। গন্ধে ভরে যায় চরাচর, জংলী ফুল। মেটে ঘরের দাওয়ায় বসে নেশা-জব্দ বৃদ্ধ গান গায়। আর বিহারী কালিন্দী যে কিনা মেলায় গান গেয়ে

ভিক্ষে করে, সে রাত জেগে কেঁদ্রিতে কান্না তোলে, 'সজনী দুখের নিশি পোভাত হইয়েছে।'

অনেকদিন পরে এই মেলায় সাবি, নুনা বেটার হাত ধরে বেড়াতে এসেছে। নুনা নতুন জামা প্যান্ট, মাথায় চকচকে সরষের তেল, পকেটে খুচরো। মুসা মন্দিরে ওকে ডেকে কপালে সিঁদুরের টিকা লাগিয়ে দিয়েছে। ভেতরে সবার যাওয়া নিষেধ। তবে আজকের পরবে মুসাই সব। সে যেখানে খুশি যেতে পারে। ফলে নুনাকে ডেকে বলল, বেটা যখন হক চলে আসিস, মিঠাই দুব। মাকে বলবি না একাই আসবি।

সাবি মেলা থেকে চুড়ি কিনবে। তবে তার প্রাক্তন প্রেমিকদের দু-একজন তাকে তাতিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। ফলে সঙ্গে তার ছেলে প্রায়ই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য সাবি একথা জানে যে নুনা যদি ভিড়ে সত্যি সত্যি কোন কারণে এদিক সেদিক হয়ে যায়, হারাবে না। সে বাড়ি চেনে এমনকি যদি না চেনে মুসার নাম বললে তাকে যে কোন অন্ধও চোখ বুজে বাড়ি পৌঁছে দেবে। তাছাড়া মন্দির থেকে বাড়ি বড়জোর একশ কদম, তার বেশি তো নয়। ফলে নিশ্চিন্ত সাবি খানিকটা উত্তেজিত হবার জন্য ব্যস্ত। সে তো চাইছেই তার প্রাক্তন প্রেমিকরা তাকে নিয়ে নানা ধরনের তামাসা করুক। এক আধটা আয়না চিরুণ, ফিতে, চুড়ি বা সেফটিপিন, ছোটজামা কিনে দিক। এ সমস্ত ভাবতে গিয়ে তার কোনো-রকম ভয় বা ভাবনা হয় না। কারণ সে ছোটবেলা থেকেই দেখেছে মেলাগুলি সেই ভাবেই সাজানো হয়। আর তবে মেলা হয় কেন? শুধুই নাচ গান হল্লা করার জন্য নাকি? আজ সব ফ্রী ইণ্ডিয়া।

মন্দিরের হাতা বাঁশ দিয়ে ঘেরা। একটা চৌখুপি জায়গা। মন্দির থেকে সোজা হাতায় ঢুকে যাবার রাস্তা। মন্দির থেকে কুড়ি পঁচিশ হাত দূরে, যেখানে বলি হবে। পাঁচটা হাঁড়িকাঠ। চার কোণে চারটা ছোট পাঁঠার মাঝে একটা বিশাল হাঁ, কাঁড়া বলির। পাশেই দড়ি দিয়ে বাঁধা চারটি পাঁঠা একটা কাঁড়া। তখনও দাঁড়িয়ে, বসে, শুকনো খড়, সবুজ পাতা মুখে। চাতাল ঘিরে ভিড়। নানা বয়েসি। মেয়েরা সবাই। যারা বাপের ঘরে এসেছে, তাদের কথা ফুরোয় না। সবাই অপেক্ষা করে কখন বলি হবে।

আকাশ ভরা মেঘ। বৃষ্টি হবে হবে অবস্থা। বিদ্যুৎ অনেক দূরে। অল্প মেঘের গর্জন। গুড়গুড় শব্দ নদীর ওপার থেকে রুয়াম জঙ্গলের দিকে ঢুকে যায়। দূরের লোকজন ছাতা নিয়ে এসেছে। চাতালের সামনে, শালপাতা পেতে বসেছে।

দীনু ভকত মাঝে মাঝে রোলা থেকে ডে-লাইট নামিয়ে হাই হাই করে হাওয়া ঠুসে দিচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ সমস্ত ছাপিয়ে ভেসে আসে মণ্ডপের হেঁড়ে গলা, লাল সালুকের ফুইল ব-ন-ধু—ফুইটে আধা রাইতে।

বটে আধা রাত। কিছু আগে ইসটিশান দাপিয়ে টুয়েন্টি নাইন আপ এ তল্লাট ছেড়ে গেছে। বহুদূর থেকে আসা-যাওয়া শোনা যায়। তার মানে গাদি ডাইন গনগনির ডাঙায়, কাঁটা কোমরে বাঁধা, উল্টো হয়ে নাচানাচি আরম্ভ করে দিয়েছে। ডমন মহাতোর দশ মাসের মরা খোকাকে এখন সে বাঁচাবে। শুধু তাই নয় বেঁচে থাকলে খোকার বয়েস হত ষোলো, প্রায় পনের বছর আগে এক বর্ষা মুখর রাতে খোকাটি ঝরে যায়। গাদি ডাইনী খোকাকে ষোলো বছরের জুয়ান করে, তবে তাকে নিয়ে যৌনক্রীড়া আরম্ভ করবে। এখন গনগনির ডাঙায় একটা মোম জলে। উট আসলে হাতের উপরে ভর দিয়ে নাচা ডাইনীর পাছায় বসানো। আধা রাত যখন লাল শালুক ফুটবেই। এদিকে শরতেও খুব একটা পদ্ম হয় না। ফলে লাল নীল গেরুয়া শালুকে বর্ণময় আধারাত।

নুনা একা ঘুরে বেড়ায়। হয়ত কিছু পরে মুসা দাদার কাছে মন্দিরে যাবে। কারণ তার মা সাবি এখন লাল শালুক। একে অনেকদিন পরে বাপের ঘর ফিরেছে, আর হয় এখন আধা রাত। এখন শালুক ফোটার সময়। পাহাড়ি হাওয়া। শালুক ঠিক করতে পারে না আড়ালে দাঁড়িয়ে একটু মহুয়া খাবে কিনা। তার প্রাণ চায় একটু সমাচারহীন নির্ভাবনায় ভেসে থাকে। মাত্র কিছু আগে যখন লাতার কুল্হির জগন্নাথের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের পর হাসি তামাসা শুরু করেছে, বারবার হাতের চুড়ির কাচ ঘুরাচ্ছে তখন এক ফাঁকে নুনা ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। সে ভাবে না কারণ জায়গা এত ছোটো যে শিশু হারিয়ে যাওয়ার খবর কখনও পায়নি বরং জুয়ান মুনিষ কাঁড়া হারিয়ে যাবার খবর তো লেগেই থাকে। ফলে সে নিশ্চিন্ত।

মাঝি পাড়ার ছেলেমেয়েরা যে কোন উৎসবের জন্য ওৎ পেতেই থাকে। ওদের হাসি এবং যৌবন পাহাড়ি মেলার চেহারা পাল্টে দেয়। আসলে যৌবনের যে পরিমাণ খরচ করলে পৃথিবী সুন্দর হয়ে ওঠে মাঝি পাড়ার ছেলেমেয়েরা তার থেকেও কিছু বেশি উদার। যারা হাঁড়িয়া মহুয়া নিয়ে বসেছে তারাও মাঝি পাড়ার মেয়ে। মাথায় গোঁজা গাঁদা ফুল। হাব্বা ডাব্বার বোর্ড থেকে মাঝে মাঝে উল্লাস। একটা কেনাকাটার ব্যাপার থেকেই যায়। যে সব ফিতে বা রবারের জুতো, গুলগুলা বা জিলিপি ভাজা হচ্ছে সেসব অন্য সময় যে পাওয়া যায় না তা নয়, তবু মেলায়

কেনার আনন্দ। এবার মেলায় দুটো নতুন সংযোজন। এক, জন্মনিয়ন্ত্রণ, দুই, রাজ্য লটারীর টিকিট। জন্মনিয়ন্ত্রণের চকচকে বাবুটি দু-তিনটে আদিবাসী সাগরেদ নিয়ে হ্যাণ্ডবিল বিলি করে যায়। একটু দূরে দাঁড়ান তিন চারজন আদিবাসী যুবতী জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে খুব মজা পেয়ে খিলখিল করে হাসতে থাকে।

সাবি অনেকদিন পর তার গ্রামে ফিরেছে। তার শরীর স্বাস্থ্য পরিণত। এবং জঙ্গুলে হাওয়ায় মোহিনী। সে পুরুষ বন্ধুদের খুঁজে বেড়ায়। যারা তার কৈশোর, যৌবনের দিনগুলির মর্মবাণী জানত। মেলা থেকে কয়েক কদম দূরে মাঝি পাড়া। পাড়ার পেছনে ধানখেতের ঢাল, গনগনির ডাঙা। পেরুলে সুবর্ণরেখার অশান্ত স্রোত। ব্রিজের ওপার দিয়ে চলে যাওয়া মালগাড়ি জলে ঝিকি ঝিকি ছায়া ফেলে ফেলে। সাবি দেখতে পায় যাদব আসছে। সে চোখে মুখে শরীরে ঠমক বাড়িয়ে ডাকে।

—কি গো বাবু কেমন আছ? সাবির চোখের কাঁচ থেকে আলো ঠিকরোয়।

—কবে আসলে? যাদব প্যান্টের পকেটে বাঁ হাত ঢুকিয়ে হেলে দাঁড়ায়।

—সাতদিন হবে, শ্বশুর ঘর থেকে আসতেই দেয় না। তুমি কেমন আছ? কি করছ? কথা খুঁজে খুঁজে সাবি যাদবের আরও কাছে এগোয়। পাশ দিয়ে ঝুমঝুমি, চরকি নিয়ে ফেরিওয়ালা। হারিকেনের আলো সাবিকে আরও গোপনীয় রক্ত করে তোলে।

—সরকার খ্যাকে একটা ছো দল করল, আমি ওতেই আছি, আর টুকটাক চাষবাস। ছেলে কোথায়? একা কেন? যাদব আজও জেগে উঠতে ভয় পায়।

—ছেলে ঘুরছে, মামা ঘর এসে করে একটা মেলা দেখল, অমন আমাদের দিকে হয় না।

সাবি ঠিক জমিয়ে তুলতে পারছে না। যাদব তার প্রকাশ্য প্রেমিকের মধ্যে ছিল না, চাইত। ফলে তাকে নতুন করে বোঝাতে হবে ধানখেত, অষ্টমীর চাঁদ, গনগনির ডাঙা, রেলব্রিজের নিচে আলোছায়া, বন শিউলি, বন চালতায় পথঘাট থিকথিক। ময়না পাহাড়, ফুলডুংরি, লাকড়াডুংরি। অনেক বোঝাতে হবে। তবু ছাড়তে মন চায় না। বাপের বাড়ির যুবকরা চিরদিনই বুঝি সুন্দর। তারা ব্যর্থ অকর্মণ্য হলেও এক রহস্য, সৌন্দর্য তাদের থাকে। তারা সবাই গান বাঁধতে পারে। টুসু মেলায় যাদব, নিশাপতি, কাঁলচাঁদ কুইরি মিলে একটা দল করেছিল। হারমোনি নিয়ে মেলায় ঘুরে গানের বই বেচত। বাপের বাড়ির সুন্দর ছেলেদের সঙ্গে সাবির

ফাঁকায় দেখা হলে ভাল হত। তাদের অনেক ধান, গম, মাড়ুয়া, অড়হড়ের খবর দিতে পারত।

এই সময় কিছু চেঞ্জার এদিকে আসে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যথেষ্ট সাজ পোশাক করে মেলা দেখতে এসেছে। চেঞ্জারদের একটি বড় বড় ছেলেমেয়ে মেলানো দল হাঁড়িয়া পাড়ায় গিয়ে ঘুন্তুরের মাংস আর হাঁড়িয়া চালাচ্ছে। এবং তাদের হাসাহাসি মস্ততা এখন আর দেখার তেমন বিষয় নয়। তবে শুধু এরাই নয় আরও জনাকয়েক নানা বয়েসি, তাদের সঙ্গে ছোটরাও রয়েছে, এদিক সেদিক ঘুরছে। মোষবলি দেখবে। বোম্বাই মেঠাই টিং টিং টিং করে ঘণ্টা নাড়ল।

—আয় বরফ খাব, যাদব আন্তরিক ভাবে ডাকল।

বরফ চেঁছে গুঁড়ো করে লাল সবুজ হলুদ চিনি গোলা ঢেলে কাঠি গেঁথে দিচ্ছে। একটা যাদব, একটা সাবির হাতে।

—আমাদের শ্বশুর দেশটা ভাল না, সাবি বরফের লাল রং-এ নরম জিভ বের করে চাটছে,—মন টঁকে না, আরও কিছু থেমে ফের,—উপায় কি ?

একটা সানতাল ছেলে ভাল জুতো জামা প্যাণ্ট পরনে, চোখে গগল্‌স মাথায় সিনেমায় দেখাটুপি, মুখে সিগারেট, আর দু-তিনটে সঙ্গী নিয়ে সামনের দোকানে দাঁড়িয়ে বোতল থেকে সোজা গলায় ঢালছে আর হল্লা করছে। সাবি ছেলেটির সরু কোমরের চকচকে বেল্টে তাকিয়ে রইল। ছেলেটির অন্য হাতে সিগারেট পুড়ছে।

—ওতো থাকতেই হবে, যাদব বরফ শেষ করে বিড়ি ধরিয়েছে।

সাজাগোজা সানতাল যুবকটি এবার পাশের টারগেটে গেল। বোর্ডে লাগান গোটা কুড়ি পঁচিশ বেলুন। যুবকটি কোনো কথা না বলেই অন্য একজনের হাত হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়েছে। অদ্ভুত দেখাচ্ছে, চোখ থেকে চশমা খোলেনি। বন্দুক এক হাতে তুলে চারপাশে একবার ঘুরে দেখল, শেষে বেলুন লক্ষ্য করে হা হা হাসল, রবিনহুড !

—তোকে মাঝে মাঝে আসতে হয়। নারকু খুড়াকে দেখে না। আজকাল খুড়ার মাথার অসুখ ধরেছে। ঢের বয়েস। দেহ ঠিক থাকে না। উকে দেখার লক নাই, যাদব হুশ হুশ টানে বিড়ি শেষ করে থুথু ছিটোয়,—তোকে দেখতে হয় !

—আমি কি করব ? সাবি চিন্তিত নয়—তুমি বুড়ালক তোমার বলি দেওয়া কেন ! মানা শুনবে সে। বুড়ার সখ উ বলি দিবেই। হাত কাঁপে, ছাড়ান নাই। একটা মিঠা পান খাব, সাবি বাবার বিষয়ে আদৌ উৎসাহী নয়, সে গলায় আদর ঢেলে দিল। নাইলনের শাড়ির ভেতরে তার শরীর উত্তেজনায় ঘেমে উঠেছে।

—বটে, আমিও খাব। মাঝে দু দিন ও ঘরেই ঘুরে নাই। ঐ বারান্দায় কাটাল। রন্ধন মন্দিরের দিকে আঙুল দেখাল। পান নিয়ে এল। সাবিকে হাতে হাতে পান দিতে গিয়ে যাদবের শরীরে শিহরণ খেলে যায়। তার একটা ঝুমুর মনে পড়ে, 'হাতে হাতে পান দিতে দেইখেছে কুলহির লকে / চুন দিতে ভাস্থরে। হায় হায় কি আছে আমাদের কপালে।'

পানের পিকে তৃষিত ঠোঁট লাল করতে, সাবি দুবার জিভ দিয়ে চেটে দিল। পিক ফেলার শব্দেও খানিক আকর্ষণ মেশানো থাকে। যাদব বিড়ি ধরাল। তখন ফের সানাই তীব্র স্বরে পোঁ-ও-ও-ও বেজে উঠেছে সঙ্গে ডিং না ডিং ডিং ধমসা।

—সাবি তোর ছেলেকে দেখা হল না রে, উকে একটা গেঞ্জি কিনে দিব। তবে মাপ নিতে হয়, যাদব আন্তরিকতার সুযোগে গুটিগুটি এগোয়।

—দেখ কন জায়গায় সিনেমা টিনেমা দেখছে, বাপ কা বেটা।

কথা শেষ করে দুজনে পান চিবুতে চিবুতে আট বছরের নুনাকে খুঁজতে বেরোয়। রাত প্রায় বারোটা। প্রথম দিকে মজা, হাসাহাসি থাকলেও, শেষে খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। নুনাকে খুঁজে পায় যাওয়া না। এতক্ষণে সাবি, যাদব চেনা মুখ দেখলেই বাচ্চার শরীরের গড়ন, বয়েস সমস্ত বলে সন্ধান নিচ্ছে। এ ছেলে তো একা কোথাও চলে যাবে না। কিম্বা ছেলে হারিয়েছে এমন ঘটনা এ গাঁয়ে দু-একটির বেশি নেই। সাবি এতক্ষণে সত্যি সত্যি চিন্তিত হয়েছে—নুনার বাপ আমাকে ঘুচাবে। উ যদি হারায় তবে আমারও মরণ। সাবি একা একা মেলায় খানিক বাইরে যেখানে রাজবাড়ির ধ্বংস। তক্ষক চলাফেরা, জ্যোৎস্না, জোনাকি, বটগাছের ঝুরি পুটুশ ফুলে শিশির, বন শিউলির গন্ধে ম ম, নদীর শব্দ পাওয়া প্রান্তর। মনে পড়ে নুনার পকেটে দু-টাকার মত খুচরো ছিল। পরনে নতুন জামা প্যাণ্ট। বাবা-ই গতকাল কিনে দিয়েছে। সে ব্যাপ্ত চরাচরে হাপুস নয়নে চাইল। কোথাও কিছু দেখা যায় না। হঠাৎ নদীর ভাঙা পাড় থেকে চার পাঁচটি শহুরে যুবক যুবতী চেঞ্জার হাসতে হাসতে উঠে এল। ওদের দেখে বোঝা যায়, মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে এখন শালুক ফোটার সময়। ওদের সমস্তই বিউটিফুল, / বন, পাহাড়, ডিঙি, আদিবাসী মেয়ে, ব্রিজে আলো, মোষ বলি। ওরা চলে গেলে আরও একটা শূন্যতার বড় ঝাপট সাবির সমস্ত চেতনাকে জড় করে দেয়। তাহলে কি তার পাপেই তার নুনা হারিয়ে গেল ?

আরও খানিক এগুলে রাজবাড়ির ধ্বংস স্তূপের ভয়ঙ্করতা বহুদূর অবধি ছড়ানো। বহুদিনের পুরোনো তেঁতুলগাছ, সেখানে দাঁড়িয়ে গর্ভধারিণীর বড় বড় কালো চোখে জল, ডাকল,—মুনা—মু—না, মু—না—রে—। মু—না—রে।

নরবলি :

মুসা জানে রঙ্কন থানে মানুষের রক্ত কত জরুরি। এই জঙ্গল পাহাড়, নদীতে যত ক্ষতি হয়ে গেল, আরও হবে। যত পাপ এখনও ঘটতে বাকি তা একটি আট বছরের ছেলে রুখে দিতে পারে। সে মন্দির ছেড়ে বাইরে বেরোয়। যত রাত বাড়ছে তত ভিড়। একধারে চারটি পাঁঠা, একটি কাঁড়া। কালো মোষের চোখ দুটি ডাগর, রক্তের ছিটে। বেশ বড়সড় শরীর। খানিকটা মায়া মোষটিকে ঘিরে।

মানুষ বলি লুকিয়ে হত। মোষ প্রকাশ্যে। তবে মোষের মাংস এই একদিন খাবার লোকের অভাব ছিল না। ফলে দুটো করে গ্রাম প্রতি বছর পেয়ে যাচ্ছে। রঙ্কনের থানে পড়ে মোষের গরম রক্ত। কিন্তু মানুষ বলি হবার পর কি করা হত জানা যায়নি। এই সময়ে সুবর্ণরেখায় দারুণ টান থাকে, জলও থৈ থৈ। হয়ত স্রোতে ধড় আর মাথা ছুঁড়ে ফেলা হত। কিম্বা দেবীর বেদিতে রক্ত দিয়ে আল্পনা কেটে তার নিচে পুঁতে ফেলা হত। রাজা কি নরমাংস খেতেন? কিম্বা কোন ধানখেতে পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা? মুসা ভেবে পায় না, বলি দেবার পর আট বছরের শিশুর ছোট শরীর সে কোথায় ফেলবে। তার শরীর তেতে ওঠে। শরতের নিশি হাওয়াতেও শীতলতা বোধ করে না। হাত, পা, ঝাঁকড়া চুলের গোড়ায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা হয়। বেদির নিচে একটা টাঙ্গি একটা খাঁড়া। টাঙ্গি দিয়ে পাঁঠার সরু গলা টুক করে এক কোপে খসিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু মোষ অত বড় জানোয়ার, ভারি খাঁড়া দরকার। মুসা গতকাল দুটো-অস্ত্রই ফের এক বছর পর বের করেছে। ফের ভাল করে শান দিয়ে সুবর্ণরেখায় স্নান করিয়ে এনেছে। তার প্রায়ই মনে হয় অস্ত্র দুটি জীবন্ত। বছরের বাকি তিনশ চৌষট্টি দিন শ্বাস নেয় ছাড়ে। খিদে পায়। ফলে একদিন দুটোকেই যত্ন করা হয়। ফুল বেল-পাতা সিঁদুর সাজানো হয়। শেষে শুকনো ঠাঠা অস্ত্র দুটো রক্তে হা চুবিয়ে হুহু কেরে টেনে নেয়। মুসার এমন মনে হবার যথেষ্ট কারণ থাকে। সে লক্ষ করেছে পাঁঠা বা কাঁড়া বলি হবার পর যতখানি রক্ত বেরুবার কথা ততখানি বেরোয় না, ফলে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে দেবীর অস্ত্র জীবন্ত। এবং রক্তই তার একমাত্র ভোজ্য। এবং আরও লক্ষ করেছে বলি হয়ে যাবার পর অস্ত্র দুটি

যেন কেঁপে ওঠে, স্বাস্থ্যবান লাগে, সুন্দর দেখায়। চোখ ফেরানো যায় না। রক্ত লেগে থাকা খাঁড়া বা টাঙ্গিতে দু-চারটে শেফালী ফুল বা সবুজ বেলপাতা, সুন্দর। শ্বাস-প্রশ্বাসের সি সি শব্দ পাওয়া যায়।

মুসা বোতলে মুখ দিয়ে এক টানে অনেকটা মহুয়া উপুড় করে দিল। এ অবশ্য দ্বিতীয় বোতল। সেই সূর্য ডোবার সময় থেকেই আরম্ভ হয়েছে। চলবে বলির পরও। শরীরে ঢুকলে সমস্ত পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। আসলে যেমন হাওয়া আলো, জল, তেমনি মহুয়া। কোন অভ্যাস বা নেশা নয়। শরীরের পক্ষে জরুরি। মুসার নিজেকে বেশ হাতে পায়ে জোয়ান মরদ মনে হয়। সে এখন প্রত্যেকটি কাজ দৃঢ় প্রত্যয়ে করবে। বাইরের ধমসা সানাইয়ের সঙ্গে হাত পা মাথা নাচতে লাগল। এখন সে যৌবনের সেই পাহাড়ি মানুষ। যে টাঙ্গি নিয়ে ভালুকের মুণ্ডু দু ফাঁক করেছিল। যে অনায়াসে বছরের পর বছর এক কোপে মোষের পর মোষ নামিয়ে দিয়েছে। যে আজও ভারী শাল বল্লা জঙ্গল থেকে একা হাতে কেটে কাঁধে বয়ে আনে। কাউকে ডরায় না। মুসা বোতলের অবশিষ্ট গলায় ঢাললে বুঝতে পারল আর দেরি নেই। এবার তাকে প্রস্তুত হতে হবে। ঘণ্টা বাজছে। চোখের মণি স্থির। মুসা বাইরে এল। মন্দিরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দেখল, বধ্য ভূমি উল্লাসে জম-জমাট।

খুঁটিতে চারটে পাঁঠা কাঁড়া বাঁধা হয়ে গেছে। বেঁধে রাখা জানোয়ারদের ঘিরে কয়েকটি তীর ধনুক। এখন অবশ্য নকল তীর ধনুক দিয়েই কাজ চালান হয়। জানোয়ার লক্ষ্য করে সব তীর ছুঁড়ছে। ফলাহীন। এক সময় ছিল যখন একই ভাবে খুঁটিতে বাঁধা থাকত আর বিভিন্ন দিক থেকে ধারালো তীর ছোঁড়া হত। তীরবিদ্ধ জানোয়ারের সমস্ত শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুত। দড়ি বাঁধা মোষের আকাশ ফাটানো মর্মান্তিক চিৎকার, পা ছোঁড়াছুড়ি কাতরানো আরও জমে উঠত দর্শক। আরও জোরে ধমসা বেজে উঠত, দুম দুমা দুম্, দুদুম দুদুম্। আরও ধারালো তীক্ষ্ণ তীর ঢুকে যেত কাঁড়ার কপালের হাড়ে কিম্বা গলার নরম মাংসে। পাঁঠাগুলি তো খেলার বিষয় হতে পারে না, ডাকে তেজ নেই, দাপা-দাপিতে জুৎ হয় না। বড় জানোয়ার যখন মরে যন্ত্রণা বোঝা যায়। অনেক বেশি রক্ত পড়ে। অনেক বেশি ছটফট, গা ভর্তি ফুঁড়ে থাকা তীর। সে দৃশ্য না দেখলে আজকের ছেলে ছোকরারা কি বুঝবে?

তো খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। মিছিমিছি তীর দিয়ে পশুগুলিকে বিঁধার ভঙ্গি করা হচ্ছে, তাতেই কি হাসির হুল্লোড়। কে যেন ভিড় থেকে চেঁচাল, সাবাস্

ভাই দারুণ বিঁধলে। বিঁধা পরব বটে। জিতুয়া অষ্টমী। মুসা জানে এই ভিড়ে দর্শকদের মধ্যে সাবি তার ছেলে নুনাকে আঁকড়ে বসে আছে। পাঁচ বছর পর বাপের ঘর। মুসার মাথার মধ্যে একটা ছোট গিরগিটি ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে এখন ডাইনে বাঁয়ে কোনদিকে তাকাচ্ছে না। সোজা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। দেখছে না কিছুই, চোখ খোলা শূন্য।

মন্দিরের ভেতরটা অন্যদিন অন্ধকার থাকে। ঝামা পাথরের জানালাহীন দেবস্থান। আগে ন'টি চূড়া ছিল, এখনও পাঁচটি। দিনের বেলায় মন্দিরের উঁচু অন্ধকার সিলিং-এ অসংখ্য চামচিকে, বাদুড় ঝুলে থাকে। দেবীর চারপাশে বিষ্ঠা। দেবীর ওপরে অল্প জায়গায় লাল সালুর চাঁদোয়া। আজ রাতে মানুষের সাড়া পেয়ে কিছু চামচিকে উড়ে গেলেও এখনও বেশ কিছু অন্ধকারে ওড়াউড়ি করতে দেখা যায়। বহু বছর মন্দির সংস্কার করা হয়নি। দেওয়ালে রঙ নেই। মাঝে মাঝে ঝামা পাথর বেরিয়ে পড়া। কুলুঙ্গিতে দীর্ঘদিনের কালি। মন্দিরের প্রধান চূড়া কোনদিন ভেঙে পড়বে না সেরকমই এখানকার বিশ্বাস। যেদিন ভাঙবে বুঝতে হবে ইচ্ছে করে ঈশ্বরই ভেঙেছেন। এবং সেদিনই পৃথিবীর শেষ। প্রবল জল ঝড় বৃষ্টিতে পৃথিবী ডুবে যাবে। ফলে অনেক দুঃখ দুর্দশা অযত্ন সহ্য করে আজও মন্দিরের প্রধান চূড়া খাড়া রয়েছে। ভেঙে যাওয়া একটি চূড়ায় এখন বট অশ্বত্থ লালিত। শেকড় দীর্ঘ হতে হতে প্রধান মন্দিরকেও অচিরাৎ ঘিরে ফেলবে। আসলে প্রথা অনুযায়ী রোজ পূজা হলেও মন্দির দেখার কোনো লোক নেই।

খুব হালকা চালে, শাল ফুল ঝরে পড়ার মত বৃষ্টি শুরু হল। অনেক দূরে ভেলাই পাহাড়ের মাথায় বিদ্যুৎ উঠছে। মুসার মনে পড়ে যায়, বছর দশ আগের এক পরব। যে বাগাল ছেলেটি কাঁড়া চরাতো সে কিছুতেই বলি দিতে দেবে না। সে বারবার কাঁদতে কাঁদতে ভেতরে ঢুকে যায়। মুসার কাছে খবর যেতেই সে ছেলেটিকে ধরে ছুঁড়ে ফেলেছিল। কয়ে গ্যাঁজলা, মোষের সে কি ভীষণ টানা করুণ ডাক। হঠাৎ অনেকদিন পরে তার মনে পড়ল খুব চিকন পাহাড়ি কিশোরের গলা—এ কালু-রে এ কালু-রে এ কালু-রে। কালু মৃত মোষটির নাম।

বুড়ো রাজাকে জিজ্ঞাসা কোরেছে, যেসব ছেলে এখানে বলি চড়ান হয়েছে সবাই কি গাঁয়ের?—না, তা কেন হবে। গাঁয়েরও আছে, তবে বাইরে থেকে চালান আসত। গাঁয়ে খোঁজ করতে গিয়ে দেখেছে, অন্তত পঁচিশটি তিরিশটি ঘর থেকে খুব শৈশবেই কিছু ছেলে হারিয়ে গেছে। এমন কি বড় জুয়ান মেয়ে। মুসা

ভাবে, খোঁজ নিলে দেখা যাবে এ গাঁয়ের অন্তত গোটা তিরিশ চল্লিশ মেয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে। হয়ত এখানে যেমন ছেলে বলি হয়, তেমনি অন্যত্র কোথাও মেয়ে বলি হয়। তাদের দেবতারা জুয়ান মেয়ের রক্ত ভালবাসে। ভেবে আশ্বস্ত হয়, যাক তবু দেবতার ভোগে লাগে। দেবতা শান্ত, তুষ্ট থাকে।

মুসা বিশাল চিৎকার করে রঙ্কিনীর বেদির নিচে গড়িয়ে পড়ল। এরকম প্রতি বছরই হয়। যখন দেবতার সঙ্গে মুসা কথা বলে। খালি গা, পরনে নতুন ধুতি হাঁটু অবধি। বেদির নিচে জল কাদা। সে গড়াতে লাগল। দেবতা এখন জাগবে। বড় জাগ্রত। কোন মন্ত্র নেই, কোন আচার অনুষ্ঠান নেই, কেবল উত্তেজনা, আবেগ, প্রার্থনা, ভালবাসা, শ্রদ্ধা। যেভাবে বোবা ব্যবহার করে তার অনিষ্ঠের জন্য। মুসা দেবতার কাছে মাথা ঠোকে। দু-হাত সম্মুখে। মাটি চাপড়ায়। পা আছড়ায়। এখন তার খালিগায়ে কাদা, গাঁদা ফুলের পাপড়ি, বেলপাতা, মরা পোকা। এখন তার মনে পড়ে রাজমুকুট চুরি করে পালিয়ে যাওয়া দুশমনের মুখ, ফাঁকা হয়ে যাওয়া শালবন, ধু-ধু ডাহি, কাঁকুরে ডাঙা। গনগনির মাঠে ঘুরে বেড়ান ডাইনির পিলে চমকানো হাসি।

মুসার চোখ লাল ঘোলাটে। সে উঠে বসে। তৃতীয় বোতল ঢকঢক করে উপুড় করে দেয়। এবার যেন তার শরীরে আর কোন ব্যথা বেদনা নেই। বরং যৌবন, যা তার বহুকাল আগে গত, ফিরে আসে। মুসা শুনতে পায় পাঁজরায় ঝমঝম। তীর, ধনুক, টাঙ্গি, ভল্ল, সড়কি হাতে রে রে করে রাজার ফৌজ গনগনির ডাঙা পেরিয়ে ডাকাত ধরতে দৌড়চ্ছে। পাহাড়ে পাহাড়ে আক্রান্ত সানতাল গর্জন। প্রতিধ্বনি হয় পাতায় পাতায়, টিলায়, ডুংরিতে হে-এ-এ-এ-। মুসা বুঝতে পারে তার শরীর লোহাপাথরের। সে টের পায় শরীরের মধ্যে রক্তের নলিতে নলিতে বুনো কাঁড়ার দৌড়। খুরে ধুলো উড়িয়ে অসংখ্য কাঁড়া দৌড়চ্ছে, খট্ খট্ খট্ খুট্ খুট্ খুট্ হু-রে। হিপ্-হিপ্-হু-রে।

মুসা হাতে খাঁড়া তুলে নিল। বাইরে গুমগুম আওয়াজে বোঝা যায় ধমসা প্রাণপণে বাজছে। প্রাণান্তকর পাহাড়ে পাহাড়ে গদাম গদাম। সে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। এবং শরীরের সমস্ত তাগদ দিয়ে ফের এক চিৎকার করল, —মা রঙ্কিনী—মা—। নাচ এখন চলবে। গায়ে কাদা ফুল। ক্রমশ সেই তেল চুকচুকে শরীরে ঘাম ফুটে উঠছে। তীব্র নাচ।

পাঁঠা চারটি অন্য লোক টাঙ্গি দিয়ে খসিয়ে দিয়েছে। পাঁঠার ধড় ছটফটাচ্ছে। দু'জন লোক এখন মোষটিকে হাঁড়িকাঠে ঠুসে দিয়েছে। একবার মাত্র মোষটা

ডাক ছেড়েছিল। এখন তার গলায় ডালডা ঘষা হচ্ছে। আগে ঘি ছিল এখন তো আর ঘি জোটে না, ডালডা। বাটিতে রাখা ডালডা কাঁড়ার লম্বা বাড়ান গলায় মালিশ করা হচ্ছে। আরামে আরও লম্বা আর সরেস, যেন গলায় হাড় নেই। এখন এই আধঘণ্টা মালিশে মোষের এমন অবস্থা টুক করে টানলে ফুলের মত ছিঁড়ে হাতে চলে আসে। মোষের সমপিত বিশাল কালো শরীর। চোখ ঈষৎ খোলা। এবং হাড়কাঠের ভেজা মাটির ঠেকনার ওপরে নরম করে স্থাপিত।

ঠিক এই সময়ে মুসা ঘর্মাক্ত কলেবরে বাইরে আসে। সে চারধারে তাকায়, জনাকীর্ণ বধ্যভূমি। নাচ থামে না। নাচতে নাচতে হাড়কাঠের কাছে চলে আসে। ফের একবার চারধারে তাকায়। মাথার ঝাঁকড়া বাবরি শরতের ভেজা হাওয়ায় ওড়ে। সে খাঁড়া শূন্যে তুলে নাচতে নাচতে আ-আ-আ-শব্দ করে কাঁড়ার গলায় বসিয়ে দেয়। এবং বিশাল কালো জানোয়ারের রক্তের নলি বহুদূর পর্যন্ত পিচকারির মত ছিটকে যায়। চার পা বাঁধা অবস্থায় দাপাতে থাকে। কিন্তু মোষের গলা পুরোটা কাটেনি। এক কোপে নেমে যায়নি। সমস্ত জনতা হায় হায় করে ওঠে। গত চল্লিশ বছর ধরে মুসা বলি দিচ্ছে, আজ অবধি এরকম কখনও হয়নি। সবাই আতঙ্কে ভয়ে শিউরে ওঠে। না জানি কি ভয়ঙ্কর ভবিষ্যত অপেক্ষায়, মা কাঁড়া নিল না।

—কি তবে কাঁড়া কাটে নাই? রঙ্কন মা নেয় নাই? মুসা ঘোলা চোখে স্থির, মাত্র কিছুক্ষণ। কারণ যেন জানতো এরকমটাই হবে। কারণ রঙ্কিনী মা মানুষের রক্ত খুঁজছে, তার আর পশুর রক্তে মন নাই। মুসা পাগলের মত ঈষৎ হাসে। এবং ফের খাঁড়া হাতে নাচতে নাচতে মন্দিরে ঢুকে যায়। জনতার মুষড়ে পড়া ভ্রূক্ষেপ করে না।

এখন বিধান হল অন্য একটা মোষ আনতে হয়। পুরোহিতের বুকের রক্ত দিতে হয়। অনেক সাধ্য-সাধনা, অনেক ঘুষ চাই দেবতার। অনেক পূজা। খবর বহুদূর পর্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে যায়। মুহূর্তে গ্রামকে গ্রাম।

সাজগোজ করা নাচনি মেয়ে দুটো ভয়ঙ্করতা দেখতে বধ্যভূমিতে চলে এসেছে। নুনার সন্ধানে আতঙ্কগ্রস্ত সাবি। খবর পেয়েছে, লোকজনের পিছনে হাঁটতে হাঁটতে ইস্টিশনে গিয়ে নুনা প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে ঘুমিয়ে পড়েছে। সে একা তখন কাণ্ডজ্ঞানহীন ইস্টিশনমুখী দৌড়য়। আকাশে তারা মেঘে ডুবে যায়। রুয়াম পাহাড়ে,শাল জঙ্গলের মাথায় ঘন ভারী মেঘে মেঘে ঠোক্কর লেগে বিশাল গর্জন।

মদ্যপদের আসর ছত্রভঙ্গ। ধমসার কাঠি থেমে। রোগা সানাইওয়ালা ভয়ে ঠক-ঠক কাঁপে।

মুসা রঙ্কিনীর সামনে দাঁড়িয়ে ফের নাচ শুরু করে। আরও জোরে। আরও আক্রান্ত। আরও উন্মাদনা। তার চোখের সামনা থেকে সমস্ত পৃথিবী ডুবে যেতে থাকে। শুনতে পায়, রঙ্কিনী বলছে, মুসা নররক্ত চাইরে, বেটা নররক্ত। সরল নিষ্পাপ মানুষের তাজা খুন। খাঁড়া বিদ্যুতের মত সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের গলায় চালিয়ে দেয়। তারপর শিথিল মুঠি। ঝনঝন ঠিকরে পড়ে খাঁড়া। গলার মোটা নলী দিয়ে হোস পাইপের মত রক্ত সমস্ত দেওয়ালে, বেদিতে, কাদায়। মুণ্ডু স্থির। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট চেপে ধরা। হাত পা ছোঁড়ার যত শব্দ হওয়ার কথা ছিল, তত হয় না। তবে গলা দিয়ে মানুষের রক্ত হা হা হু হু করে বেদি, মন্দির, দেবতাকে স্নান করাতে থাকে।

আলোচনা চক্র

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষয় : আদিবাসীসমাজ। সকাল থেকেই কুসুমডিহি গাঁয়ে একেবারে সাজ-সাজ ব্যাপার। ইস্কুলের ছোট্ট মাঠটায় বিশাল শাদা শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে, অন্য পাশে মাঝারি সাইজের ডায়াস, ডায়াসে সাত-আটখানা চেয়ারের সামনে দু'খানা টেবিল পাশাপাশি রেখে তার উপর নক্‌শা-কাটা টেবিলক্লথ।

জেলা-সদর থেকে বেলা দশটার মধ্যে এসে পড়েছেন আদিবাসী দপ্তরের দে সাহেব এবং মণ্ডল সাহেব। আদিবাসীরা অবশ্য সাহেব শব্দটায় তেমন সড়গড় নয়, তারা বলে, ওই এসে পড়েছেন বটে দেবাবু আর মণ্ডলবাবু। এঁরা দুজনেই আদিবাসীদের জন্য বেশ ভাবেন-টাবেন, গত বছর দুয়েকের ভেতর এই গাঁয়ে একটা প্রাইমারী স্কুল করে দিয়েছেন, তাতে মাস্টারি পেয়েছে এই গাঁয়েরই ছেলে মধু সিং। মধু জাতে মুণ্ডা, একটা পাশ দিয়েই চাকরি পেয়ে যেতে এ-অঞ্চলে বেশ সাড়া পড়ে গেছে। মণ্ডলবাবু বলেছেন, মধু ভালো করে লেখাপড়া শেখাও, কালে-কালে হয়ত এটা হাইস্কুল হয়ে যাবে।

মণ্ডল সাহেবের চেহারাটা বেঁটে খাটো এবং গুরুধরনের, রঙ মিশকালো, আদিবাসী পাড়ায় এলে তাঁকে এ-তল্লাটের একজন বলে মনে করে নেয়া যায়। এই দপ্তরে আছেনও প্রায় বছর কুড়ি, আদিবাসীদের সঙ্গে মিশতে মিশতে তাদের ভাষার দু-চারটে শব্দ বেশ শিখে গেছেন, আর কখনো-কখনো নাচের আসরে হঠাৎ যোগ দিয়ে নাচতে শুরু করেন।

দুপুরের ভেতর কলকাতা থেকে এসে পড়েছেন আদিবাসী-বিশেষজ্ঞ রায়বাবু। আদিবাসী-সমাজ সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘদিনের গবেষণা। বারো-চোদ্দখানা বই লিখেছেন বিভিন্ন উপজাতি সম্পর্কে। আর এসেছেন বিখ্যাত লেখক বিবস্বান বসু। প্রধানত আদিবাসীদের নিয়েই তিনি গল্প-উপন্যাস লেখেন, এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশা, একস্প্লয়টেশন নিয়ে লিখে বেশ হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছেন কলকাতায়। নিজেও আদিবাসী পাড়ায় ঘোরাঘুরি করেন খুব। বলেন, আদিবাসীদের সঙ্গে না

মিশলে কি ওদের সম্পর্কে ঠিক-ঠিক লেখা যায়? যাঁরা কলকাতায় বসে গ্রাম নিয়ে লিখে সস্তায় বাজীমাৎ করতে চান, আমি তাঁদের দলে নই।

বিবস্বান বসু কলকাতা থেকে আসার সময় দু'জন সাংবাদিককে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে একজন বেশ শৌখীন যুবতী। জিন্‌সের প্যান্টের উপরে গাঢ় হলুদ রঙের শার্ট, চোখে ফ্যাশনদুরস্ত সানগ্লাস, অন্যজন এক আধুনিক যুবক, তারও পরনে জিন্‌স। দুজনে ডায়াস থেকে একটু দূরে একটা শালগাছের ছায়ায় ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসে গল্প করছে।

আলোচনাচক্রের সময় বেলা তিনটেয়, কিন্তু লোক জমতে শুরু করেছে বেলা দশটা-এগারটা থেকে। আশপাশের আট-দশখানা গাঁ সবই আদিবাসীদের বাস। তিনটের মধ্যে প্রায় হাজার দুয়েক লোক জমে গেল। সাংবাদিক যুবতীর নাম সুদেষ্ণা, সে এত লোক দেখে বেশ অবাক অবাক চোখে বলল, দারুণ এ্যারেঞ্জমেণ্ট তো! ট্রাইবালদের উপর সেমিনার শুনতে এত গ্যাদারিং, ভাবা যায় না। কলকাতায় তো খোসামোদ করে লোক জোটাতে হয়।

সাংবাদিক যুবক কিছু বলার আগেই, যে লোকটা মাইকের কানেকশন দেবার জন্য তার টাঙাচ্ছিল, সে হেসে বলল, শুনতে কি আইসছে দিদিমণি, আইসছে রগড় দেখতে। গাঁয়ে তো এসব কাণ্ড হয় না।

সুদেষ্ণা তাকাল লোকটার দিকে, মিশকালো রঙ, তার উপর মুখময় দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, ঝাঁকড়া চুল একমাথা, কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল লোকটার তীক্ষ্ণ এবং উজ্জ্বল চোখজোড়া।

যুবকটির নাম কৌস্তভ, সে সুদেষ্ণার দিকে তাকিয়ে হাসল, একজ্যাক্টলি। অনেকেই হয়ত জানে না, এখানে তারা বসে আছে কেন। একটু আগেই দু'জন লোক ঘুরতে ঘুরতে এসে জিজ্ঞাসা করছিল এখানে মেলা বসবে কি না।

কথাটা ঠিকই, আদিবাসী গাঁয়ে ভিড় মানেই মেলা, সেও পরবের দিন। আলোচনাচক্রের আইডিয়া এসেছে দে সাহেবের মাথা থেকেই। তিনিই মধুকে ডেকে বলেছিলেন, গভর্নমেণ্ট থেকে কিছু টাকা দিয়েছে সেমিনার করার জন্য, তা ভাবছি, তোমাদের ওখানেই এটা হোক, ওখানে অনেকগুলো ট্রাইবাল ভিলেজ আছে, আর প্রায় সব শ্রেণীর ট্রাইবই আছে, ব্যাপারটা বেশ জমবে। প্রচুর লোক আনতে হবে কিন্তু, আমি কলকাতা থেকে কয়েকজন আদিবাসী বিশেষজ্ঞ আনাবো, সঙ্গে খবরের কাগজের লোকও—যাতে পাবলিসিটি ভালো হয়। আদিবাসীদের নিয়ে সরকার কী ভাবছেন, বিশেষজ্ঞরাই বা কী সাজেস্ট করেন, আদিবাসীরাই-বা

কী চায়, এ নিয়ে একটা খোলামেলা আলোচনা হলে সবারই উপকার হবে, আর —রাতে যেন একটু নাচগানের ব্যাপার থাকে, মানে ওই কালচারাল প্রোগ্রাম আর কি, হ্যাঁ সব ট্রাইবেরই যদি আলাদা আলাদা নাচের দল আসে ওখানে, তাহলে দারুণ কিছু একটা হবে নিশ্চয়। তোমাদের গাঁয়ের নামও ছড়িয়ে যাবে চারদিকে।

মধু সিংও দে বাবুর পরিকল্পনা শুনে দারুণ উত্তেজিত, এত বড় একটা ব্যাপার যদি তাঁদের গাঁয়ে হয়, তাহলে গাঁয়ের উন্নতিও থেমে থাকবে না। বিষয়টা সে গাঁয়ের মাথাদের ডেকে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করল। শুনে সবাই বেশ খুশি। রাজকুমার হাঁসদাও বললেন, হ্যাঁ, তাহলে কুসুমডিহিতে একটা ঘটনা হচ্ছে বটে। আর অনুষ্ঠানের সব খরচ যখন গবরমেণ্ট দিচ্ছে—

শুধু অনুষ্ঠানের খরচই নয়, দে সাহেব মধুকে ডেকে আরো বললেন, কলকাতা থেকে লোকটোক যখন আসছে, তখন একটু খাওয়ার ব্যবস্থাও করতে হয়, আমি কন্‌টিন্‌জেন্সি থেকে আরো দু-তিনশ টাকা দেব'খন, একটু মুরগি-টুরগি কোরো, আর পারলে, বড় চিংড়ি যদি পাওয়া যায়। জেলা-সদর থেকেও তিন-চারজন অফিসার যাবে তো!

দে সাহেব নিজেও একটু খেতে-টেতে ভালবাসেন, শুধু খাওয়ার মেনুই বলে দ্যাননি, খাওয়ার টেবিলে নিজেই এক-আধবার বাগ্‌দা এবং মুরগির মাংস চেয়ে-চিন্তে নিয়েছেন, এবং মধুকে বারবার বলেছেন, দেখো, কলকাতার লোকজনের যেন অযত্ন না হয়। বিশেষ সাংবাদিকরা আছে তো!

লাঞ্চ সেরে ডায়াসের উপরে অতিথিরা এসে বসতে শুরু করেছেন, সামনের মাঠে সামিয়ানার ভেতরে-বাইরে অজস্র মানুষ হাঁ করে তাকিয়ে আছে ডায়াসের দিকে, অনেকেরই মুখে মুখে ঘুরছে 'সেমিনার' শব্দটি। সেমিনার ব্যাপারটা কি তা অনেকেই জানতে চাইছে। কেউ বলছে, সেমিনার কি কোন নতুন পরব? কেউ বলছে, এটা কি কোন নাচের ইংরিজি নাম?

ডায়াসের উপর ঢেকুর তুলতে তুলতে দে সাহেব একটু আলাপ জমাতে চাইলেন লেখক বিবস্বান বসুর সঙ্গে, বাগ্‌দাটা বেশ ফ্রেশ ছিল, কি বলেন?

বিবস্বান বসু ঘাড় নাড়লেন, তারপর বললেন, লোক কিন্তু অনেক হয়ে গেছে, তিনটে কুড়ি বাজে, সেমিনার আরম্ভ করে দিলে হত।

বলতে বলতে জীপের শব্দ তুলে হাজির হলেন আদিবাসী দপ্তরের প্রজেক্ট অফিসার কাঞ্জিলাল সাহেব। তিনি ডায়াসে আসতেই দে সাহেব বলে উঠলেন,

কি কাঞ্জিলালদা, আপনার তো আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করার কথা ছিল, এত দেরি করলেন যে বড়!

কাঞ্জিলাল সাহেব আফশোষ করে বললেন, বেরিয়ে তো পড়েছিলাম, হঠাৎ কলকাতা থেকে ট্রাঙ্ককল, সামনেই ডিস্ট্রিকট প্ল্যানের মিটিং, মিনিস্টার নাকি উপস্থিত থাকবেন মিটিং-এ। তারই কাগজপত্র তৈরি করে রাখতে হবে। ফলে—

তাই নাকি? মন্ত্রী আসছেন? শুনে দে সাহেবের মুখটা বেশ ব্যাজার হয়ে গেল। মন্ত্রী জেলায় আসা মানে এক মহা হাঙ্গাম।

দুই সাংবাদিকও শালগাছের ছায়ায় বসে খাওয়া নিয়ে আলোচনা করছিল। সুদেষ্ণা বলছিল, এই ইনটেরিয়র ট্রাইবাল ভিলেজে এসে এমন ভুরিভোজ, ভাবা যায়?

কৌস্তভ মাথা নাড়ে, আমি তো ভেবেছিলাম, আজ একটু হাড়িয়া খাব পেট ভরে, তার বদলে চিকেন, প্রণ—

সুদেষ্ণা বলল, আমরা তো চর্বচোষ্য খেয়ে এসে ঢেকুর তুলছি, কিন্তু এই লোকগুলো তো সেই কোন সকালে এসেছে, এদের কি খাওয়া হয়েছে?

মাইকম্যান তখন তার টাঙিয়ে এ্যামপ্লিফায়ারে কানেকশন দেয়া শেষ করে সাংবাদিকদের পাশে এসে বিশ্রাম নিচ্ছিল, সে তার গোঁফদাড়ির জঙ্গলের ভেতর শাদা ধবধবে দাঁতে হাসি ফুটিয়ে বলল, না খেয়ে এদের অব্যেস আছে, দিদিমণি।

সুদেষ্ণা অবাক হয়ে তাকায় মাইকম্যানের দিকে, তারপর কৌস্তভের দিকে একটু ঘেঁষে মৃদুস্বরে বলল, এই মাইকম্যান লোকটা ভারী ইণ্টারেস্টিং কিন্তু। কেমন চোখা-চোখা সব উত্তর দিচ্ছে, খেয়াল করেছ। আর চেহারাটাও খুব এ্যাট্রাকটিভ। কৌস্তভ তেমনই মৃদুস্বরে বলল, ট্রাইবাল ভিলেজে এসে প্রেমে পড়ে যাবে মনে হচ্ছে।

সুদেষ্ণা চোখ পাকিয়ে বলল, ট্রাইবাল ভিলেজে এসে প্রেমে পড়াটা তো পুরুষদের একচেটিয়া ব্যাপার। সাঁওতাল যুবতী দেখলেই তোমাদের পুরুষদের শরীর তো আনচান করে।

কৌস্তভ অবশ্য এতক্ষণ মাঠের চারপাশে জমে থাকা সাঁওতাল যুবতীদের দিকে তারিয়ে তারিয়ে দেখছিল, বিশেষ করে কয়েকটি নাচের দলে এমন তিন-চারটি মেয়ে সেজেগুজে এসে অপেক্ষা করছে, যাদের শরীর প্রায় কালোপাথরে গড়া স্ট্যাচুর মত গম্ভীর, নিখুঁত। তার উপর তাদের খোঁপায়, হাতে শালফুলের স্পন্দিত

অহঙ্কার। তারাও এই মড়-পোশাকের যুবক-যুবতীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে, সেই অসম্ভব চাউনি দেখে কৌস্তভ প্রায় চার্জড্।

মাইকের কানেকশন পেতে স্থানীয় হাইস্কুলের শিক্ষক রাজকুমার হাঁসদা তাঁর মিহিগলায় পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন মঞ্চে বসে থাকা অতিথিদের। বলছিলেন, আমাদের কুসুমডিহি গাঁয়ের খুবই সৌভাগ্য যে এতজন অতিথিকে আমরা একসঙ্গে পেয়েছি। আমাদের গাঁ শহর থেকে খুবই দূরবর্তী। অফিসরবাবুদের এভাবে একসঙ্গে পাওয়া বেশ দুর্লভ ব্যাপার। সেক্ষেত্রে আজকের এই অনুষ্ঠান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আদিবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা, কষ্টের কথা আজ সবই নিজের চোখে দেখে যাবেন, নিজের কানে শুনে যাবেন। সবাইকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি, আর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করার মূলে যে যুবকটির প্রধান অবদান, সেই মধু সিংকেও আমাদের গাঁয়ের তরফ থেকে ধন্যবাদ।

মধু সিং তখন ভীষণ ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে চারদিকে। গত সাত-আটদিন ধরে দপ্তরে-দপ্তরে গিয়ে অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, আর সেইসঙ্গে আট-দশটা গাঁয়ে গিয়ে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে বলে লোক জোগাড় করতে হিমশিম খেয়েছে সে। আজো সকাল থেকে চরকির মত ঘুরে চারদিকে তদ্বির তদারকি করেছে সে। পাছে কারো কোন ত্রুটি না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি তার। অফিসারদের ঠিকমত খুশি রাখতে পারলে হয়ত তাদের গাঁ আরো উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে। প্রজেক্ট অফিসার কাঞ্জিলাল সাহেব এসে পৌঁছনো মাত্র তাঁর সামনে সে তুলে ধরল গ্লাসভর্তি সরবত। অবশ্য শুধু তাঁকেই নয়, বাকি সবার জন্যই আনা হয়েছিল। কিন্তু লেখক বিবস্বান বসু বললেন, এভাবে ডায়াসে বসে সরবত খাওয়াটা ভালো দেখায় না।

সরবতের গ্লাস ফিরে যেতে তিনি আবার বললেন, অনুষ্ঠান এবার শুরু করে দিলে হত। প্রজেক্ট অফিসার তো এসে গেছেন—

রাজকুমার হাঁসদা বললেন, তা তো করা যায়, কিন্তু অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এস. ডি. ও সাহেব এখনো এসে পৌঁছননি, তিনি এসে পড়লেই—

ঘড়িতে পৌনে চারটে বাজে। স্থানীয় মানুষ হিশেবে অনুষ্ঠানের সভাপতি করা হয়েছে শিক্ষক রাজকুমার হাঁসদাকেই। গাঁয়ে প্রধান অতিথি ছাড়া অনুষ্ঠান শুরু হবে, তা ভাবা যায় না। তাই কখনো মধু সিং কখনো রাজকুমারবাবু মাইকে এটা ওটা বলে সবার উৎসাহ জীইয়ে রাখছেন।

সাংবাদিক সুদেষ্ণা তখন মাইকম্যানকে নিয়ে পড়েছে। মাইকম্যান একটু

আগে মধুকে বলছিল, গাঁয়ের লোকগুলো যে রোদ্দুরে পুড়ে ভাজা-ভাজা হয়ে গেল, মধু। তোমার এস. ডি. ও বাবু যখন আসবে, তখন সব আমসি হয়ে যাবে গো।

সুদেষ্ণা জিজ্ঞাসা করল, আপনি তো ট্রাইবাল, কিন্তু কোন ট্রাইবের?

মাইকম্যান হাসে, হঁ হঁ, দিদিমণি, ট্রাইবোল বটে, কিন্তু শুইনলে বুলবেন, চোর। তবে আমি চোর নই।

সুদেষ্ণা অবাক হয়ে বলে, তার মানে?

মাইকম্যান বলে, আমরা লোধা আছি। কলকাতার বাবুদের কাছে সব লোধাই চোর, বইতে তাই লেখা আছে। কিন্তু সব লোধা চোর নয়।

সুদেষ্ণা একটু বিব্রত বোধ করে, কৌস্তভের দিকে তাকায়। মাইকম্যানকে আবার উঠে যেতে হল ডায়াসে। কারণ তার যন্ত্রটি থেকে এক বিচিত্র পুঁ-উ-উ শব্দ বেরুচ্ছে। সেটি ঠিক করতে হবে।

অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে না দেখে সবাই একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ছে, কাঞ্জিলাল সাহেব বললেন, এস. ডি. ও. সাহেব কোথায় আবার আটকে পড়েছেন কে জানে। হয়তো কোথাও পথ অবরোধ-টোধ হয়েছে।

দে সাহেব বললেন, আমি তো সকালে ফোন করেছিলাম আসার আগে, বললেন, ট্রাইবলদের ব্যাপার। নিশ্চয়ই যাব।

আসরে একে-একে পৌঁছচ্ছে বিভিন্ন উপজাতির নাচের দল। সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোড়া, ওরাঁও—এখনো পর্যন্ত এই চার দল এসে পৌঁছেছে, মধু সিং ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তাদের নাম-ঠিকানা লিখে নিচ্ছে একটা খাতায়। সবাই যে যার গাঁ থেকে একেবারে সেজেগুজে এসেছে। সাঁওতালদের মধ্যে দু-তিনজন মাথায় ময়ূরের পালক গুঁজে, লাল ফেট্টি পরে এমন সাজ করেছে যে ভিড়ের মধ্যে বেশ একটু উৎসাহ তাদের ঘিরে। একজন তো অতি উৎসাহে মাদলে দ্রিম দ্রিম দ্রিম বোল তুলে একপাক নেচেই নিল মাঠের মধ্যে। আদিবাসী-বিশেষজ্ঞ রায়বাবু ডায়াস থেকে নেমে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিচ্ছেন, যদি নতুন কিছু তথ্য জানা যায় তাঁর আগামী গবেষণা-গ্রন্থের জন্য।

লেখক বিবস্বান বসুও বসে নেই, তিনিও ঘুরে ঘুরে এর ওর সঙ্গে কথা বলছেন, দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তিনি আদিবাসীদের বেশ কাছের লোক, অনেকেই তাঁর চেনা-জানা। কাউকে বলছেন, কি রে, তোর চেহারা যে বেশ চকচক করছে, এবার শিকার করতে গিয়েছিলি নাকি? কি কি মারা পড়ল তোর বল্লমের ডগায়?

কাউকে বলছেন, তোদের পাড়ার সবাইকে যে অসুখে ধরছিল, সেটা রোগটা কি গেছে? নতুন কিছু খবর পেলেই টুকটাক নোট করে নিচ্ছেন মনের ভেতর। এবার গুজোয় দুটো উপন্যাস, ছ'টা ছোট গল্পের অর্ডার পেয়েছেন এখনো পর্যন্ত, কথা বলতে বলতে গল্প-উপন্যাসের প্লট ঝিলিক মেরে উঠছে মাথার ভেতর।

এস. ডি. ও-র দেরি দেখে উদ্বোধন-সঙ্গীত শুরু করে দেয়া হল বেলা চারটে নাগাদ, তিনজন সাঁওতাল মেয়ে তাদের ভাষায় এবং নিজস্ব সুরে শুরু করল গান, সঙ্গে একজন বয়স্ক মানুষ চমৎকার বাঁশি বাজাতে লাগলেন, গানের পর সভাপতি এবং অতিথিদের মাল্যদান। গাঁয়ে জবাফুলের মালা খুব প্রচলিত, বিবস্বান বসু সেই মালা পরতে পরতে পাশে বসা প্রজেক্ট অফিসারকে ফিসফিস করে বললেন, এরা তো মশাই আমাদের মা কালী বানিয়ে ফেলল। শালফুলের মালা হলে তবু মানাত।

মালাপর্বের পর রাজকুমার হাঁসদা মাইকে গিয়ে বললেন, এই সভায় বিভিন্ন গ্রাম থেকে এসে পৌঁছেছেন প্রতিনিধিরা, আর তাঁদের মধ্যে উপস্থিত আছেন বিভিন্ন উপজাতির মানুষ। আমরা একে একে প্রত্যেক উপজাতির মধ্য থেকে দু-একজন করে প্রতিনিধিকে অনুরোধ করব, তাঁদের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ-দাবি নিয়ে মাইকে এসে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে।

ডায়াসে পরপর উঠে এলেন করম চাঁদ মুর্মু, সনাতন হেমব্রম, নগেন বেসরা! তারপর রোহিনী সিং সবে তিন-চার লাইন বক্তব্য রেখেছেন, এমন সময় প্রবল ধুলো উড়িয়ে এস. ডি. ও সাহেবের আগমন। তিনি উপস্থিত হতেই ডায়াসে সামান্য চাঞ্চল্য দেখা দিল, রাজকুমার হাঁসদা, মধু সিং সবাই ছুটলেন প্রধান অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে। রোহিনী সিং থতমত খেয়ে কি বলবেন ভেবে না পেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর ডায়াসে নতুন করে অতিথি বরণ এবং জবাফুলের মাল্যদান।

এস. ডি. ও এলেন বটে, কিন্তু তাঁর চেহারা তখন প্রায় বিধ্বস্ত সৈনিকের মত। চুল উশকো খুশকে, দৃষ্টি কেমন ভাসা-ভাসা, উপস্থিত মঞ্চের অতিথি এবং সামনে বসে থাকা অসংখ্য শ্রোতাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললেন, আরো অনেকগুলো প্রোগ্রাম সেরে আসতেই এই দেরি। সকাল থেকে দম-দেয়া স্প্রিং-এর পুতুলের মত পরপর প্রোগ্রামের পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

বিবস্বান বসু জিজ্ঞাসা করলেন, তাই নাকি? খুবই বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে আপনাকে, আপনার জন্য প্রায় একঘণ্টা অপেক্ষা করেছিলাম।

এস. ডি. ও লজ্জিত হয়ে বললেন, দেখুন না, সকালে উঠেই টেলিফোন, ধান রোয়া নিয়ে গোলমাল, সি পি এম-কংগ্রেস দু-পক্ষ মুখোমুখি, ও. সি. সামলাতে পারছে না। সেখানে গিয়ে তিন ঘণ্টা মিটিং। সেখান থেকে ফিরেই নাকেমুখে কোনক্রমে কিছু গুঁজে ডি. এম-এর ঘরে বন্যার প্রস্তুতি নিয়ে আবার তিনঘণ্টা, তারপর একটা বন্ধ ফ্যাক্টরী খোলার ব্যাপার নিয়ে সিটু আর এ. আই. টি. ইউ. সি-র সঙ্গে ঝাড়া দু'ঘণ্টা ধ্বস্তাধ্বস্তি, তারপর ড্রাগ্‌স্-এর উপর একটা সেমিনার উদ্বোধন করে দিয়েই সোজা এখানে, তারা তো কিছুতেই ছাড়বে না। এখান থেকে ফিরে গিয়ে ফের সেখানে বক্তৃতা করতে হবে কথা দিয়ে তবে এখানে আসতে পেরেছি।

বিবস্বান বসু চোখ কপালে তুলে বললেন, স্ট্রেঞ্জ, আজ আবার একটা সেমিনার?

হ্যাঁ, অন ড্রাগ্‌স্।

মাই গড্, এখানে মানে মফঃস্বলেও কি ড্রাগ্‌স্ ঢুকে গেছে নাকি কলকাতার মত? বিবস্বান বসুর বিস্ময় যায় না।

না, ঠিক ঢোকেনি, তবে হয়ত ঢুকবে ঢুকবে করছে। তবে ড্রাগ্‌স্ ঢুকেছে কি ঢোকেনি সেটা কোন ব্যাপার নয়। সেমিনার করতে হবে কিছু একটা নিয়ে, তাই—

এবারে মুখ খুললেন আদিবাসী বিশেষজ্ঞ রায়বাবু, আপনি ড্রাগ্‌স্ নিয়ে ওখানে বক্তৃতা করবেন?

এস. ডি. ও হাসলেন, হ্যাঁ, বক্তৃতা করাই তো আমাদের চাকরির অন্যতম অঙ্গ। রোজই দু-তিনটে সাবজেক্টের উপর এখানে ওখানে বলতে হয়, আর কি সব বিষয় এক-একদিন জোটে!

রায়বাবু অবাক হয়ে বললেন, এত সব সাবজেক্ট নিয়ে রোজ বক্তৃতা করা, ভাবাই যায় না। আমি তো সারাজীবন এক আদিবাসী নিয়ে পড়ে আছি, তাতেই বক্তৃতা করতে গিয়ে অস্থির। আর আপনারা নিত্যনতুন বিষয় নিয়ে—রিয়্যালি স্ট্রেঞ্জ।

এস. ডি. ও বললেন, সেই যে একটা গল্প আছে না, এক বিখ্যাত উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের গায়ক রেডিওতে অডিশন দেবার ফর্ম ফিল-আপ করার সময় কী কী রাগ জানেন, এই কলমে মাত্র একটি রাগের নাম লিখেছিলেন, আর তাতেই তাঁর অডিশন বাতিল হয়ে যায়। কারণ যে গায়ক সবে গান শিখেছে সে-ও নাকি

দশ বারোটা রাগের নাম গড়গড় করে লিখে যায়, আর ভারত বিখ্যাত গায়ক কিনা মাত্র একটি রাগ জানেন! শুনে সেই গায়ক বলেছিলেন, একটি রাগ সারাজীবন গেয়েও ভালো করে শিখতে পারলাম না, অনেক রাগের নাম লিখি কি করে? তা আমাদেরও সেই দশা হয়েছে। কোন কিছুই ভালো করে জানি না বলে এ্যামপ্লিফায়ারের সামনে যে-কোন সাবজেক্টেই দম দেয়া পুতুলের মত শুরু করে দিই। কখনো নারকেল চাষ, কখনো ছাত্রদের শৃঙ্খলাবোধ, কখনো শহীদ দিবস, কখনো আদিবাসী—

বলেই হঠাৎ রাজকুমার হাঁসদার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারব না, বুঝতেই পারছেন, এখান থেকে ফিরে গিয়ে ড্রাগ্‌স্‌-এর সেমিনার এ্যাটেণ্ড করে যেতে হবে আর একটা ক্লাবে, সন্ধে সাতটায় সেখানে পুরস্কার-বিতরণী।

রায়বাবু আঁতকে উঠে বললেন, পারেনও বটে আপনারা। ওদিকে তখন রোহিনী সিং-এর পালা শেষ হয়ে আরম্ভ হয়েছে রামচন্দ্র সিং-এর বক্তৃতা। রামচন্দ্র সিং ভূমিজ সম্প্রদায়ের মানুষ, তেমন ভালো করে বলতে পারেন না। মঞ্চে উঠে এক এক সম্প্রদায়ের মানুষ এক-একরকম দাবীদাওয়া রাখছেন, কেউ চাইছেন গাঁয়ের কাঁচা রাস্তাটা মোরাম করে দেয়া হোক, বর্ষায় জলকাদায় আদিবাসীদের ভারী কষ্ট হয়—কেউ বলছেন, তাদের গাঁয়ে মাত্র দুটো টিউবওয়েল, দুটোতেই সব সময় ভিড় থাকে, তার মধ্যে একটা সেদিন একেবারে অকেজো হয়ে গেছে। অবিলম্বে গাঁয়ে অন্তত আরো দুটো টিউবওয়েল যেন দেয়া হয়। প্রজেক্ট অফিসার কাঞ্জিলাল সাহেব এবং আদিবাসী দপ্তরের দে সাহেব তাদের ডায়েরিতে দাবীদাওয়াগুলো নোট করে নিচ্ছেন। রামচন্দ্র সিং মঞ্চে উঠে বুঝতে পারছেন না কী চাওয়া যায়, অনেক ভেবেচিন্তে বললেন, সরকার যেন গাঁয়ে আরো তিরিশ চল্লিশ বিঘে শালিজমি পাঠিয়ে দ্যান।

তাঁর কথা শুনে অনেকেই হেসে ফেললেন।

মাইকম্যান বলে উঠল, দেবে রে বাবা, দেবে। সদরে তো কারখানায় জমি তোয়ের হতিছে শোনলাম।

এস. ডি. ও সাহেবের তাড়া আছে দেখে এরপর সভাপতি তাকেই বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করেন। এস. ডি. ও. সাহেব তখন দম দেয়া পুতুলের মত এ্যামপ্লিফায়ারের সামনে গিয়ে বললেন, মানোতেন বয়হা মিশেরাকো। সাঁওতালীভাষায় বয়হা মানে ভাই, মিশেরা মানে বোন। প্রায় স্বামী বিবেকানন্দের স্টাইলে

'মাননীয় ভাই বোনেরা' বলে সম্বোধন করতেই উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে গেল, তারপর আরো দু-লাইন সাঁওতালীভাষায় কথা বলে এস. ডি. ও সাহেব ফিরে এলেন বাংলায়, কারণ সাঁওতালীভাষাটি তিনি শিখছেন সদ্য, তাতে পুরো বক্তৃতা চালানো যায় না। অতএব আদিবাসীদের সম্পর্কে বেশ ভাবগম্ভীর চোখা চোখা কিছু বাক্যপ্রয়োগ করে শেষ করলেন 'জোহার গোমকে কো' বলে, অর্থাৎ সবাইকে নমস্কার। বলা যায়, মিনিট দশেকের বক্তৃতায় এস. ডি. ও সাহেব শ্রোতাদের বেশ মন কেড়ে নিলেন।

মাইকম্যান স্বদেফাকে বলল, দেখেছেন দিদিমণি, অফ্‌সর বাবুরা কেমন মিঠেন-মিঠেন বক্তৃতা করেন, শুনলে প্রাণ জুইড়ে যায়।

প্রজেক্ট অফিসার কানে-কানে বললেন এস. ডি. ও-কে, বেশ জমিয়ে দিয়েছেন চক্রবর্তীদা, এস. ডি. ও না হয়ে রাজনৈতিক নেতা হলে অনেক ভোট পেতেন।

এস. ডি. ও সাহেব মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন, ওদিকে শ্রোতারা প্রচুর হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন তাঁকে। রাজকুমার হাঁসদা মাইকে বললেন, এস. ডি. ও সাহেব যে আদিবাসী ভাষা শিখছেন, আদিবাসীদের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছেন, এজন্য তাকে ধন্যবাদ।

কিন্তু এস. ডি. ও সাহেবের তখন আর বেশি সময় নেই অভিনন্দন নেবার, ততক্ষণে তাঁর মাথায় ঢুকে পড়েছে ড্রাগ্‌স্‌-এর সেমিনার, আবার কিছু ভাবগম্ভীর বাক্যপ্রয়োগ করতে হবে তারই খসড়া করে নিতে শুরু করলেন মাথার ভেতর, এবং চলে যাওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে মুহূর্তে মিলিয়ে গেলেন জীপের ধুলো উড়িয়ে।

এ্যামপ্লিফায়ারের সামনে তখন দাঁড়িয়ে পড়েছেন কোড়া সম্প্রদায়ের একজন বক্তা, তিনি দাবী করছেন একটি হাসপাতালের।

বিকেল পড়ে আসতেই কেউ কেউ বললেন, বক্তৃতা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলা হোক, দশ-এগারটা নাচের দল এসে পড়েছে, প্রত্যেককে অন্তত দশ-পনের মিনিট সময় দিলেও শেষ হতে অনেক রাত হয়ে যাবে।

কাঞ্জিলাল সাহেব অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছিলেন, তাঁকেই সবচেয়ে দূরে ফিরতে হবে, অতএব তাঁর বক্তৃতাটা হয়ে গেলে তিনি চলে যেতে পারেন। তিনি গোটা দুয়েক টিউবওয়েল করার প্রতিশ্রুতি দিতেই হাততালি পেলেন বেশ। কাঞ্জিলাল সাহেবের বলা শেষ হতে দে সাহেবের পালা। কিন্তু তিনি একবার মাউথপীস পেলে আর ছাড়তে চান না। কাঞ্জিলাল সাহেব উঠতেও পারছেন না,

কারণ বক্তৃতা শেষ করেই চলে যাওয়াটা ভালো দেখায় না। এস.ডি.ও সাহেবের না হয় আরো সেমিনার-টেমিনার আছে। ফলে দে সাহেবের কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়। দে সাহেব গত চার-পাঁচ বছরে আদিবাসীদের এত ভালোবেসেছেন যে মিনিট পঁচিশ অতিক্রান্ত হবার পর ডায়াসে অতিথি এবং নিচে শ্রোতা, উভয় পক্ষেই উসখুস শুরু হয়ে গেল। দে-সাহেব ততক্ষণে আদিবাসীদের ইতিহাস থেকে শুরু করে আগামী বিশ বছরের রূপরেখা বলে চলেছেন।

বিশেষজ্ঞ রায়বাবু পাশে বসা মণ্ডল সাহেবকে বললেন—দেখছেন, শ্রোতারা বেশ অধৈর্য হয়ে পড়েছে।

মণ্ডলসাহেব সায় দিলেন, ঠিকই, এতজন বক্তা যখন, তখন সবারই সময় সংক্ষেপ করা উচিৎ।

শেষে ত্রিশ মিনিট পার করে তিনি বসলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন সবাই, এবং রাজকুমার হাঁসদা তাঁর এই দীর্ঘ বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, দেবাবু যে তার মূল্যবান সময় নষ্ট করে আদিবাসীদের মঙ্গলের জন্য এতক্ষণ বললেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

দে সাহেবের পর মণ্ডল সাহেব, কিন্তু মাইকে বলার সুযোগ পেয়ে তিনিও সময় সংক্ষেপ করার কথা বেমালুম ভুলে গেলেন, এবং দে সাহেব দু-একবার পিছন থেকে জামা টেনে ধরার পরেও পাক্কা বাইশ মিনিট।

শ্রোতারা যেমন উসখুস করছে তেমনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন রামবাবুও। তিনি সেমিনারে পড়বেন বলে পৃষ্ঠা তিরিশেকের একটা ভাবগম্ভীর গবেষণামূলক লেখা নিয়ে এসেছেন, রাত হয়ে আসছে দেখে তিনি উদ্বিগ্নভাবে তাকাচ্ছেন রাজকুমারবাবুর দিকে।

এদিকে রাজকুমার হাঁসদার কাছে ততক্ষণে আরো কয়েকটি স্লিপ এসে গেছে, শ্রোতাদের মধ্যে আরো কেউ কেউ আদিবাসীদের দাবীদাওয়া সম্পর্কে বলতে চান। বিবস্বান বসুও অনেকক্ষণ বসে বসে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, ভাবছেন, হয়ত এবার তাকেই বলতে বলা হবে। কিন্তু রাজকুমার বাবু স্লিপের ভেতর থেকে একটি নাম মাইকে ঘোষণা করেছেন। মঞ্চে উঠে এলেন ওরাওঁ-সম্প্রদায়ের এক প্রতিনিধি। তিনিও দাবী রাখলেন, লোধাদের জন্য যেমন স্কুল গড়ে দিয়েছে সরকার, তেমনি ওরাওঁদের জন্য একটি স্কুল তৈরি করে দেওয়া হোক।

দে সাহেব বিষয়টি তাঁর ডায়েরিতে নোট করলেন।

আরো দু-জন প্রতিনিধি মঞ্চে এসে বলার পর রাজকুমারবাবু আহ্বান করলেন

রায়বাবুকে। সেইসময় হঠাৎ শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, এবার নাচ শুরু করে দিলে হ'ত না?

রায়বাবুর তিরিশ পৃষ্ঠার বক্তৃতাটি দেখে বিবস্বান বসু চুপিচুপি বললেন, মিঃ রায়, একটু সংক্ষেপ করবেন, এখন আর বেশি বক্তৃতা চলবে না।

শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে বেশ বিব্রত বোধ করলেন রায়বাবু, বেশ খেটেখুটে প্রবন্ধটি লিখে এনেছিলেন তিনি, এখন সেটি বোধহয় মাঠে মারা যায়। বিবস্বান বসুর দিকে কাঁচুমাচু মুখে তাকাতেই তিনি আবার বললেন, আপনি সব পাতা থেকে দু-চার লাইন করে পড়ে যান, এখন আর কেউ বক্তৃতা শুনবে না। শুনে ভীষণ অসহায় দেখালো রায়বাবুকে। তিনি পড়া আরম্ভ করলেন বটে, কিন্তু এমন খটোমটো উদ্ধৃতিতে ভরা প্রবন্ধ শুনে আদিবাসীরা হাই তুলতে শুরু করলেন। থাকতে না পেরে সাঁওতালদের একটি দল মাদলে দ্রিদিম দ্রিদিম শব্দ তুলতে থাকলো এবং তাদের সামনে কয়েকজন মাদলের তালে তালে নাচও শুরু করে দিয়েছে। রায়বাবু পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে সেদিকে তাকিয়ে দেখে থতমত খেয়ে যাচ্ছেন। এইসময় রাজকুমার হাঁসদা মাইকে এসে বললেন, আমাদের আলোচনা-চক্র প্রায় শেষ হয়েছে. আপনারা ধৈর্য ধরে একটু অপেক্ষা করুন।

বিবস্বান বসু একফাঁকে এসে রায়বাবুকে বললেন, এখন আর বক্তৃতা কেউ শুনবে না মনে হচ্ছে। চটপট কাগজ বন্ধ করে বসে পড়ুন। আমিও আর বলব না ভাবছি। লোকে এখন নাচ দেখতে চাইছে।

রায়বাবু বসতেই রাজকুমার হাঁসদা নাচের অনুসন্ধান শুরু করতে যাবেন, হঠাৎ দেখলেন মাইকম্যান এসে দাঁড়িয়েছে, বোধহয় মাউথপীস উপর-নিচ করার জন্য। কিন্তু না, দেখলেন মাইকম্যান হঠাৎ পরিষ্কার চাঁচাছোলা গলায় মাউথপীসের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করেছে, অফসরবাবুরা, সভাপতিবাবু, ভায়েরা, বোনেরা, মায়েরা আমি মাইকম্যান, আমারে কেউ বক্তিমে করতে ডাকেনি, তবু সব বাবুরো দু-চার কথা যখন বলছেন, আমারো একটু বক্তিমে করতে ইচ্ছে হল। আমার নাম ঈশানচন্দ্র দিগার। আমি জাতে লোধা। যেসব বাবুরো এখেনে এয়েচেন, তাঁরা কেউ অফসর, কেউ বই লেখেন। বইতে লেখা আছে, লোধারা চোর। তা বাবুরো, আমি চোর নই। আমি এতক্ষণ বাবুদের বক্তিমে শুনতেছিলাম। সব মিঠেন মিঠেন কথা বাবুদের। গাঁয়ের ভেতর এয়েছেন, আমাদের, আদিবাসীদের ভাগ্যি বটে। কিন্তু এইসব অফসরবাবুদের অফিসে গেলে তাঁরা আমাদের আর চিনতে পারেন না। সিলিপ দিয়ে বসে থাকতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এস.ডি.ও

সাহেব এলেন, বক্তিমে দিলেন, হুস করে জীপের ধুলোয় আদিবাসীদের নাকমুখ ভরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। কি মিঠেন মিঠেন সব কথা। তা তাঁর অফিসে আদিবাসী সার্টিফিকেট চাইতে গেলে কী হয়রানি। ছ'মাস পেরিয়ে যায়, ন'মাস পেরিয়ে যায়, সেই কাগজ আর মেলে না। বলেন, বি.ডি.ও-র রিপোর্ট চাই। বি.ডি.ও আপিস গেলে বলে হবে হবে, তাড়া কিসের। কেবল দিন ছায়। বি.ডি.ও আপিস গেলে এস.ডি.ও আপিস গেলে অফসরবাবুদের গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢোকে কার সাধ্যি। কেরানীবাবুদের কাছে ফাইল থাকে, তা গরীবগুর্বো লোক কেরানীবাবুদের কাছ থেকে ফাইল বার করতে জেরবার হয়ে যায়। এখানে আদিবাসী দপ্তরের অফসর আছেন, কী মিঠেন ব্যাভার, কিন্তু আপিসে গেলে তাঁরা আর চিনতে পারেন না। লোধাদের জন্যি ইস্কুল হয়েছে, পাকা বাড়ি, পাকা মেঝে, ছেলেরা পাকা মেঝের উপর রাতে ঘুমুতি পারে, কি ভাগ্যির কথা। কিন্তু তাদের খাবার টাকা জোগাড় করতি হিমশিম খেয়ে যায় নতুন মাস্টার। যা টাকা আছে, তাতে কুড়িদিন পর টাকা ফুরুয়ে যায়। তখন মাষ্টার খাবার জোগাড় করবে, না পড়াবে। ওই স্কুলে আমার বউ-বিটি রান্নার কাজ পেয়েছে, মাসে ষাট টাকা মাইনে। ছ'মাস চাকরি হয়েছে, রাঁধুনির মাইনে ছায় না গরমেণ্ট। অফসরবাবুকে কখনো দেখতে পেলে জিজ্ঞেস করি। তা বাবুরো বলে, গরমেণ্টকে লেখা হয়েছে, এই ছাখো কাগজ। তা বাবু, কাগজ দেখলি কি আমাদের পেট ভরবে? তা ঘুরতি ঘুরতি এখন সব ছেড়ে দিইছি। বউ-বিটিকে বলিছি, তোর ট্যাকা লাগবেনি। মনে কর, গরীব গবরমেণ্টকে দান করে দিয়েছিস।

রাজকুমার হাঁসদা বিব্রত হয়ে বললেন, এই দিগার, এসব কথা বলতে নেই। তুমি যাও, বোসো।

মাঠের লোক কিন্তু হাঁ করে শুনছে মাইকম্যানের কথা, সারা মাঠে অদ্ভুত নিঃস্তব্ধতা। যারা নাচ শুরু করেছিল, তাদের শিরদাঁড়া সব শক্ত হয়ে গেছে, আর নাচতে পারছে না। মাইকম্যান থামলো না, বলে চলল—গাঁয়ে বাবুরা টিউবওয়েল পুঁতে যায়, তা বছর ঘুরতে না ঘুরতে কি বলে, চোক্‌ড্‌। তা কিসে চোক হয় নাক হয় কান হয়, আমরা তা জানিনে, শুধু দেখি গাঁয়ের লোক জল খেতে পায় না। অফসরবাবুরো পাকাবাড়িতে থাকে, গাড়ি করে ঘুরে বেড়ায়, তারা কি আমাদের দুঃখুর কথা বুঝতি পারেন, না জানতি পারেন? তবু একটা সিমিনার হল বলে এতগুলান অফসরবাবুরে আমরা চোখি দেখতি পেলাম। কারুরে তো বড় একটা গাঁয়ে দেখা যায় না—

রাজকুমার হাঁসদা ছুটে এসে বললেন, দিগার, শোনো, শোনো, এটা আলোচনাচক্র, এখানে অভিযোগ জানানোর কথা নয়। তাছাড়া ওঁরা আমাদের গাঁয়ে এসেছেন, এখানে এসব কথা বলতে নেই। এরপর আমাদের নাচ-গান শুরু হবে।

কিন্তু সমস্ত মাঠ তখন নিঃশ্বাস বন্ধ করে ঈশানচন্দ্র দিগারের কথা শুনছে, এই কথাগুলোই তো তাদের মনের কথা, সকাল থেকে না খেয়েদেয়ে তারা বসে আছে, এই কথাগুলোই শুনবে বলে। এরপর কি আর নাচগান মানায়?

চক্ষু বোজা চক্ষু খোলা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

লঞ্চ থেকে নেমে বালির ওপর দাঁড়িয়ে প্রবীর মাথা ঘুরিয়ে চারপাশটা দেখতে লাগলো, তার শরীরে রোমাঞ্চ হলো।

শেষ বিকেলের লাল রঙের আলোয় সামনের প্রান্তরের শূন্যতা যেন সাধারণ শূন্যতার চেয়ে অনেক বেশি তীব্র। শূন্যতা বাতাসে উড়ছে, শূন্যতা মাটিতে শুয়ে আছে।

প্রবীর বছর চারেক আগে একবার এখানে এসেছিল। সরকারি অফিসার হিসেবে নয়, বন্ধুদের সঙ্গে দল মিলে। তখন এখানে ছিল অসংখ্য তাঁবু আর হোগলার ঘর। চতুর্দিকে গিসগিস করছে মানুষ, অনেকে মাথার ওপর ছাউনি পায়নি। শীতের মধ্যে শুয়ে থেকেছে খোলা আকাশের নীচে। সেবারের মেলায় সাত লাখ তীর্থযাত্রী এসেছিল।

সেই জায়গাটাই এখন সম্পূর্ণ নির্জন। গা ছমছম করে।

লঞ্চ থেকে জিনিসপত্র নামানো হচ্ছে, প্রবীর পেছন ফিরে তাকালো। সমুদ্র এখন রক্তবর্ণ, ঢেউ বিশেষ নেই। একেবারে দিগন্তে একটা স্থির জাহাজ; কোলরিজের কবিতার মতন, চিত্রিত সমুদ্রে একটা জাহাজের ছবি।

ভিজে বালির ওপর দৌড়োদৌড়ি করছে ছোট ছোট কমলা রঙের কাঁকড়া। অসংখ্য। প্রবীর দু'পা এগোতেই চোখের নিমেষে তারা মিলিয়ে গেল! প্রবীর আবার স্থির হতেই তারা গর্ত ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার স্বদেশ সেনগুপ্ত চেঁচিয়ে বললেন, চেষ্টা করে ছাখ, যদি একটাও ধরতে পারিস। এক বোতল স্কচ দেবো!

প্রবীর চেষ্টা করলো না। সে জানে, খালি হাতে ওদের ধরা যায় না। ঐ টুকু টুকু প্রাণী, অথচ ওদের এত সূক্ষ্ম চোখ আর কান? সন্ধের সময় ওরা গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে কি গায়ে সূর্যের রং লাগাবার জন্য!

বালির ওপর পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে ওরা এগিয়ে গেল ডাক বাংলোর দিকে।

এই বাংলোটি একেবারে নতুন। এখানে টাটকা চুনকামের গন্ধ নাকে আসে। জানলা দরজার রঙ দেখলে মনে হয় শুকোয়নি।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার স্বদেশ সেনগুপ্ত ভেতরে ঢুকেই বাথরুমের কল খুলে দেখলেন। কমোডের ফ্লাস টানলেন। তারপর গোঁফের ফাঁক দিয়ে হেসে বললেন, আমি তো কলের মিস্তিরি। আগেই এদিকে নজর পড়ে। হ্যাঁ, মোটামুটি ঠিকই আছে! আজ আর কি কিছু কাজ হবে?

সুখেন বললো, স্যার, এখন একটু চা খেয়ে নেবেন? সঙ্গে টোস্ট আর টিনের সার্ডিন মাছও আছে।

স্বদেশ সেনগুপ্ত একটু বেশি লম্বা, তাই তাঁকে ল্যাকপেকে দেখায়, কথা বলার সময় মাথাটা দোলে। বিস্ময়, রাগ, খুশীর রেখাগুলো তাঁর মুখে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। তিনি ভুরু তুলে বললেন, টিনের মাছও এনেছো নাকি?

সুখেন বললো, আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। যা চাইবেন সব পাবেন।

স্বদেশ বললেন, ধুস! সমুদ্রের ধারে এসে টিনের মাছ! কাল সকালে টাটকা মাছ জোগাড় করা চাই। মাছের নৌকো যায় এদিক দিয়ে। এখন চায়ের সঙ্গে মুড়ি মাখো, বেশ বাদাম-টাদাম দিয়ে, পাঁপড় ভেজে গুঁড়ো করে, আর কাঁচা লংকা!

লঞ্চ থেকে শেষ দুটো প্যাকেট বয়ে নিয়ে এসে নিখিল বললো, এক ব্যাটা সাধু এর মধ্যেই এসে গেছে!

স্বদেশ যেন একটা দুঃসংবাদ শুনে চমকে ওঠার মতন বললেন, এর মধ্যেই আসতে শুরু করেছে? এখনো তো দু'সপ্তাহ দেরি আছে।

নিখিল বললো, ঐ একজনকেই তো দেখলুম। প্রথমে মনে হয়েছিল, বুঝি একটা পাথর। কাছে গিয়ে দেখি বেশ গাঁটাগোঁটা এক জটাধারী চোখ বুজে বসে আছে।

স্বদেশ বললেন, ওদের আর কি! যে-কোনো এক জায়গায় বসে গেলেই হলো।

দু' সপ্তাহেরও বেশি, আরও উনিশ দিন বাকি আছে চৈত্র সংক্রান্তির গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হতে। কপিল মুনির আশ্রম এখনো খোলেনি, অযোধ্যা থেকে মোহান্ত পাণ্ডারা এখনো এসে পৌঁছোয়নি।

পাবলিক হেল্‌থ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অফিসারদের এই দলটি আজ এসেছে আগে থেকেই পানীয় জল, পয়ঃপ্রণালী, শৌচাগার, হাসপাতাল স্থাপন ইত্যাদি ব্যবস্থার

পরিদর্শন করতে। এই কাজে চীফ ইঞ্জিনিয়ারের আসার এখনই কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তিনি স্বয়ং এসেছেন বলে তাঁকে খাতির করাটাই অন্যদের প্রধান কর্তব্য। অবশ্য চীফ ইঞ্জিনিয়ার নিজেও কাজের মানুষ। কাজ ভালোবাসেন।

সুখেন আর দু'জন এসেছে কণ্ট্রাকটারদের প্রতিনিধি হিসেবে। আপাতত তাদের কাজ এই ছোট দলটির সেবাযত্ন করা। বাঘের পেছনে ফেউয়ের মতন, সরকারি অফিসাররা বাইরে সফরে গেলে তাদের সঙ্গে কণ্ট্রাকটাররা থাকবেই। এক এক সময় কে বাঘ আর কে ফেউ, তা ঠিক বোঝা যায় না।

স্বদেশ সেনগুপ্ত ছটফটে মানুষ। চা তৈরি করতে দেরি হচ্ছে বলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চল প্রবীর। পুরো অন্ধকার হবার আগে একবার সাইটটা ঘুরে দেখে আসি। গ্রাউণ্ড প্ল্যানটা নিয়ে নে। টর্চ এনেছিস তো?

জুনিয়ার অফিসারদের তুই-তুকারি করার নিয়ম নেই। কিন্তু স্বদেশ কারুর কারুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেন, তাদের বাড়িতে যান, অসুখ বিসুখ হলে খোঁজ খবর নেন, তিনি স্বদেশদা হয়ে যান।

বাইরের অন্ধকার আকাশের রঙ অনেকটা খেয়ে ফেলেছে। সমুদ্রের ওপর লাফ দিয়ে নামছে অন্ধকার। এখন বেশ জোরে বাতাস বইছে।

প্রবীর আর নিখিলকে নিয়ে স্বদেশ ঘুরতে লাগলেন কোথায় কোথায় জলের কলগুলো বসবে তা নির্দেশ করার জন্য। এর মধ্যেই একবার ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হয়ে গেছে, সমুদ্র-বাতাসের লবণ গন্ধের সঙ্গে সেই গন্ধ মিশে যায়।

এক সময় নিখিল বললো, ঐ যে দেখুন সেই সাধু!

তিনজনে এগিয়ে গেল কাছে।

একেবারে উলঙ্গ নয়, একটা সরু ল্যাঙ্গোট পরে আছেন সাধুটি। কালো শরীরে ছাই মাখা, বেশ সবল দেহ, মাথা ভর্তি জটা। সমুদ্রের দিকে মুখ করে পদ্মাসনে বসে আছেন, চক্ষুদুটি বোজা।

স্বদেশ বললেন, চেহারাখানা বেশ ইম্প্রেসিভ। খাঁটি সাধু সাধু দেখতে। তাই না?

নিখিল বললো, এই ব্যাটা গত বছর থেকেই বোধহয় এখানে রয়ে গেছে।

প্রবীর বলল আস্তে। ব্যাটা ব্যাটা বলবেন না, শুনতে পাবে।

নিখিল বললো, শুনলেও বাংলা বুঝবে না।

স্বদেশ বললেন, হিন্দিতে ব্যাটা মানে খারাপ কিছু নয়। আচ্ছা, এই সাধু

মহারাজ খায়দায় কী? এখানে কে ওকে খাবার দেবে? অথচ শরীরখানা বেশ তাগড়াই।

নিখিল বললো, জিজ্ঞেস করবো?

স্বদেশ বললেন, না, না, থাক। ধ্যান ভাঙালে যদি পাপ টাপ হয়।

প্রবীর স্বদেশের দিকে তাকিয়ে, একটু দ্বিধা করে মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলো। আপনি এসব মানেন?

স্বদেশ থুতনিতে হাত দিয়ে দ্বিধার সঙ্গে বললেন, মানি না বোধহয়, ঠিক বুঝিই না। তবে ভয় পাই। এদের দেখলেই একটা আনক্যানি ফিলিং হয়। এই ঠাণ্ডায় খালি গায়ে বসে আছে।

স্বদেশের পরনে টাই-বিহীন উলের স্যুট, নিখিল আর প্রবীরের গায়ে ফুল হাতা মোটা সোয়েটার। এখন বাতাসের বেগ বেড়েছে বলে তাতেও শীত শীত লাগছে।

নিখিল হাল্কাভাবে বললো, হয়তো এই সাধুই স্বয়ং কপিলমুনি। বছরের এই টাইমে মাটির তলা থেকে উঠে আসেন একবার করে। কপিলমুনি তো অমর।

স্বদেশ বললেন, অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস···সাতজন অমর কারা কারা যেন?

প্রবীর বললো, হনুমান, বিভীষণ, কৃপ আর পরশুরাম, এই সপ্ততে চিরজীবীনঃ!

স্বদেশ বললেন, এই লিস্টে নাম না থাকলেও কপিলমুনিও বোধহয় অমর। নিখিল ঠিকই বলেছে। পরশুরাম মাঝে মাঝে কপিলমুনির সঙ্গে দেখা করতে আসে না?

তারপর গলা নিচু করে স্বদেশ আবার হাসতে হাসতে বললেন, এই সাধুবাবাটি কপিলমুনিও হতে পারে অথবা নর্থ বিহারের কোনো খুনীও হতে পারে।

অদূরে এই তিন ব্যক্তির উপস্থিতিতেও সাধুটির চোখের পাতা একবারও খোলেনি, শরীরও একটুও নড়েনি।

একজন বেয়ারা সঙ্গে নিয়ে সুখেন সেখানে চায়ের পট, কাপ ও এক গামলা মুড়ি-মশলা নিয়ে উপস্থিত হলো।

সে বিগলিত ভাবে বললো, স্যার, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এখানেই খেয়ে নিন না।

স্বদেশ এক খাবলা মুড়ি তুলে নিয়ে বললেন, বাঃ বেশ হয়েছে। নুন একটু কম দিলে পারতে!

নিখিল চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, সাধুজী, চায়ে পিয়েঙ্গে?

কোনো উত্তর এলো না।

সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে এই নির্জনে চোখ বুজে বসে আছে যে সাধু, সে নিশ্চয়ই ভিক্ষের প্রত্যাশী নয়। চা খেতে সাধুদের কোনো নিষেধ নেই, পরিতোষ অনেক সাধুকে তা খেতে দেখেছে। এই ঠাণ্ডার মধ্যে একটু চা খেলে ভালো লাগবার কথা, তবু সাধুটি লোভ করলো না।

এর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়াটাও প্রবীরের ভাল্‌গার মনে হলো। সে বললো, চলুন স্বদেশদা, আমরা বাংলোয় যাই!

স্বদেশ বললেন, একটু সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসা যাক বরং।

কিন্তু সমুদ্রতীর বেশিক্ষণ উপভোগ্য হলো না। এ বছর বেশ জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা পড়েছে। অবশ্য, কলকাতায় এরকম ঠাণ্ডা টের পাওয়া যায় না। বাতাস এমন প্রবল যে সিগারেট টানারও উপায় নেই।

বাংলোতে বিদ্যুতের আলো আছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে স্বদেশ তার সহকর্মীদের সঙ্গে কাজের বিষয় আলোচনা করলেন, তারপর হঠাৎ কাগজপত্র ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, এনাফ! কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা। এখন একটু তাস খেলা যাক। কে কে ব্রীজ খেলবে?

খাটের ওপর বসে তাস বাঁটতে বাঁটতে স্বদেশ বললেন, ঠাণ্ডায় একেবারে কালিয়ে গেলুম। শরীর গরম করার কিছু আছে নাকি?

সুখেন বললো, আছে স্যার। সব রকম স্টক আছে। গেলাস আনছি।

সুখেন বেশ গর্বের সঙ্গে এক বোতল স্কচ এনে রাখলো বিছানার ওপর। গেলাস, সোডা এবং বরফও এলো। সত্যি সুখেনের আয়োজনের কোনো ত্রুটি নেই।

প্রবীর ভাবলো, গ্রেট ব্রিটেনের একটা ছোট্ট জায়গার বিশেষ ধরনের জল দিয়ে তৈরি হয় এই মদ। অন্য জলে এরকম স্বাদ হয় না। ওরা কত লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বোতল বানায়? পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সন্ধের পর কত লোক এই স্কচ পান করে, এমনকি গঙ্গাসাগরের মতন এমন রিমোট জায়গাতেও একটি বোতল উপস্থিত।

স্বদেশ বোতলটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, আজকাল খুব ভ্যাজাল হয়। শালারা বোতলের তলা দিয়ে গরম সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে নাকি মদ বার করে নেয়।

গেলাসে একটুখানি র ঢেলে তিনি মুখে দিলেন, ওয়াইন টেস্টারের ভঙ্গিতে জিভে ঘোরাতে লাগলেন, তারপর বললেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে।

প্রবীর বললো, স্বদেশদা, আপনি আগে খেলেন কেন? যদি বিষাক্ত হতো?

স্বদেশ হা-হা করে হেসে বললেন, ঐ যে গান আছে না, আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান! তোরা বাচ্চা ছেলে, তোদের সামনে অনেকখানি কেরিয়ার পড়ে আছে, কত ল্যাং মারামারি, কত চুকলি কাটা, কত মিনিস্টারের ইয়েতে তেল দেওয়া···

সবাই জানে, বেশি পান করার দরকার হয় না, মদের বোতল দেখলেই স্বদেশ সেনগুপ্তর নেশা শুরু হয়ে যায়। মদ্যপানের আড়ম্বরটাই উনি পছন্দ করেন, নিজে বেশি খেতে পারেন না, খেতে চানও না। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে দু' পেগ খাবেন এবং প্রচুর বকবক করবেন।

খানিকবাদে হঠাৎ এমন জোরে মেঘ ডেকে উঠলো যেন কাছেই কামান দাগা হয়েছে। স্বদেশই বললেন, জাহাজ থেকে কামান দাগছে নাকি রে?

নিখিল বললো, না, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

স্বদেশ বললেন, শীতকালে এমন তেজি মেঘ! জানিস, এক সময় এখানে সত্যি সত্যি কামান দাগা হতো!

নিখিল বা প্রবীররা এ নিশ্চয়ই জানে না। তাদের কৌতূহলী চোখ দেখে স্বদেশ আরও উৎসাহিত হয়ে বললেন, এই জায়গাটা তো সুন্দরবনের সঙ্গে কানেক-টেড ছিল এক সময়। প্রচুর বাঘ আসতো। গঙ্গাসাগর মেলার সময় বাঘের হামলায় অনেক মানুষ মরতো। বাঘেদের ফিস্ট লেগে যেত। বঙ্কিমবাবুর ঐ যে নভেলটা, কী যেন নাম, কাপালিক আর ফুলের গয়না পরা মেয়ে, হ্যাঁ, কপালকুণ্ডলা, তাতে নবকুমারকে বাঘে খেয়েছে ভেবে সবাই পালালো মনে নেই? একসঙ্গে এখানে কতগুলো বাঘ আসতো ভেবে ছাখ, যে একবার ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বাঘ তাড়াবার জন্য এখানে কামান বসিয়েছিল, তার ডকুমেণ্ট আছে।

এর মধ্যেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল প্রবল তোড়ে।

স্বদেশ বললেন, জানলা বন্ধ কর! শীতকালে এমন বৃষ্টি বাপের জন্মে দেখিনি! নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশানের ধাক্কায় ওয়েদার-ফোয়েদার সব গুবলেট হয়ে গেছে!

নিখিল বললো, গত বছর মেলার মধ্যে ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল মনে আছে? অনেকগুলো তাঁবু উল্টে গেল, লোকগুলোর কী অবস্থা! কলেরা আর ঠাণ্ডায় লাস্ট ইয়ারে প্রায় সত্তরজন ক্যাজুয়ালটি! মেলায় এত সাধু-সন্ন্যাসী আসে, সব ব্যাটার খালি পয়সা মারার ধান্ধা, ধ্যান-ফ্যান করে যে বৃষ্টি আটকাবে, সে হিম্মৎ নেই কারুর।

স্বদেশ বললেন, কলিকালে আর ব্রহ্মতেজ নেই। সব মন্দা। রাজার দোষে প্রজা নষ্ট! পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর স্বার্থের লড়াইতে বুরোক্রাট, টেকনোক্রাটরা সব হাত গুটিয়ে বসে আছে, দেশ উচ্ছন্নে যাচ্ছে!

প্রবীর বলল, স্বদেশদা, ঐ সাধুটি বৃষ্টিতে ভিজছে। ওকে এখানে ডেকে আনলে হয় না?

স্বদেশ বললেন, তুই কি ভাবছিস, এ বৃষ্টির মধ্যে সে এখনো বসে আছে? মাথা খারাপ তোর! ও নিশ্চয়ই মন্দিরে ঢুকে পড়েছে, কিংবা ওর ঠিক থাকার জায়গা আছে। ওকি চব্বিশ ঘণ্টা ওখানে চোখ বুজে বসে থাকে? ইম্‌পসিবল্। না খেলে শরীর টেঁকে না, না ঘুমোলে মানুষ বাঁচে না। সাধুই হোক আর যেই হোক। সাধুরা নেচারস কল-এ যায় না?

প্রবীর বললো, একবার দেখে আসবো?

সবাই হেসে উঠলো।

নিখিল বললো, আপনার দেখছি মশাই খুব রস! আপনার কি ওদের ওপর খুব ভক্তি আছে নাকি? সব কটা বুজরুক।

স্বদেশ বললেন, দেব-দ্বিজে ভক্তি থাকা ভালো। তাতে তাড়াতাড়ি চাকরির উন্নতি হয়। তবে কি জানিস প্রবীর, একবার দ্বারভাঙ্গায় গেসলুম, আমার বন্ধু বিষ্ণুপ্রসাদ ওখানকার কমিশনার ছিল। তার মুখে শুনেছি, ওদিককার গ্রামে প্রায়ই রাগের মাথায় কেউ আর একজনকে খুন করে। তারপর সেই খুনী পালিয়ে গিয়ে গায়ে ছাইভস্ম মেখে সাধু সেজে যায়। সাধু হলে তো আর পুলিশে ছোঁবে না। সেই ভাবে আট-দশ বছর এদিক ওদিক ঘুরে আবার গ্রামে ফিরে আসে। তখন পুরোনো কথা সবাই ভুলে যায়। আজকের সাধু বাবাটির যা চেহারার বহর দেখলুম, তাতে মার্ডারার হওয়া নট আনলাইকলি!

প্রবীর বললো, সাধু সাজতে গেলেও এতখানি কঠোর সাধু হতে হবে কেন? ঐ লোকটা যদি এমনি এক জায়গায় বসে গাঁজা টানতো, তা হলেও তো ওকে আমরা ডিসটার্ব করতুম না। শীতের মধ্যে ওরকম খালি গায়ে বসে থাকা···অনেক সাধু তো গায়ে কম্বল দেয়।

নিখিল বললো, আমাদের ইম্‌প্রেস করার চেষ্টা করছে। লঞ্চটা আসতে দেখেই ভড়ং শুরু করেছে, সে ব্যাপারে আমি ডেফিনিট!

প্রবীর বললো, ওকে ডেকে এনে জেরা করলে হয় না? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে। খুনী বলে আমরা ধরে ফেলতে পারবো না?

স্বদেশ বললেন, আমরা ওসবে মাথা ঘামাতে যাবো কেন বল! আমরা তো পুলিশ নই! আমাদের সে রকম কোনো পাওয়ার নেই।

সুখেন বললো, ঠিক বলেছেন স্যার! ওসব সাধু-টাধুদের নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার দরকার নেই। কিসে কী হয়ে যায়, বলা তো যায় না। কিছু কিছু সাধু জেন্যুইন আছে স্যার, আমি দেখেছি, ইন মাই ওউন আইজ, এই মেলায় কয়েকজন সাধু দিনের পর দিন এক জায়গায় বসে থাকে, একবারও ওঠে না। জল ছাড়া কিছু খায় না!

নিখিল বললো, পেচ্ছাব-পাইখানাও করে না? সব হজম করে ফেলে? আরে বাবা, শুধু জল খেলেও তো পেচ্ছাব করতেই হবে!

স্বদেশ বললেন, হ্যাঁ, এবারে ল্যাট্রিন করবে, মেয়েদের জন্য আলাদা ল্যাট্রিন বেশি করে বানিও, ভালো করে ঢেকে দিও। গতবারে মহিলারা ওপ্‌ন এয়ারে, ···সে বড় বীভৎস দৃশ্য, আমি স্ট্যাণ্ড করতে পারি না।

কথা অন্যদিকে ঘুরে গেলেও প্রবীরের মাথায় ঐ সাধুর চিন্তাটাই গেঁথে রইলো। তারা যখন ওর সামনে দাঁড়িয়ে চা-মুড়ি খাচ্ছিল, তখনও সে একবারও চোখ খোলেনি। সাধারণ গ্রাম্য মানুষের পক্ষে এতখানি সংযম সম্ভব? এর থেকে অনেক কম সংযমেও তো তার ভেক ধরার কাজ চলে যায়।

কেন ওরা খালি গায়ে চোখ বুজে বসে থাকে? কী পায়? মানুষের প্রবৃত্তি হলো পার্থিব বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা। পৃথিবীর সব পুরুষই চায় এক টুকরো জমি। অন্তত একটি নারী, মাথার ওপর আচ্ছাদন, রুচিমতন পর্যাপ্ত ভোজ্যবস্তু। এরপর আরও অনেক কিছু আছে। জৈব প্রবৃত্তিই তাকে শিখিয়ে দেয় সন্তান উৎপাদন করতে, প্রকৃতি সেই সন্তানদের গায়ে মায়া মাখিয়ে দেয়।

বড় বড় দার্শনিক ও শিল্পীরা হয়তো এইসব ভোগ ও মায়ার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন, তাঁদের মনোজগতের পরিশীলন, তাঁদের অহংকার তাঁদের নিজস্ব বাসনার পথে চালায়। কিন্তু হাজার হাজার সাধু, অধিকাংশই অকাট অশিক্ষিত, তারা সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে ছাই মেখে ঘুরে বেড়ায় কিসের টানে? পাগলামি? নিষ্কর্ম বাউণ্ডুলেপনার লোভ? কিংবা কবে কে একজন পারলৌকিক মুক্তির গুজব ছড়িয়ে গেছে, এরা ভেড়ার পালের মতন সেইদিকে ছুটছে?

এরা কী করে এবং কেন এত শারীরিক কষ্ট সহ্য করে, সেটাই প্রবীরের কাছে ধাঁধার মতন লাগে। আশ্রম বানিয়ে যে-সব সাধু মহারাজরা প্রচুর চেলা চামুণ্ডা সংগ্রহ করে, বড়লোকের বউদের দিয়ে পা টেপায়, তাদের কথা সে বোঝে।

কিন্তু এই যে লোকগুলো, এরা ধর্মেরই বা কী জানে ? এরা পার্থিব সুখ অস্বীকার করার মতন মনের জোর পায় কোথা থেকে ?

মুগির ঝোল, খাঁটি ঘিয়ের পরোটা আর আলু-ফুলকপির তরকারি দিয়ে ডিনার সারা হলো। স্বদেশের এরই মধ্যে নেশায় ও ঘুমে চোখ টেনে আসছে। নিখিল প্রচুর টেনেও আবার খুলেছে দ্বিতীয় বোতল। তার সঙ্গে আরও দু'একজন আছে।

সুখেন বললো, সাধুবাবার সামনে কয়েকটা চাপাটি আর তরকারি রেখে এসেছি। সাড়াশব্দ করলো না অবশ্য।

প্রবীর চমকে উঠলো।

স্বদেশ বললেন, লোকটা এখনো সেই এক জায়গায় বসে আছে ? আই মাস্ট অ্যাডমিট, কলজের জোর আছে।

সুখেন বললো, একে বলে স্যার সমুদ্রকল্প যোগ। চব্বিশ ঘণ্টা টানা ধ্যান করতে হয়। একদিন অন্তর একদিন। প্রতিবছরই এইজন্য কয়েকজন আগে থেকে আসে।

স্বদেশ জোরালো গলায় বললেন, করুক, যার যা খুশী করুক। ঠিক বারোটায় লাইট্স অফ। নিখিল শেষ করো। অন্য ঘরে আলো জললেও আমার ঘুম আসে না।

বৃষ্টির সেই বেগ কমে গেলেও একেবারে থামেনি। টিপটিপ করে পড়ছে এখনো। জানলার বাইরে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ। যেন এই বাংলোটাকে হঠাৎ ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে প্রবীর শুয়ে পড়লো স্বদেশের পাশের খাটে। নিখিলরা অন্য ঘরে টর্চ জেলে মদ্যপান চালিয়ে যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে তাদের ফিসফিস কথা ও হাসির শব্দ। এক সময় তাও থেমে গেল। স্বদেশ অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়ে নাক ডাকছেন।

প্রবীরের ঘুম আসছে না। সাধুটা বৃষ্টির মধ্যেও বসেছিল ? উন্মাদ ছাড়া একে আর কী বলা যায় ? এ যেন তার প্রতিই ব্যক্তিগত অপমান। সে তো অনেক কিছুই চায়। সাচ্ছন্দ্য চায়, ভালোবাসা চায়, রতি-সুখ চায়, ইচ্ছে মতন টাকা খরচ করতে পারলে আনন্দ হয়। আর ঐ লোকটা এসব কিছুই না চেয়ে বালির ওপর চোখ বুজে বসে থাকবে কেন ?

মৃত্যুর পর আর কিছু নেই, যদি বা থাকেও তার সামান্যতম আভাসও পৃথিবীর

মানুষ আজ পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য ভাবে জানতে পারেনি, তবু বেঁচে থাকার মূল্য-বোধকে তুচ্ছ করে মৃত্যুর পরের পরমার্থের জন্য এমন হ্যাংলামি করে কেন মানুষ ?

চার পেগ হুইস্কি খেয়ে প্রবীরের মাথা গরম হয়ে গেছে, সে বিছানায় ছটফট করছে।

এক সময় সে উঠে পড়লো। জগ থেকে ঢকঢক করে জল খেল খানিকটা। তারপর গায়ে একটা শাল জড়িয়ে, টর্চ হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

মাথাটা একটু টলটল করছে প্রবীরের। স্কচ খাওয়া অভ্যেস নেই, প্রবীরের পক্ষে একটু বেশিই হয়ে গেছে। সে জোরে জোরে পা ফেলতে লাগলো।

টর্চের আলো বুলিয়ে বুলিয়ে জায়গাটা খুঁজে পেয়ে গেল প্রবীর। সাধুটি সেখানেই রয়েছে, ঘুমোয়নি, বা শুয়ে পড়েনি। একটা শালপাতার ঠোঙায় পাশে পড়ে আছে রুটি ও তরকারি, সে ছোঁয়নি বোঝা যায়।

আকাশ মেঘলা হলেও একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার নয়, আবছাভাবে চার-পাশটা দেখা যায়। হয়তো সমুদ্রের একটা নিজস্ব আভা আছে।

সরকারি লঞ্চটি ফিরে গেছে নামখানায়, দিগন্তে ছবির মতন জাহাজটিও এখন অদৃশ্য। শুধু সমুদ্রের ঢেউয়ের জীবন্ত শব্দ।

এখানে ওকে কেউ দেখছে না, তবু কেন এই কৃচ্ছ্রসাধনা ? নাকি ওর ধারণা, আকাশ থেকে কেউ উকি মেরে দেখে ?

ধ্যান করার জন্য কি চোখ বুজে থাকার কোনো দরকার আছে ? তো চোখ মেলে সাধারণত দেখা যায় একটাই দৃশ্য, চোখ বুজে থাকলে দেখা যায় অনেক কিছু। যা খুশী ! কিংবা এরা চোখ বুজে থাকতে থাকতে শুধু একটা কিছুরই চিন্তা করে, সেটাই দেখা অভ্যেস করেছে ? কী সেটা, কোনো মূর্তি ? পাথর কিংবা পেতলের একটা পুতুল ?

বৃষ্টি অগ্রাহ্য করেও বসে আছে এই মানুষটি, তাতে তার মুখে একটা গরিমা ফুটে উঠেছে ঠিকই, মাথার জটা ভেজা, সারা গা চকচক করছে। কিন্তু সে একেবারে নিঃসাড় নয়, প্রবীরের উপস্থিতিও টের পেয়েছে মনে হয়।

প্রবীর টর্চ নিবিয়ে দিল, সাধুটিকে ডাকলো না। একটু দূরত্ব রেখে সে-ও বসে পড়লো ভিজে বালির ওপর। তারপর সে একটা সিগারেট ধরালো।

সে এখানে কেন এসেছে তা সে নিজেই জানে না। সাধুটিকে কোনো আঘাত দেবার ইচ্ছে তার বিন্দুমাত্র নেই। সে কোনো প্রশ্নও করতে চায় না। যে-কোনো প্রশ্নেরই তো এ ধরাবাঁধা মুখস্থ বুলি শোনাবে। কিংবা এর যদি নিজস্ব কোনো

উপলব্ধি থাকে, তা প্রকাশ করার ভাষা কি এর আয়ত্তে থাকতে পারে ? মামুলি কথা শুনে লাভ কী ?

একটা প্রবল কৌতূহল হয়েছিল, লোকটি এখনও বসে আছে কিনা দেখার জন্য। লোকটি না থাকলেই যেন প্রবীর খুশী হতো। এখন তারও চলে যেতে ইচ্ছে করছে না।

একজন চোখ বোজা মানুষের দিকে চোখ খুলে তাকিয়ে থাকারও কোনো মানে হয় না। প্রবীর চোখ বুজলো।

প্রথমে অন্ধকার। কালোর সঙ্গে একটু নীল মেশানো। একটু একটু কাঁপছে। তারপরেই সে দেখতে পেল কৃষ্ণের মুখ। বালক কৃষ্ণ। ঠোঁটে মৃদু মৃদু হাসি, মাথায় ময়ূরের পালক, একেবারে জীবন্ত। সেই সঙ্গে সে যেন একটা গানও শুনতে পেল, 'হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু, দীনবন্ধু জগৎপতে···'

প্রবীরের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। সাধু সংসর্গে এসেই তার কৃতিদর্শন হয়ে গেল ! এটা আসলে কিছুদিন আগে দেখা 'মীরা' সিনেমার একটা টুকরো দৃশ্য। বাংলা গানটা বদলে গিয়ে হলো, ম্যায়নে চাকর রাখো জী, পাশ থেকে উঁকি মারলো হেমা মালিনী !

তারপরেই সে দেখতে পেল, শত শত স্ত্রীলোক উন্মুক্ত স্থানে বড় বাথরুম করতে বসে গেছে, একটু দূরে নাক কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছেন স্বদেশদা। তারপর স্বদেশদা নিজের হাতে ল্যাট্রিনের ছাউনি বসাবার জন্য বাঁশ পুঁতছেন। ঠিক যেন স্বপ্নের মতন পরিবর্তিত হচ্ছে দৃশ্য, শর্মিলা তরতর করে নেমে যাচ্ছে মেট্রো স্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে। তার স্তনদুটি দোলে, পিঠের ওপর ভিজে চুল···যখন একলা অন্যমনস্ক থাকে, তখন শর্মিলাকে বেশি সুন্দর দেখায়··· । বাবা বাজার করে ফিরলেন, কাঁধ দুটো ঝুলে গেছে, চোখের নীচে কালো দাগ···

এক সময় প্রবীরের চোখে জল এসে গেল। নিজেই সে বুঝতে পারলো না, তার হঠাৎ কান্না পাচ্ছে কেন ? কেনই বা এখানে সে ঠাণ্ডার মধ্যে বসে আছে ? নেশার ঝোঁক, তা ছাড়া আর কী ! এই সাধুটিও সেরকম কোনো নেশাতেই মেতে আছে ? গাঁজার চেয়েও উঁচুদরের কিছু ? আত্ম-নির্যাতনের নেশা ? এক ধরনের মেসোবিজম !

প্রবীরের এক একবার মনে হচ্ছে, সে যদি এর মতন হতে পারতো ! পরমার্থের প্রত্যাশী হয়ে নয়। এইরকম সমুদ্রের ধারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকার মতন বৈরাগ্য তাকে আকর্ষণ করছে। কিছুই না চাওয়া। চাকরিতে উন্নতি নয়, প্রেমের

জন্য কাঙালপনা নয়, সংসারের দায় দায়িত্ব থেকে মুক্তি··· । আসলে কি প্রবীর সত্যিই এরকম হতে চায় ? না, এও এক ধরনের ইচ্ছের বিলাসিতা। কোনো সুন্দর বাচ্চাছেলেকে খেলা করতে দেখলে হঠাৎ যেমন মনে হয়, আহা যদি ঐ বয়েসটায় ফিরে যেতে পারতুম ! আসলে কেউই শৈশবে ফিরে যেতে চায় না। পরিণত বুদ্ধি-বিবেচনা নিয়ে শৈশবে ফিরে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসবে !

এই ধরনের সাধুরা, কিংবা প্রতিদিন দেখা অজস্র সংসারী মানুষও তো প্রায় শৈশবের স্তরেই রয়ে গেছে। সভ্যতার অনেক নীচের সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই সন্তুষ্ট। মূর্তিহীন যে শিল্প, কাহিনী বা বক্তব্যহীন যে কাব্য, কথাহীন যে সঙ্গীত, তার মর্ম, তার যে নিগূঢ় উপভোগ, তা এরা জানলোই না। একটি নারীকে পাওয়া কিংবা না-পাওয়া নয়, অতি সামান্যক্ষণের জন্য চোখে চোখ রাখলে যে মাধুর্যের তরঙ্গ, তার মূল্য কি কম ! জীবনে পরম পাওয়ার চেয়ে তাৎক্ষণিক ছোট ছোট পাওয়ার যে মূল্য অনেক বেশি, মানুষের সভ্যতাই তা শিখিয়েছে, তবু বহু মানুষ এখনো তা জানলো না।

চোখ খোলার কি কোনো শব্দ আছে ? প্রবীর যেন সেই রকমই একটা শব্দ পেল। সে নিজে চোখ মেলে দেখলো, সাধুটি তার দিকে তাকিয়ে আছে।

একবার একটু শিহরণ হলো প্রবীরের। যদি সত্যিই নর্থ বিহারের খুনী হয় ?

তারপরই সে ভয়টা কাটিয়ে উঠলো। সাধুটির দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে বিস্মিত কৌতূহল।

প্রবীর কোনো কথা বললো না, তার কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। এই সাধুটি যদি কিছু জানতে চায় তো প্রশ্ন করুক।

বৃষ্টি থেমে গিয়ে মেঘ সরেছে, মাথার ওপর এক ঝলক শীতের আকাশ, চাপা অন্তরীক্ষের আলো। সমুদ্র বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

ওরা তাকিয়ে রইলো পরস্পরের দিকে।

কোনো কথা নেই, কথার কোনো প্রয়োজনও নেই বোধহয়।

প্রবীর বুঝতে পারলো, অনেক ব্যর্থতা, ভুল ঠেলে ঠেলে জীবনটাকে নির্মাণ করে যেতে হবে। সেই এগিয়ে যাওয়াটাই একটা রোমাঞ্চকর অভিযান। যার সেই অভিযান সম্পর্কে আগ্রহ নেই, সে আকাশের দিকে তাকিয়ে ধ্যান করুক। সেও ওতে আনন্দ পাচ্ছে। তবে সেও নির্লোভ, সর্বত্যাগী নয়, সেও কিছু চাইছে। সেও পারলৌকিক অলীকের কোনো চরম পাওয়ার জন্য আত্মনিগ্রহ করে যাচ্ছে।

এতে নতুনত্ব কিছু নেই, গ্রামীণ সভ্যতার আমল থেকেই চলে আসছে এমন। এখন সিনেমাতেই কৃষ্ণকে দেখা যায়।

সাধুটির ওষ্ঠে কোনো কাঠিন্য নেই, তাই প্রবীরও মুখখানা হাসি হাসি করে রেখেছে। প্রবীরের গায়ে একটা শাল জড়ানো, এই লোকটি খালি গায়ে, এরা দু'জনে যেন দুই ভূমণ্ডলের প্রতিনিধি।

এই লোকটির মতন ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখ বুজে ধ্যান করার প্রবৃত্তি নেই প্রবীরের। কিন্তু চোখ মেলে চেয়ে থাকতে সে অনায়াসেই পারে অনেকক্ষণ। পকেট থেকে সে সিগারেট দেশলাই বার করলে, কিন্তু সাধুটির দিক থেকে চোখ সরালো না। ছাখো, তুমি আমাকে ছাখো, আমিও তোমায় দেখছি। তোমার যদি বিশ্বাসের প্রবল শক্তি থাকে, আমার অবিশ্বাসের জোরও কম নয়। তুমি এই জীবনটা বাউণ্ডুলের মতন ঘুরে ঘুরে চাইছো পরবর্তী জীবনের অমূল্য আশ্রয়। আমি বিবর্তনের চক্রে পাক খেতে খেতে এখানে এসে পৌঁছেছি, আমি জানি, মানুষের কোনো আশ্রয় নেই, সে নিজেই ক্রমশই অতি মানব থেকে অতি মানবতর হতে থাকবে, যদি না তার আগে সে নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে।

ওরা দু'জনে চেয়ে আছে, শুধু চেয়ে আছে।

কতক্ষণ পর, এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা ? সাধুটিই আগে উঠলো। সোজা এগিয়ে গেল জলের দিকে। প্রবীর জলের তোলপাড় শব্দ শুনতে পেল, সাধুটি স্নান করছে। এই মধ্য ডিসেম্বরের শেষ রাতে। হয়তো ভালোই লাগে।

সাধুটি আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসলো। এখন সে গুণগুণ করে গানের মতন একটা শব্দ করছে। খুব শীত লাগলে সম্পূর্ণ বেসুরে মানুষের গলা থেকেও এরকম আওয়াজ বেরোয়। প্রবীর লক্ষ করলো, সাধুটি রীতিমতন কাঁপছে এখন।

সে শালপাতার ঠোঙা খুলে খাবার খেতে শুরু করলো। তার খাওয়ার ভঙ্গিটি শিশুর মতন। মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে সে দেখছে প্রবীরকে। এখন তার চোখের ভাষা বোঝা অনেক সহজ।

প্রবীর উঠে গিয়ে তার শালটা খুলে সাধুটির গায়ে জড়িয়ে দিল। সে আপত্তি করলো না। দ্রুত খাবারগুলো শেষ করে লাজুক গলায় বললো, একটা সিগ্রেট !

প্রবীর সিগারেট দিয়ে খুব বন্ধুর মতন ভঙ্গিতে দেশলাই জেলে নিয়ে গেল তার মুখের কাছে।

আসলে তো ওরা অনেকদিনের চেনা !

জাগো মসৃণ ত্বক

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

—কেউ এসে পড়বে না তো ?

—কে আসবে ?

—তোমার বৌয়ের অসুখের খবর পেয়ে কেউ যদি এখানে খোঁজ নিতে আসে ?

—কে আসবে ? সবাই তো জানে তোমার দিদি নার্সিং হোমে। সেখানে যাবে।

—না। তেমন কেউ, যে জানে ওর খুব অসুখ, কিন্তু কোথায় আছে জানে না !

—তুমি তোমার বর পার্থর কথা ভাবছ তো ? আমি ল্যাচ-কী'র ওপর একটা ছোট্ট নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছি : উইল বী ব্যাক অন মানডে ইভনিং।

—আমি আমার বর পার্থর কথা ভাবছি না। তোমার ছেলে পুনপুনের কথাও ভাবছি না।

—তাহলে ?

—ধরো, এমন কেউ এল যে নিরক্ষর। যে দেখতে পায় না। কানে শুনতে পায় না। যে বোবা। আমি তার কথা ভাবছিলাম।

—আমাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে তেমন কেউ নেই।

'আছে গো', মুখ ফিরিয়ে অমিয়র কপাল থেকে চুল সরিয়ে দেয় নীরা, আছে একজন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়…'

অমিয় বলতে চেয়েছিল, 'নীরা, তুমি কে, কার কথা বলছ বলতো ?' কিন্তু তাকে 'নীরা তুমি কে' পর্যন্ত বলতে দিয়ে, ঠোঁটে হাত চাপা দিয়ে, 'চুপ করো। আর একটাও কথা বোলো না' বলে সে অমিয়র ঠোঁটে হাতের তালু ঘষতে থাকে।

অমিয়র গায়ের চামড়া পীতাভ শাদা। সে রোগা। পার্থর পেশীবহুল খর্বতার তুলনায় তার শরীর লম্বাটে ও নরম। অথচ, তুলনায় তার ঠোঁট-জোড়া কী অবিশ্বাস্য কালো এবং কর্কশ—মনে হয় যেন ঠোঁটে রঙ মেখেছে। আর কথা

বলার সময়, ছাতা-মাতা যাই বলুক সে, তার কালো ঠোঁটের চৌকো, তেকোনা, ডিম্বাকার অনবরত পাউটিং, সে তো একটা দেখার জিনিস।

দিদির নিজের হাতে পেতে-যাওয়া বিছানায় নীরা উপুড় হয়ে শুয়ে। তার পিঠে পোড়ামাটির অ্যাশট্রে। পাশে আধশোয়া অবস্থায় অমিয় অনেকক্ষণ ধরে তার পিঠে ছাই ঝাড়ছে আর কথা বলছে। অথচ, সে তার ওষ্ঠলীলা দেখতে পাচ্ছে না। তাই সে হাত বাড়িয়ে অমিয়র ঠোঁট চাপা দেয়।

ওদিকে, সিংভূমের দিকে, আদিবাসীদের হাটে পিদিমপুতুল খুব বিক্রি হয়। যদিও পিঠে নয়, মাটির মেয়েরা সাধারণত তিন থেকে পাঁচটি প্রদীপ মাথার ওপর দুই হাতে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। চাইবাসার মধুটোলায় অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কাঠুরে গোরাচাঁদ মুখার্জির বাড়িতে অমিয় একবার দেখেছিল এক যুবতী পিদিম-পুতুলের মাথায় অর্ধচন্দ্রাকারে একসঙ্গে বারোটি প্রদীপ, সরক'টা জলছে! অমাবস্যার অন্ধকার রাতে—অন্ধকার বন পেরিয়ে, অন্ধকার মাঠ পেরিয়ে, পেরিয়ে অন্ধকার নদী—গোরাচাঁদবাবুর আটচালা বৈঠকখানায় ঢুকেই আগুন মাথায় সেই আজানুলম্বিত চুল দাউ-দাউ নারী—হোক মাটির—মনে হয়েছিল, তার এলো চুলগুলিই বুঝি লকলকিয়ে উঠে আগুনের শিখা হয়ে জলছে। জলে খাক হয়ে যাচ্ছে তার মুণ্ডু। সেদিন পার্থ হাটে মহুয়া খেয়েছিল খুব। ভয় পেয়েছিল সে-ই সবচেয়ে বেশি। হেন সময় সেই প্রলয়-আলোয় গোরাচাঁদবাবুর দুই মেয়ের প্রবেশ। প্রথমে ছোট মেয়ে নীরা। পরে বড় বোন যমুনা।

১৯৭২ সালের কালীপুজোর আগের দিন। সেটা ছিল ভূতচতুর্দশীর রাত। যাক সে কথা। সে অনেক দিন আগের কথা। তখন বিপ্লব শেষ। তখন চারিদিকে অন্ধকার। পুলিশের তাড়ায় তারা দুই কমরেড সিংভূমের বনে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন ভয় পেত। ভালবাসা পেত। নিজের দেশকেও, এমন কি, ভালবাসা যেত। আজ ভয়ভীতি নেই। ভালবাসা নেই।

ল্যাচ-লক ভিতর থেকে টেনে শুধু দরজা নয়, ঘরের জানলাগুলিও সব একে-একে বন্ধ করে, অমিয় ঘর, ডাইনিং স্পেস মায় বাথরুমের সবকটি জানালার পর্দা নিশ্ছিদ্র-ভাবে টেনে দিয়েছে। বাইরে শরৎকাল। আকাশের অনুমেয় নীলে ভাসমান শাদা শাদা মেঘ···ওদের এয়ার-হোস্টেস ভাবলে ভাবা যেতে পারে। শুধু বাংলা-দেশের এ-সব কেন, পর্দার পর পর্দা টানতে টানতে অমিয় যেন বাইরের গোটা পৃথিবীটাকেই প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছে। এ-ভাবে পৃথিবী-প্রত্যাখ্যান না

করতে পারলে যথার্থ একা হওয়া যায় কী? অবশ্য, সে একা বললে সবটা ঠিক বলা হয় না। কিছুটা ভুলই বলা হয়ে যায়। কেননা, নীরা রয়েছে।

—ভিজিটিং আওয়ার্স ক'টা থেকে?

—পাঁচটা। দিদিকে দেখতে যাবে?

নীরার কোমরে কালো শাটিনের সায়া। হাতে টাইটান। ওদের বিয়ের সপ্তম বার্ষিকীতে অমিয়-যমুনায় উপহার। নীরার কব্জি উল্টে অমিয় দেখল, এখন বেলা দেড়টা।

টি-ভি'তে বোধহয় রবিবার দুপুরের আঞ্চলিক ছবি শুরু হবে। একের-পর-এক বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছে। 'নিরমা ডিটারজেন্ট টিকিয়া' শুরু হতে নীরা বলল, 'একটু সাউণ্ড দাও না!'

—না!

—দা-ও না! গানটা কিন্তু ভারি মজার। যাই বলো ঐ একটাই তো জিনিস, যা এখনো পুরনো হয়নি।

—না। কেউ যদি এসে পড়ে? বুঝতে পারবে ভেতরে কেউ আছে।

—কে আবার আসবে?

নাচতে নাচতে নিরমার ছেলে শাদা স্কার্ট পরা নিরমা মেয়েকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়েছে। এইখানেই আছে 'একশো গ্রামকা টিকিয়া নে যাদু কর দিয়া···'

পর্দার মেয়েটার লিপে প্লে-ব্যাক দিতে দিতে নীরা বলে, 'তোমার হল!'

অর্থাৎ, সিগারেট। অমিয় ওর পিঠের অ্যাশট্রেতে গুঁজে সিগারেট নেবায়। অ্যাশট্রেটা তুলে নেয়। এই যে সিগারেট নেবানো, এখানেও অমিয়র একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সে সবসময় সিগারেট নেবাবে বাঁ হাতে। ডান হাতে নেবাতে নীরা একবারও দেখেনি। নেবাবার আগে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে নেবেই। ঘোরানো মুখে জলন্ত সিগারেটসুদ্ধু তার কাঁপা-কাঁপা বাঁ-হাত অ্যাশট্রে খুঁজবে। তারপর অ্যাশট্রের মুখটা খুঁজে পাওয়ামাত্র শরীরসর্বস্ব সেদিকে হেলিয়ে যে-রকম মৌলিকভাবে সে সেই অগ্নিমুণ্ড ক্রমাগত অ্যাশট্রের মধ্যে পিষতে থাকে—আর কারুকে ঠিক অমনভাবে আগুন নেবাতে দেখতে নীরার এখনো বাকি। পার্থ তো টুসকি মেরে আগুনসুদ্ধু বাইরে ফেলে দেয়।

টিভির পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে নীরা এবার অমিয়র বুকের পীতাভ চামড়ার দিকে তাকায়। সেখানে হাত বোলায়। ঠিক যেন চীনেম্যানের বুক। লেপা-

পোঁছা। পার্থরে বুক-ভরা চুল। তবু আজ সাত-বছরে তো কিছু হল না। এদিকে দিদি এই নিয়ে তিনবার অ্যাবোর্ট করলে। ডাক্তার বলেছে, দোষ নাকি নীরার।

ছাই জানে ডাক্তার। আসলে সব দোষ ঐ মধ্যরাতের মাতাল পার্থর। কোনো রিয়েল ইন্টারেস্টই নেই। নীরা প্রমাণ করে দেবে যে যত দোষ, নন্দ নয়, পার্থ ঘোষের।

—হঠাৎ কী হল বল তো দিদির?

—দাদার বাড়িতে পরশুদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে হঠাৎ পেটে ভীষণ যন্ত্রণা! নীল হয়ে লুটিয়ে পড়ল। ডাক্তার এসে বলল, অ্যাপেণ্ডিসাইটিস। নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে যেতে ওটা ফেটে গেল। আমি যখন গেলাম, তখনও ও. টি.-তে অপারেশন চলছে।

—অপারেশন কতক্ষণ ধরে হল?

—পেট ভরা অত পুঁজরক্ত। ধুতে-মুছতে ঘণ্টাখানেক লাগল।

—পুনপুন কোথায়?

—ওকে মামার বাড়িতে রেখে এসেছি।

—স্কুলে যাচ্ছে?

—ওখান থেকে যাবে।

খাটের ছত্রিতে নীরা পাট করে ঝুলিয়ে দিয়েছে তার প্রিন্টেড চাইনিজ সিফন শাড়ি। পাশেই খাটের ধারে যমুনার বাড়িতে পরার লাল মখমলের চটিজোড়া ইংরেজি 'L' অক্ষর রচনা করে মেঝের ওপর পড়ে আছে। ছত্রি থেকে ঝুলছে যমুনার দুটি ক্লিপে-আঁটা ব্লাউজও, সেই থেকে শুকোচ্ছে।

ইংরেজি 'এল' অক্ষরটি মাথায় এলে আজো 'লাভ' শব্দটি প্রথমে মনে আসে। অমিয় ভাবে, অসুখ, নার্সিং হোম এ-সব প্রসঙ্গ এনে লাভ কী। বরং, এখন চুপ-চাপ ভালবাসা যাক নীরাকে। চুমু খাওয়া যাক তার গ্রীবায়। হাত রাখা যাক স্তনে।

যা ভেবেছিল।

'এই ওকি হচ্ছে', বরাবরের মত ঝটকা মেরে স্তন থেকে অমিয়র হাত সরিয়ে দেয় সে। পরমুহূর্তে তার প্রত্যাখ্যাত হাত সস্নেহে তুলে নিজের জঘনদেশে রাখে। এই প্রথম যে এ-রকম, তা নয়। স্তনমর্দন দূরে থাক, সে অমিয়কে কখনো স্তন স্পর্শই করতে দেয় না। শিউরে উঠে ছিটকে সরে যায়। বারবার। অথচ,

বুকে জড়িয়ে থাকলে কিছু বলে না। শুধু হাত দিয়ে ছুঁতে যাও, বলবে, না। শিউরে সরে যাবে।

দূরে সায়ার ফ্রিলের নিচে, তার প্রগলভ নিতম্ব পেরিয়ে, অমিয়র দৃষ্টি নীরার পায়ের কঠিন তে-কোনা অ্যাঙ্কল-বোন পর্যন্ত চলে যায়। একই চাহনি দিয়ে যমুনার পিঙ্ক-হলুদ ব্লাউজ ও ফেলে যাওয়া মখমল চটি-জোড়ার দিকে সে তাকিয়ে থাকে। বিষয়-বদলের জন্য অনুভূতিতে কোনো হেরফের তার চোখে পড়ে না।

—কী হল?

—বলেছি তো, হাত দেবে না ওখানে।

—কেন?

কোথা থেকে যে কী। অমিয়র সহসা মনে পড়ে যায় বা তার অতীত থেকে, ধুলো ঝেড়ে, স্মৃতি নিজেই উঠে আসে।

কোনার্কের সেই প্রখর অপর-দুপুর! চৈত্রমাস। মন্দিরের দোতলার অলিন্দে উঠে নিছক কৌতূহলবশে মৃদঙ্গবাদিনীর বাম স্তনে সে একবারটি হাত রেখেছিল। রাখতেই, তার হাতের তালুতে উঠে এসেছিল নারী-স্তনের সেই আশ্চর্য নরম ত্বক-বোধ, বজ্রাঘাত হোক তার মাথায় যদি না মৃদঙ্গবাদিনীর রক্তমাংসময় স্তনের স্পর্শ সে সেদিন না পেয়ে থাকে! তা নইলে, শরীর জুড়ে কেন তখনি সেই তা-তা-থেই মৃদঙ্গ-বোল—আত্মরক্ষার শেষ ধরতাই ছেড়ে, সব ভুলে, দু'হাত তুলে, সূর্যবালি-সমুদ্রের সেই অসহ্য দুপুরে—যখন গরম বালি উড়ে এসে পড়ছে মুখে-চোখে-বুকে—অমন উন্মাদ আবেগ ভরে সেই নারী-পাথরকে, না হলে, সে ওভাবে আলিঙ্গন করতেই বা যাবে কেন! তখনও ভালো করে গোঁফ ওঠেনি, মুখে ব্রণ ফোটেনি সবকটি। কিশোরবয়সী সেই জীবনে প্রথম মৃত্যু-অভিজ্ঞতা আজো তার গায়ে কাঁটা দেয়। মনে পড়লে, নিজেকে জাতিস্মর মনে হয় আজও। বস্তুত, অত উঁচুতে সেদিন পা ফস্কে গিয়েছিল তার। কার্নিশ ধরে কোনমতে ঝুলে পড়েছিল ভাগ্যিস।

তারপর বেশ ক'বার কোনার্কে গেছে। আর কখনো স্তনে হাত রাখেনি। মন্দির-চাতালে দাঁড়িয়ে দূর থেকে শুধু স-সম্ভ্রমে দেখে গেছে। কে জানে, দিনে দিনে আরো কত নরম হয়েছে ঐ প্রস্তরীভূত কুচযুগল—অহর্নিশি সমুদ্রের নুন মেখে মেখে!

সেদিন চৈত্রমাস। সেদিন দুপুর বেলা। সেদিন পাথর গরম। মৃদঙ্গ-

বাদিনীর লাল বেলে-পাথুরে স্তন-ত্বকের সেই ছ্যাঁকা লাগা গরম, জীবনের পরম প্রাপ্তির মত আজো তার হাতের তালুতে লেগে আছে।[১]

আঞ্চলিক ফিল্ম শুরু হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। শব্দহীন, স্বরহীন। বোবা ও নিরক্ষর। ডাব-করা না হলে সাব-টাইটেল পড়ে হয়ত বোঝা যেত কিছুটা। যে কারা কাকে কী বলছে।

—বোধহয় মালয়ালম ছবি।

নীরা উত্তর দেয় না। গা ঘেঁষে আসে। অমিয় এবার সক্রিয় হবে আশা করা যায়। এখুনি নিশ্চয় নয়। আগে ফোর-প্লে। 'সেক্স ফর দা ইউজার্স' বইটিতে যেমন লেখা আছে। বইটি তাকে পড়তে দিয়েছিল অমিয়। বলেছিল, 'আমি পড়িনি। কিন্তু, তুমি পড়ে দ্যাখো। এতে সোজাসুজি সব লেখা আছে।' নীরাও পড়েনি। তার জরায়ু কেন শুকিয়ে পাথর হয়ে যাচ্ছে, ওভাম কেন সে-পথ আর মাড়ায় না, সে-সব কথা নিশ্চিত এই বইতে লেখা নেই? কেন রে নটে মুড়োলি। না, গরুতে কেন খায়। নিঃসন্দেহে, এতেও সেই বৃত্তান্ত।[২]

—নার্সিং হোমে ক'দিন রাখবে?

—দিন পনেরো তো বটেই।

—দিদি কেমন আছে?

---

১ ত্বক মনুষ্যদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কোটি কোটি কোষে ত্বক শরীরের উপর বিছানো রয়েছে। এপিডারমিস ও ডারমিস এই দুই প্রধান স্তরে কোষগুলি ছড়িয়ে আছে। এই সব কোষ নাড়া-খাওয়া ক্যালাইডোস্কোপের মত যখন-যেমন অনন্যমেয় চকে পরস্পরের সঙ্গে দূর ও নিকট সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে। এদের গতিবিধির হদিশ পাওয়া ভার। এরা সর্বস্বীকৃত মাধ্যাকর্ষণের নিয়মগুলি মানে না। টেস্ট টিউবে রেখে লক্ষ করে দেখা গেছে, উপরের এপিডারমিস স্তর মৃত কোষগুলি শরীর থেকে যত বের করে দেয়, নিচের স্তর ওপরের দিকে জীবন্ত কোষ ততই পাঠাতে থাকে।

২ ত্বককোষের প্রধান কাজ বায়ু থেকে আর্দ্রতা গ্রহণ ও শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ। পৃথিবীর বাতাস থেকে গৃহীত আর্দ্রতা এরা শরীরময় পাঠাতে পারে। তবে এই কাজে তাদের কোনো নিয়মিত ছন্দ নেই, পর্বভাগ নেই। যদিও সর্বতোভাবে দেখলে আপাতদৃষ্টিতে ছন্দোময় বলে প্রতীতি জন্মায়। ত্বকের গতিবিধি ও সময়প্রণালী তার সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার।

—আজ ডুস দিতে হয়নি। নিজেই পায়খানা করেছে।

—তুমি আমার অফিসে একটা ফোন করলে পারতে। তাহলে আজ আসতাম না।

—বারণ করার সময় পেলাম কই। এসে ফিরে যাবে। তাই সোজা নার্সিং হোম থেকে চলে এলাম।

—বিকেলে নার্সিং হোমে যাব।

—হ্যাঁ। একটু আগে-পরে।

—নার্সিং হোম কত করে নিচ্ছে?

—আড়াই শো।

—রোজ?

—না তো কী মাসে?

—সার্জন?

—তিন হাজার।

—টাকা লাগলে নিও।

ছবিটা বেশ সিরিয়াস। ভাষা নেই, সুর নেই, শব্দ নেই। তবে রঙীন। অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও সবাই অচেনা। ধানখেতে হাঁটুজলে চারা পুঁতছিল যে আদিবাসী মেয়েটি, সে এখন ধানকলে চালের ডাঁই-এর ওপর শুয়ে। কাঁপছে। চালগুদামের দোতলায় দরজা বন্ধ হচ্ছে। মেয়েটির মুখ ভয়ে নীল। রেপ সীন।[৩]

'আমি একটু বাথরুম থেকে আসছি' বলে নীরা উঠে গেছে। রেপ শুরু হবার আগে অমিয় উপুড় হয়ে শোয়।

---

৩ কবি-সাহিত্যিকরা, যাঁদের নাকি নর নারীর প্রেম-ভালবাসার ব্যাপারে সহজাত জ্ঞান আছে, তাঁরা প্রায়ই লেখেন, প্রণয় পর্বে নায়িকার মুখে রক্তাভার কথা। তাঁরা এই রঙ-বদলের মধ্যে প্রেমের ভাষা খুঁজে পান। ডার্মাটোলজিস্টরা এ-কথা মানতে চান না। তাঁরা বলেন, সে তো রোদ লেগেও মানুষের মুখ লাল হয়। আসল ব্যাপার হল, ত্বকের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ। এপিডারমিস স্তরে তাপমাত্রা বাড়লে, তা সে রোজ বা আবেগ যে কারণেই হোক, ডারমিস স্তর লোহিত কণিকা পাঠাতে থাকে। প্রচণ্ড শীতে বা ভয়ে মুখ নীল হয়ে যায়। তার কারণ ত্বককোষের লোহিত কণিকাগুলি তখন নিশ্চল।

বেলা কত ? প্রায় তিনটে হবে। যদি পাঁচটায় নার্সিং হোমে পৌঁছতে হয়, তাহলে নীরা ফিরে এলে বিনা ভূমিকায় সঙ্গম শুরু করে দিতে হবে। এ নয় যে, তার প্রয়োজনীয় উত্তেজনা নেই। আদৌ তা নয়। আসলে, তার সমস্যা হচ্ছে পূর্ব-ক্রীড়া নিয়ে 'সেক্স ফর দা ইউজার্স' বইটি সে যে দেখা মাত্র কিনে ফেলেছিল, তার কারণ বইটির ঐ স্ট্রেট-ফরোয়ার্ড টাইটেল; কী, না, 'সেক্স, যারা করে।' কত সোজাসুজি বাংলা ভাষাতেই যত নেকু-নেকু বই : ওগো বর, ওগো বধূ! কিন্তু অমন অব্যর্থ নামের বইতেও, সে দেখল, ফোর-প্লে সম্পর্কে ঝাড়া একটি চ্যাপ্টার। এ-সব ভ্যানতাড়া তার ভাল লাগে না। বিশেষত, এক্ষেত্রে তার প্রয়োজনও নেই। নীরা কেন আসে, সে জানে। শী নীডস্ মাই সীড।

তা বলে কি নীরাকে চুমু সে খাবে না ? তার গাঢ় মেরুন লিপস্টিকে (ষাঁড়ের মড়ি থেকে তোলা বাঘিনীর ঠোঁট যেন) পিছলে যেতে যেতে তার ঠোঁট থেকে চামড়া তুলে আনবে না ? নারী-ঠোঁটের রঙ চুষে এই চামড়া খোঁজ—একেই তো যথার্থ চুম্বন বলে ? আর, এইসব আদানপ্রদানের সময় অনুভূতিদেশ থেকে কিছু আলোও এসে পড়ার কথা। পড়বে না ?[৪]

ফর্সা, বলশালী নারীশরীরে শাটিনের কালো সায়া পরে নীরা যখন বাথরুম থেকে এল—বুকে পিটার প্যান—তখন তার মাথায় অর্ধচন্দ্রাকারে বারোটি প্রদীপ, সবক'টি জলছে। আসলে, নীরা যখন ঘরে ঢুকল, আঞ্চলিক চলচ্চিত্রের ধানকলে ঠিক তখনই লেগে গেল নিঃশব্দ আগুন। এখন, ঐ দাউ-দাউ করে জলে যাচ্ছে। তারই হল্‌কা এসে। লেগেছে নীরার মুখে-চোখে। চুলে।

অমিয়র পাশে এসে শুতে গিয়ে নীরা থমকে দাঁড়ায়।

—আর-এ, আর-এ, একী। তোমার কোমরে এটা কী ?

—কোমরে কী, তা আমি জানব কী করে ?

—না-না। তুমি আমার পিঠের হুকটা খুলে দাও। খোলো শিগগির।

বলে কী মেয়েটা। ঘরময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আগুনের আভা. আলোয় আলো, এমন প্রকাশ্যে নীরা ব্রেসিয়ার খুলবে !

—এই ছাখো। ঠিক এইরকম। ঠিক আমার মতন।

---

৪ ত্বক বা চামড়ার কাছে আর্দ্রতা গ্রহণ ও বিতরণ। কিন্তু, সে নিজে চিরতৃষিত।

নীরা সগৌরবে নিজের বামস্তন তুলে নিচের দিকটা দেখায়। অমিয় লক্ষ করে, বেলেপাথুরে রঙের একটা লাল প্যাচ সেখানে। 'ঠিক এইরকম একটা প্যাচ তোমার কোমরে। এই রঙের,' অমিয়র কোমরের অ-দেখা প্যাচে তর্জনী টিপে নীরা বলল, 'আমারটাও ঠিক এইরকম। শক্ত।'

অনভিজ্ঞ ভয়ে অমিয়র শেকড় সরসর করে ওঠে। তার মুখেও আগুনের আভা, তাই তাকে আরো ভীত দেখায়। তার মাথার চুলগুলি পর্যন্ত ভয় পেয়েছে, সে টের পায়। সে একবার নিজের কোমরে হাত বুলিয়ে ছাখে। খুঁজে পায়। তার-পর নীরার স্তন ছুঁতে গিয়ে, না ছুঁয়ে, সে সভয়ে হাত গুটিয়ে আনে।

ধানকল জলছে তো জলছেই। আগুন-আভার ঢেউয়ের মধ্যে ওরা দুজন পাশাপাশি চিৎ হয়ে শুয়ে। দেওয়ালে, সিলিঙে, জানালার পর্দায়, সর্বত্র আগুন। ঘুরন্ত পাখার অগ্নিস্রাবী ব্লেডগুলোর দিকে তাকানো যায় না।

—এই শুনছ। তুমি কোনো জিওলজিস্টকে চেনো।

—জিওলজিস্ট ?

—আ-হ্যাঁ। জিওলজিস্ট !

— ?

—জিওলজিস্ট ছাড়া পাথর কে চিনবে ?

—পাথর ?

—পাথরই তো।

—একবার লুথেরান-এ গেলে হয় না। হয়ত কুষ্ঠ···

—কবে দেখিয়েছি লুথেরানে !

—ওরা কী বলল ?

—কী আবার বলবে ! বলল, পাথর। বলল, পাথর হয়ে যাচ্ছি। আমার থেকেই রোগটা তোমার হয়েছে বাপু, যাই বলো !

সারা শরীর দুলিয়ে নীরা হাসছে ! তার মুখ নিচু। চুলে-চুলে ঢাকা। সহসা, মাত্র একটা ঝটকায় মুখের সব চুল সে সাফল্যের সঙ্গে পিঠে তুলে নেয়।

'একজন ভালো জিওলজিস্ট দেখাব দুজনে, বুঝলে। গ্রানাইট হলে গ্রোথ রেট কী ওরা বলে দেবে। স্যাণ্ড-স্টোন যদি হয়' ছোট্ট হাই তুলে ও মুখে তুড়ি মেরে সে বলে, ফার্দার গ্রোথ নাকি অ্যারেস্ট করা যায়। আর চায়না ক্লে-ক্লে হলে তো কোনো ব্যাপারই না···'

নীরা বলে চলেছে। কী বলছে, সে এখন আর জানে না।

সভয়ে, সন্তর্পণে অমিয় একবার নীরার ঘাম-স্তনে হাত রাখে। মৃদঙ্গবাদিনী-অভিজ্ঞতার ঠিক উল্টো। নরম। কিন্তু, মূলত পাথর। মন্দিরের উঁচু কার্নিশে দাঁড়িয়ে সহসা সে মূলত নরম, গরম পাথুরে স্তন-ত্বক থেকে হাত তুলে নেয়।[৫]

তার মাথা টলে যায়। খুলি না ফাটা পর্যন্ত সে সবেগে মন্দির-চাতালের দিকে পড়ে যেতে থাকে।

৫ ত্বকের তৃষ্ণা অনিবারণেয়। মানুষের তৃষ্ণা সাময়িকভাবে মেটে, ত্বকের তৃষ্ণা মেটবার নয়। ত্বক শুধু জীবিতের শরীরেই বেঁচে থাকতে পারে। যারা মৃত, তাদের জন্য ত্বক কাজ করে না। জীবিত ত্বক মৃতের শরীরে সংস্থাপন করা যায় না।

ঘাতক

কল্যাণ মজুমদার

ক্রর্র—ক্রর্র—ক্রর্র—

মধ্যরাতের টেলিফোনে নিষ্ঠুরতা আছে। নৈঃশব্দ-ছেঁড়া কর্কশ শব্দের নখরতা অস্তিত্বের গভীরে সিঁধ কাটে। চকিতে চেতনা স্বক্ষেত্রে ফেরার জন্যে লাফ দেয়। শিক্ষিত পাভলভ-ক্রিয়ায় রিসিভারের লক্ষ্যে হাত বাড়ায় পূষণ।

—হ্যালো—গলায় নেশার শ্লেষ্মা ; শুষ্কতার ভার।

ওপারে কে কী বলে কিছু বোঝা যায় না। কলকাতা টেলিফোনের গুণাবলী ও উপকারিতা সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা আছে ওর—যেমন, টেলিফোনের কথা ঠিকমতন শুনতে বুঝতে পারলে কানের রোগ বা শ্রবণ-ত্রুটি সেরে যায়। কিন্তু এখন তার সময় নয়। বরং একটি প্রায়-অচেনা শব্দ ওকে ধাঁ করে বিছানায় সোজা বসিয়ে দেয়, ওর অজান্তেই ওর হাত বিছানা-বাতির বোতাম টেপে।

—টাবু—টাবু—

কে টাবু? কে ডাকছে কাকে? টাবু বলে ডাকার মতন কেউ কি আছে? টাবু কি আছে এখনো? বেঁচে?

ধৈর্যশীল রিসিভার কানে শব্দ ভাঙে, যেন চিনে বাদামের খোসা—টাবু—কালুদা—কালুদা বলছি—শুনতে পারছিস—টাবু—টাবু—

—কে—কী বলছেন—চেরা গলায় চিৎকার করে পূষণ। যান্ত্রিক চিৎকার। আছন্ন চেতনায় এখনো প্রশ্ন কে টাবু—কে কালুদা—এত রাত্রে ওকে ডাকছে কেন!

চোখে হুইস্কির কুজ্ঝটিকা, মাথায় বাষ্প ; তবু অনুভবের অতল গভীরে মোচড় —জন্মান্তর পেরিয়ে ডাক আসছে—টাবু—। মনে পড়ছে, হ্যাঁ, কালুদাকেও মনে পড়ছে। কালুদা, ফুটবল মাঠের স্বনিবাচিত কোচ ও রেফারী। সে তো অন্য জগতের অন্য যুগের কথা। সে একটা ছেলে ছিল লম্বা পায়ে দুরন্ত ছুটত, রাইট আউট থেকে রামধনু-সেণ্টার করত। মাঠের বাইরে থেকে কালুদা চিৎকার করত—টাবু—টাবু—সেণ্টার কর—সেণ্টার কর টাবু—

এতরাত্রে সেই কালুদা এখানে ফোন করছে কেন! ফুটবলের জুতো-মোজা ও তো বহুকাল চুঁড়ে ফেলেছে!

টেলিফোন বলে যায়—টাবু—তুই এক্ষুনি চলে আয়—মেসোমশাই—তোর বাবা—তোর বাবা—

বুড়োর গলার মতন ঘড়ড়্ ঘড়ড়্ শব্দ হয় টেলিফোনে। কিচ্ছু শোনা যায় না, বোঝা যায় না। কিন্তু বাবা শব্দটি পূষণের মেরুদণ্ডে স্যাঁকা দেয়। টানটান অনুভবে ঋজু স্বরে বলে, কালুদা বলুন—জোরে বলুন, একটু জোরে—বাবার কী হয়েছে—বাবা কেমন আছে—

প্রতিধ্বনির মতন কালুদার চিৎকার শোনা যায়, তুই এক্ষুনি, ঘ্যাড়ড়্ ঘ্যাড়ড়্—এক্ষুনি চলে—ঘ্যাড়ড়—কড়র্ কড়র্—ঘ্যাচ্—

—হ্যালো—হ্যালো—কালুদা—কালুদা—

পূষণের নিষ্ফল ডাকাডাকিতে টেলিফোনের গাঢ় ঘুমের কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। তবু রিসিভার ডান হাত বাঁ হাতে লোফালুফি করে, বোতাম টিপে বারকতক হ্যালো হ্যালো বলে বিরক্ত ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে টেলিফোন নামিয়ে রাখে। এখন চোখে কুয়াশা নেই, ঈষৎ জ্বালা ভাব আছে। মাথায় মেঘের বদলে অস্থির নোনা ঢেউ। সঙ্গে বিদ্যুৎ।

বিছানা-বাতির নরম আলোয় পূষণের জুবুথুবু ছায়া কাঁপে। চোখ কচলে, মাথায় চুলে হাত বুলিয়ে টের পায় বাঁ পাশের রগ টিপটিপ লাফাচ্ছে। কণ্ঠে তৃষ্ণা। অভ্যস্ত হাতে জলের গ্লাস তুলে দেখে, আধ-খাওয়া হুইস্কি বিশ্বস্ত প্রতীক্ষায়। এক পলকের থমকানি। ফেলে দেবে ভেবে ও এক চোঁকে গিলে ফেলে—হুইস্কির তলানি-স্বাদের মায়া এড়াতে পারে না। বাসি মুখে ঈষৎ বিকৃতি ফুটে মিলিয়ে যায়।

বাথরুমে যাবে বলে মেঝেতে পা রাখতেই চোখ পড়ে টেবিল ঘড়িতে। রাত সাড়ে তিনটে। সোজা হয়ে ঘাড় ঘোরাতেই সামনে দেখে ছোট ফুটবল মাঠ—"পাতিয়ালা" বিছানা। না, শূন্য নয়। শূন্য বিছানার করুণ দৃশ্য ও সহ্য করতে পারে না। মনে হয় যেন দীর্ঘশ্বাসের কুণ্ডলী উঠছে। বদলে, দুরন্ত তছনছ খেলার চিহ্নময় বিছানায় পরিতৃপ্ত ঘুমে ডুবে আছে জিজি। কে বলবে ঘণ্টা কয়েক আগেই এই নারী ছিল উন্মুখ দাঁতাল হরিণী!

জিজির শোবার ভঙ্গী, পূষণের লজ্জাহীন-চোখে-লাগে, এমন নিলাজ। অন্য-সময় ব্যবহৃত ঐশ্বর্য গোপনে নিসর্গ-মায়ায় দেখতে ভালো লাগলেও, এখন আপনা

থেকেই চোখ সরে আসে। চাদরটা ওর গায়ে টেনে দেবার কথা ভেবেও দেয় না। নিদ্রিতা সৌন্দর্য দেখার কেউ নেই আর। বরং খোলামেলা শরীরে হাওয়ার আদর লাগে ভালো।

বাথরুমে যেতে গিয়ে একবার—মাত্র একবারই—পা টলে যায় পূষণের। মানতেই হয়, কাল রাতে গান ও দাপাদাপি একটু বেশিই হয়েছে। তখন তো আর জানত না নিষ্ঠুর টেলিফোন অসময়ে ঘুম ভাঙাবে! নইলে পূষণ মিত্তিরের পা টলছে—এটা তো বছরের সেরা "স্কুপ" হতে পারত। আট পেগের পরও যে ড্রাকার, হলকোর্ড, লেভিট, স্টুয়ার্ট ভুষি করে দিয়ে অকাতরে বলতে পারে, আরে আমরা এখন পুরানো অর্থনীতিতে নেই, এখন হচ্ছে জ্ঞান-অর্থনীতি—নলেজ ইকনমির-যুগ। এদেশের ভুঁড়িদার মালিকদের বুঝতে এখনো ঢের সময় লাগবে। আরে বাবা, পূষণ মিত্তির বাপের টাকা প্যাঁদিয়ে ইংলিশ মিডিয়াম খোঁটেনি, বিলেত-আমেরিকার মাটি চেটে হেঁচকি তোলেনি, একেবারে হাঁটু ঘষড়ে ঘষড়ে মোট বইতে বইতে ফুটপাথ থেকে বালিগঞ্জ পার্ক লেনে উঠে এসেছে। চোঁয়া ঢেকুর তোলায় আমি বিশ্বাস করি না।—সেই মানুষের পা টলছে, এর চেয়ে আর কোনো বড় মিথ্যা হয় নাকি! অবশ্য মিথ্যা ও মিথ্যার অন্তর্গত সম্পর্ক বিষয়ে ফালতু গবেষণা করার সময়ের বাজে খরচে পূষণ বিশ্বাসই করে না।

চোখে-মুখে জল দিয়ে বেসিনে দুহাত রেখে সটান দাঁড়াতেই সামনের আয়নায় নিজের মুখ খুঁজে পায় পূষণ। ঠিক চিনে নিতে পারার আগেই মুখটা বদলে যায়। বাবার মুখ। অতি স্পষ্ট। একটুও ভুল হয় না, সঙ্গে সঙ্গে কী যে হয় নিজের মধ্যে, সারা সত্তা কেঁপে ওঠে। আঃ! কতকাল বাবার মুখ দেখেনি, যে-মুখ থেকে নরম স্নেহে ঝরে পড়ত একটি শব্দ—টাবু। বাবা যেন কতকাল টাবু বলে ডাকেনি! নাকি তিনি ডেকেছেন, ও-ই শোনেনি। দৌড়ের সময় কি পিছুডাক শোনা যায়?

অসুখ শুনে দিন দশেক আগেই বাবাকে দেখে এসেছিল। বয়স হয়েছে, প্রায়ই শরীর খারাপ থাকে। মাঝে মাঝে বাড়াবাড়িও হয়। খবর পেলেই তো গেছে। পূষণ আর যাই হোক, দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞানহীন ও মোটেই নয়। বরং ঐটুকুই ওর কবচকুণ্ডল—দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য-সচেতনতা। যখনই গেছে বাবার সঙ্গে কথা বলেছে খোঁজখবর নিয়েছে। কিন্তু মুখ দেখেছে কি? বাবার মুখ—নিজের বাবার—জন্মদাতার মুখ? দেখেছে কি? কেন মনে হচ্ছে বহুকাল বাবার মুখ দেখেনি? ও কি মনে করতে পারে শেষ কবে দেখেছিল বাবার মুখ? কী ছিল মুখের রেখায়? মনে আছে চোখের ভাষা? ঠোঁটের ভাঁজে খুশি ও স্নেহের স্পন্দন

ছিল কি? বাবার শরীরের ঘ্রাণ মনে আছে? মনে পড়ে কি? মনে পড়ে কি বাবার বুকের উত্তাপের স্বাদ? শেষবার টাবুর বাপ টাবুকে কী বলেছিলেন, মনে করতে পারে ও? ও তো দেখে এসেছে 'আমাদের' বাবাকে—পরিচয় পত্রে যাঁর নাম-লেখা থাকে। যিনি এক দৈবিক ও লৌকিক প্রতিষ্ঠানমাত্র। টাবু শেষ কবে দেখেছে ওর অতি নিজস্ব, নির্বিকল্প, জনক ও পিতাকে?

মনে পড়ে না। মনে পড়ে না। মনে পড়ে না। অতি গভীর থেকে একটা অচেনা আর্তবোধ গলার কাছে উঠে আসে। শরীরে ঝাঁকুনি লাগে। মাথায় ঝনঝন করে কালুদার কণ্ঠ—এক্ষুনি চলে আয় টাবু। তোর বাবা—

কী হয়েছে বাবার? জানা যায়নি। এক্ষুনি যেতে যখন বলেছেন নিশ্চয়—না, সম্ভব হলেও ভাবতে পারে না পূষণ। হয়তো শরীর খারাপ হয়েছে খুব। বা কোনো ইমার্জেন্সি অবস্থা। স্ট্রোক বা ঐরকম কিছু। ঘুম ও নেশার ঘোরে শুনতে ভুল হয়নি তো কোনো? আরও একবার টেলিফোনের কথাগুলো মনে করে বুঝে নিতে চায়। পরমুহূর্তেই ভেতরের ম্যানেজার সক্রিয় হয়। ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টে-সঙ্কট-শাসনে ও কুশলী মানুষ। অতি দ্রুত করণীয় ছক তৈরি করে ফেলে। এখন আবেগের চেয়েও প্রয়োজন সুস্থ বিচারবুদ্ধির। কর্তব্যপরায়ণ বিশ্বস্ত কুকুরের ক্ষিপ্রতায় তৎপর হয়ে ওঠে পূষণ।

দ্রুত পোশাক বদলে ছোট সুটকেশে কিছু জামাকাপড়, টুথপেস্ট, ব্রাশ, শেভিং সেট ভরে এই রাতেই বেরুবার জন্যে তৈরি হয় পূষণ। পকেটে পার্স ভরতে গিয়ে মনে হয় সঙ্গে বেশি টাকা থাকা দরকার। নতুন গাড়ির জন্যে আগাম জমা দেবে বলে দশ হাজার টাকা তুলে রেখেছিল। আলমারি খুলে তার থেকে তিন হাজার টাকা নিয়ে পার্সে ভরে।

চোখ পড়ে ঘুমন্ত জিজির ওপর। দু'বার ডাকলেও কোনো সাড়া আসে না। ওর পিঠে হাত দিয়ে ঠেলে। জিজি বিড়বিড় করে—আর না—প্লিজ—আর না—

পূষণের ঠোঁটে বিরক্তি মুচড়ে ওঠে। বোঝে জিজিকে এখন ওঠানো যাবে না। তবু ওর দু'কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকুনি দেয়—জিজি—জিজি—শোনো—

আচমকা চোখ খুলে এক পলক ওর দিকে তাকিয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে জিজি—কী হয়েছে—কটা বেজেছে এখন?

—পৌনে চারটে। শোনো, আমি এখন সোনারপুর যাচ্ছি, বাবার শরীর ভালো নয়। তুমি সকালে চলে যেও। আমি যদি রাতে না ফিরি পরদিন অফিসে মিস মার্গারেটকে একটা ফোন কোরো।

জিজি বিছানা ছেড়ে নামার উদ্যোগ করতেই পূষণ বললো, তোমায় উঠতে হবে না, আমি দরজা টেনে দিয়ে যাবো।

—কেমন থাকেন একটা খবর দিও।

—নিশ্চয়। ভালো থাকলে রাত্তিরে চলে আসব।

লিফটে নামতে নামতে মনে হলো, জিজিকে ঘরটা সাফ করার কথা বলা হলো না। ও নিশ্চয় গুছিয়ে রেখে যাবে। আর যদি কাজের মেয়েটা আসা পর্যন্ত থাকে তবে ওকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারবে।

লিফট থেকে বেরিয়ে পার্কিং-এ গাড়ির পাশে দাঁড়াতেই ভোরের নরম স্নিগ্ধ হাওয়া পূষণের সারা শরীর ছেয়ে ফেলে।

২

ভোরের রাস্তা ফাঁকা। জুলাইয়ের আকাশ মেঘলা। রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। রাস্তায় কোথাও কোথাও জল জমে আছে অল্প অল্প। হাওয়ার আদর খুব ভালো লাগে। মাথায় নেশার ভার আস্তে আস্তে উবে যাচ্ছে যেন।

এত ভোরেও রাস্তা জনশূন্য বা যানশূন্য নয়। দু'একটা গাড়ি চলছে। ঠেলা গাড়িতে যাচ্ছে নানা মাল। মোড়ে মোড়ে বিক্ষিপ্ত মানুষ। জীবন চলছে ঠিক-ঠাক। আরেকটা ব্যস্ত দিনের জন্যে তৈরি হচ্ছে মহানগরী।

এসব টুকরো টুকরো ছবি, ভাবনা পূষণের চোখ ছুঁয়ে যায়, মাথায় ঈষৎ ঢেউ তোলে। কোনো গভীর দাগ আঁকে না। ওর মনোযোগ গাড়ি চালানোয়। মাথার মধ্যে বাবার চিন্তাই ফিরে ফিরে আসে। নিজের ভেতরের উদ্বেগ অস্থিরতা প্রশ্ন জাগায়, ও বাবাকে এতটাই ভালোবাসে! কই, কখনো তো মনে হয়নি। দিনের পর দিন মাসের পর মাস বাবার সঙ্গে দেখা হয়নি। কোনো অভাব বোধ হয়নি তো। অথচ এখন কেবলি মনে হচ্ছে, বাবাকে দেখতে পাবে তো! বাবার স্নেহের হাত ছুঁতে পারবে?

একদিনের স্মৃতি মনে আসে। বি. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। অর্থ-নীতিতে অনার্স নিয়ে পাস করেছে পূষণ। বাবা বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, তুই আমার একটা স্বপ্ন সার্থক করলি টাবু। আমাদের বংশের প্রথম গ্রাজুয়েট হয়েছিস। তোর ওপরেই সব আশা ভরসা। আমার তো চাকরি শেষ হয়ে এলো। জীবনে কিছুই করতে পারলাম না। তুই যদি পারিস সংসারটাকে তুলে ধরতে—

বাবা ছিলেন রেলের সাধারণ কেরানী। ছ'টি ছেলেমেয়ে নিয়ে সামান্য আয়ে

সংসার চালানোই ছিল কঠিন। দাদা স্কুল ছেড়ে কলেজে না ঢুকে কোনোরকমে একটা টাইপিস্টের চাকরি জুটিয়ে নিয়ে তড়িঘড়ি বিয়ে করে ফেলে। তখন পূষণ ফার্স্ট ইয়ারে। থার্ড ইয়ারে পড়ার সময় দিদির বিয়ে হয়। ফলে আর্থিক সংস্থান কিছুই ছিল না। কেবল নিশ্চিতির বিষয় ছিল, দু'কাঠার ওপর তিনঘরের বাড়িটা। অফিস থেকে ধার নিয়ে বাবা কীভাবে যে বাড়িটা করতে পেরেছিলেন সেটা একটা বিস্ময়।

দাদা বলেছিল, এখন কী করবি ভাবছিস?

পূষণ বলে, ম্যানেজমেণ্ট পড়ার ইচ্ছে—

—সে তো অনেক টাকার ব্যাপার। তাছাড়া এমনিতেই সংসার চলছে না। তুই বরং চাকরি খোঁজ।

—বাবা, তুমি কি বলো?—পূষণ জানতে চায়।

—আমি আর কি বলব! তুই ভালো রেজাল্ট করেছিস। আরো পড়তে পারলে তো ভালোই হয়। কিন্তু টাকাপয়সার কথাও না ভাবলে চলবে না। তুই কিছু না করলে ছোটোগুলোর কি হবে? ওদের পড়াশোনা আছে। সীমারও বিয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। দ্যাখ ভেবে।

মেজ বোন সীমা থার্ড ইয়ারে পড়ছিল। ছোট ভাই ও বোন স্কুলে।

ছবিটা অজানা বা অস্পষ্ট ছিল না। পূষণ জানত এসব দায়িত্বভার ওকেই নিতে হবে। তবু খুবই দুঃখ পেয়েছিল এই ভেবে যে দাদা বা বাবা কেউ ওকে পড়ার জন্যে উৎসাহ দিল না! অন্তত দুটো মুখের কথা তো বলা যেত।

যা হয়তো বাবা বোঝেননি, দাদা ভাবেইনি, যে অনেক আগেই পূষণ নিজেই নিজের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। নিজের মেধা ও নিষ্ঠার আনুগত্য তাকে এই আত্মবিশ্বাস দিয়েছিল। সেই সঙ্গে ছিল অতি সংগোপন কিছু ব্যক্তিগত অপমান ও যন্ত্রণা।

এখন কিন্তু বাবার করুণ মুখটাই মনে পড়ছে। করুণ এবং অসহায়। বাবা সত্যিই চেয়েছিলেন ও আরো পড়াশোনা করে বড় হোক। কিন্তু নিত্য অভাব ও অনটন তাঁকে দুর্বল ও ভীরু করে তুলেছিল। দাদাকে নিয়ে তাঁর হতাশাও ছিল অসীম। সব বাবার মতন তিনিও বড় ছেলের ওপরই ভরসা করেছিলেন সবচেয়ে বেশি।

পরীক্ষায় পাস করা এবং পরে চাকরি পাওয়াটা পূষণের কাছে খেলার মতন ছিল। ও ভাবতেই পারত না ছেলেরা কেন কীভাবে ফেল করে। পরে চাকরি

পাওয়াটাও তার কাছে চাকরি ছাড়ার মতনই সহজ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এটাকে নিছক ভাগ্য বলা যাবে না, যে-কোনো অবস্থায় নিজেকে ঠেলে দেবার একটা ক্ষমতা ও অর্জন করেছিল। রাইট উইংগার হিসেবে যে কোনো রক্ষণ-ভাগকে দীর্ণ করার অভ্যাসের মতন।

গ্রাজুয়েট হবার পর সামান্য চেষ্টাতেই ও একটা চাকরি পেয়ে যায়। নিছকই কেরানীর চাকরি। বাড়িতে যৎসামান্য টাকা দিয়ে প্রাইভেটে পড়াশোনা চালাতে থাকে। এম. এ পাস করে ম্যানেজমেণ্ট স্কুলে ভর্তি হয়। দু'বছর পরে পাস করে ট্রেনি হিসেবে ঢোকে একটি ছোট বিদেশী কোম্পানিতে। সেখানে কাজ করতে গিয়ে টের পায়, নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে সোনারপুর ত্যাগ করা দরকার। তীব্র প্রতিযোগিতার জগতে ও অনেক পিছিয়ে আছে। কেননা অন্যদের মতন ওর পেছনে নামকরা স্কুল-কলেজের চালচিত্র নেই, বংশ পরিচয় নেই, মামা-কাকা কেউ কোনো উল্লেখযোগ্য চাকরি করে না। ইংরেজিটা ভালো লিখলেও বলে বাঙালি উচ্চারণে মনে মনে অনুবাদ করে। বাড়ির ঠিকানা বলার মতন নয়। গাড়ি থাকা বা ক্লাবের সদস্য হওয়ার কথাই ওঠে না। তার ওপর তখন একটু-আধটু মদ খাওয়া শুরু করেছে। সহকর্মী, বাণিজ্য জগতের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে, পার্টিতে ওসব না হলে চলে না। অথচ মদ খেয়ে সোনারপুর ফেরায় অনেক সমস্যা। বাসে কটু মন্তব্য শুনতে হয়, ট্যাক্সি যেতে চায় না, গেলেও তার খরচ মেটানো দুঃসাধ্য। বাড়িতেও সন্ত্রস্ত থাকতে হয়—গোপনতা বজায় রাখার জন্যে।

তবুও হয়তো মনস্থির করতে পারত না যদি না কাকলি গুপ্ত চোখে আঙুল দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে না দিত। কাকলি ছিল ওদের জোনাল ম্যানেজারের পি. এ. অর্থাৎ চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা। সুন্দরী তুখোড় কইয়ে-বলিয়ে কাকলির প্রবল প্রতাপ। ওকে ডিঙিয়ে বাজপাই সাহেবের সঙ্গে দেখা করাও ছিল অসম্ভব। পূষণ নিজস্ব বিচারবুদ্ধি দিয়ে বুঝেছিল কাকলিকে করায়ত্ত করতে না-পারলে বড় সাহেবের কাছে কোনোদিনই পৌঁছতে পারবে না। আর বড় সাহেবই পারেন ওকে আকাঙ্ক্ষিত অর্থ-ক্ষমতার ম্যাজিক-চাবির ঠিকানা দিতে।

পূষণ নিজেকে আজো সুদর্শন বলে মনে করে না। তবে সুপুরুষ নিশ্চয়। লম্বা, স্বাস্থ্যবান, মসৃণ ত্বকে বাঙালি লাবণ্যর সঙ্গে ছিল সেই সারল্য যাকে শহুরে মানুষ গ্রামীণতা হিসেবে চিহ্নিত করে। এই সরলতাই জয় করে নিয়েছিল কাকলিকে। চারপাশের চালিয়াৎ স্তাবকদের মধ্যে পূষণকে অন্য রকম মানুষ

মনে হয়েছিল। এমন মানুষ যাকে ও নিজের মতন করে গড়ে নিতে পারবে। পূষণের অন্তর্গত আগুনের উৎসও জানা ছিল।

তাই ট্রেনিং শেষে ও যখন সেলস অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হলো, কাকলি বললো—এবার তোমাকে একটি বড় সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

—কী সিদ্ধান্ত?—সরল মুখে পূষণ জানতে চায়।

—তোমার লক্ষ্যটা কী—কতদূর যেতে চাও তুমি?

অফিসে কাকলির টেবিলে বসেই কথা বলছিল। দুষ্টু হেসে পূষণ বলে, লক্ষ্য আমি জানি। যেতে চাই খুবই সামান্য দূর—মাত্র দু'হাত দূরত্ব।

—মানে?

—মানে—আমার উল্টোদিকের চেয়ারটা পর্যন্ত।

ওর চোখের ভাষা পড়ে কাকলী বলে, ব্যস, এইটুকু!

—হ্যাঁ। এইটুকু। এইটুকু পেলেই জীবনটা চলে যাবে।

—তার জন্যেও তো কোনো উদ্যোগ দেখছি না।

—তার মানে?

—মানে অনেক। আমি চিরকাল এ-চেয়ারে থাকতে চাই না। তুমি না-চাইলেও আমার জন্যেই তোমাকে আরো অনেক দূর যেতে হবে। সোনারপুরের বাদা বনে আটকে থাকলে তা কখনো হবে না।

দু'দিনে বা দু'চার কথায় হয়নি। অনেক ধৈর্য ধরে কাকলিকে বোঝাতে হয়েছে যে বাণিজ্য জগতের সফল কর্ণধার হতে গেলে আনুষঙ্গিক অনেক উপাদান লাগে—অনেক কিছুই তার ঠুনকো হলেও। নিজের সংস্কার, বিশ্বাস, আবাল্যের টান ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতেই হয়েছিল পূষণকে। কাকলির সঙ্গে ঘোরাঘুরি খোঁজাখুঁজি করে পেয়েছিল সুইস পার্কের এক ঘরের ফ্ল্যাট।

বাবাকে বলতেই তাঁর মুখ করুণ, ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। তিনি বোবা চোখে অসহায় উচ্চারণ করেছিলেন—তুই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি?

—ছেড়ে যাওয়া বলছ কেন! আমার কাজের সুবিধের জন্যে, উন্নতির জন্যে—এখানে যাতায়াতের এত অসুবিধে—

মা জিজ্ঞেস করেছিলেন—তুই কি বিয়ে করবি ঠিক করেছিস?

বাবা বলেন—বিয়ে করলেই বা বাড়ি ছাড়তে হবে কেন? ঘর রয়েছে—আমরা তো আপত্তি করব না—

পূষণ বলে—তোমরা ভুল করছ। বিয়ের কথা আমি আদৌ ভাবছি না।

আমি কেরিয়ারের কথা ভাবছি। এখানে থেকে কেরিয়ার গড়া সম্ভব নয়। তোমাদের ভাবনার কোনো কারণ নেই। আমার দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা ভুলে যাইনি, যাবও না। বরং আরো ভালোভাবে যাতে তা পালন করতে পারি, আরো রোজগার করতে পারি সেজন্যেই ফ্ল্যাটটা নিয়েছি।

বাবা-মার পক্ষে এসব যুক্তি মেনে নেওয়া কঠিন। তাঁরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় জেনেছেন, একবার ছেড়ে গেলে কেউ আর ফেরে না। আর, মানুষের মৌখিক প্রতিশ্রুতির চেয়ে স্বল্পায়ু শিশিরও নয়!

বাবার উদ্বেগের কারণ বোঝেনি পূষণ, তা নয়। তিনটে ছেলেমেয়ে নিয়ে দাদার পক্ষে সামান্য রোজগারে সংসারের দায়-দায়িত্ব মেটানো অসম্ভব। সীমার তখনও বিয়ে দেওয়া যায়নি। অন্য ভাইবোনরাও পড়ছে। সুতরাং সংসারের আর্থিক দায়িত্ব ওরই কাঁধে। ও যেটা বোঝাতে পারছিল না তা হলো কাঁধ থেকে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা বা ইচ্ছে ওর ছিল না। বরং নিজেকে আরো যোগ্যতর করে তোলাই ছিল উদ্দেশ্য। যোগ্যতর নিজের জন্যে, সংসারের জন্যে এবং নিজের গোপনে জানত কাকলির জন্যেও।

তিতিবিরক্ত হয়ে বাবাকে বলেছিল—তোমরা কী চাও? আমিও দাদার মতন জীবনটা ঘষটাই? বিয়ে করে ছানা-পোনা নিয়ে নেই-নেই জীবন কাটাই? তোমাদের কাছে আমি কিছু চাইছি না। নিজের চেষ্টায় পরিশ্রমে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি। তাও তোমাদের পছন্দ হচ্ছে না। বলো, কী চাও তোমরা? নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু চাইবার আছে তোমাদের? আমার অপরাধ কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছি, কষ্ট করে বেশি রোজগারের চেষ্টা করছি যাতে তোমরা ভালো থাকো, ভাইবোনরা ভালো থাকে। এসব যদি পছন্দ না হয় তবে বলো, পড়ে থাকি সারাজীবন এই এঁদো পাড়ায়!

একটু থেমে আবার বলে, কিন্তু তা সম্ভব নয়। আমাকে যেতে হবেই। আমার নিজের জীবন আছে। আমি তোমার মতন দাদার মতন হাভাতে জীবন কাটাতে রাজী নই।

মা ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন। পূষণ ভ্রূক্ষেপও করেনি। বাবা কেবল আর্তস্বরে বলেছিলেন—টারু, তুই—তুই—একথা বললি আমাকে! আমি স্বার্থপর—আমি তোর শত্রু—

সেদিন পূষণ বোঝেনি তার শানিত শব্দের ছুরি বাবাকে কোথায় বিঁধেছিল। বাবার রক্তাক্ত বুক, রক্তহীন মুখের যন্ত্রণা সারা জীবনেও সে মুছে দিতে পারবে

না—জানত না ও। ঘাতকের ভূমিকায় নিজেকে দেখার চোখ সেদিন ছিল না পূষণের। এখন মনে পড়তেই চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে।

৩

বড় রাস্তা থেকে নিজের বাড়ির গলিপথের দিকে গাড়ি ঘোরাতেই কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েছিল। এই শব্দের সংবাদ সরল, অমোঘ। পূষণ বুকে পাথরের চাপ টের পায়। গলা শুকনো। চোখের কোণে জ্বালা। যান্ত্রিক অভ্যাসে গাড়ি থামায় বাড়ির দরজায়। অনেকেই ছুটে আসে। একসঙ্গে অনেক মানুষ কথা বলে। কিছুই মাথায় ঢোকে না।

কালুদা এসে হাত ধরে বলেন, আর একটু আগে যদি আসতিস! ঠিক চারটে পাঁচে গেছেন।

কোনো কথা না-বলে গাড়ি থেকে নেমে সোজা বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল পূষণ। বসার ঘরের পাশেই বাবার ঘর। দুটো ঘরই ভর্তি মানুষে। না তাকাকেও চোখে পড়ে দিদি ও জামাইবাবু সমীরদাকে। দাদা প্রসূন মাকে ধরে বসে আছে। ছোট বোন নিভা এক কোণে কাঁদছে। ছোট ভাই লাবুকে দেখতে পেল না। সীমা বা তার বরকেও নয়। ওরা হয়তো খবর পায়নি।

ওকে দেখেই মা ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। দিদিও বুকে মুখ ঘষে। দাদা একবার হাত ছুঁয়ে ডাকেন—টাবুরে—

পূষণ এই শারীরিক ঘনিষ্ঠতায় অস্বস্তি বোধ করে। মুখে মদের গন্ধ পাচ্ছে না তো কেউ? মুখ খুলে কথা বলতে ওর দ্বিধা হয়। ও চুপচাপ গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাঁ হাত মার পিঠে, ডান হাত দিদির কাঁধে। ও মূক চোখে বাবাকে দেখে। বাবা না, বাবার শব। মাথাটা একটু ডান দিকে বাঁকা। দু চোখে তুলসী পাতা, নাকে তুলো। না, কোনো আবেগে কেঁপে উঠল না পূষণ। বাবা বলে ডেকেও উঠল না। তিনিও আর কোনোদিন টাবু বলে ডাকবেন না। নিঃশব্দে ও একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে।

একটু পরে নিজেকে ছাড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে পূষণ। ছোট ভাই লাবুকে ঘিরে ছিল তার বন্ধুরা। লাবু কাছে এসে ডাকে, মেজদা—

পূষণ বলে—সীমারা—

দু' বছর আগে সীমার বিয়ে হয়ে গেছে। ওর শ্বশুরবাড়ি জব্বলপুর।

লাবু বললো, মেজদিকে গতকাল টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছি। আজ আরেকটা পাঠাবো।

—গতকাল আমাকে খবর দিসনি কেন?

—মেজদা, গতকাল বিকেল থেকে তোমার বাড়িতে অফিসে কতবার যে ফোন করেছি—কালুদাকে জিজ্ঞেস করো—খালি নো রিপ্লাই হয়ে গেছে।

মনে পড়ে পূষণের কাল শনিবার ছিল। হাফ-ডে। অফিস থেকে বেরিয়ে ক্লাব। তারপর জিজির সঙ্গে মাতামাতি করে ফ্ল্যাটে ফিরেছিল রাত এগারোটা নাগাদ। সুতরাং ফোনে ওকে পাবার কথা নয়।

ইতিমধ্যে সুন্দর সকাল ফুটে উঠেছে। কামিনী গাছের ওপর নরম রোদ্দুর। বৃষ্টি-ধোয়া আকাশ নীল। পাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসছে আকাশবাণীর চেনা সুর। পৃথিবী অবিকল জেগে উঠছে। জীবন চলবে ঠিকঠাক। কে বলবে এ বাড়িতেই শুধু মহাদোষ!

কিন্তু কী আশ্চর্য—পূষণ নিজের মধ্যে কোনো শোকের স্পন্দন পাচ্ছে না। হ্যাঁ, বুকটা খালি-খালি লাগছে যেন। তা কি সংস্কারবশত নয় আদৌ? বা যেন এমন লাগাটাই নিয়ম বলে? প্রশ্নগুলো মাথায় জাগলেও নিজের মধ্যেই একটা ঝাঁকুনি খায়। ও অন্য কিছু ভাবার চেষ্টা করে। ভাবতে পারে না। খারাপ পাখার শব্দের মতন একঘেয়ে কান্নার শব্দ ক্রমাগত কানের ওপর আছড়ে পড়ে। এই কান্নাটাও কি যান্ত্রিক নয়? নয় শুধু কি নিয়ম পালন? নইলে পরিণত বয়সের মৃত্যুতে এত কান্নার কি আছে? মৃত্যু যে আসন্ন তা তো অনেককাল ধরেই জানা ছিল। আকস্মিক দুর্ঘটনা কিছু নয়। পূষণ জানে লৌকিক দায়—যে-কোনো মৃত্যুর বরাদ্দ তিন দিনের অশ্রুপাত। তারপর আবার দৌড় শুরু।

পূষণ অবশ্য এখনই দৌড়ের মধ্যে আছে। মনে পড়ে ওর কাছে জরুরি ফাইল, কাগজপত্র রয়েছে যা পরশুদিন (মঙ্গলবার) বোর্ড মিটিঙে লাগবে। এবং ওর নিজের জন্যে রয়েছে এক কঠিন পরীক্ষা যা উত্তীর্ণ হতে না-পারলে এত দিন ধরে এতদূর দৌড়ে আসা বৃথা হয়ে যাবে। সাফল্যের চূড়া থাকবে অধরা ওকে ডিঙিয়ে চলে যাবে হেগড়ে বা প্রকাশ বা অনুপল।

পিছে ফিরে তাকানো পূষণের স্বভাবে নেই। কাকলিকে ভুলে যেতে লহমাও লাগেনি। এমনকি যে রাখী ওকে সাফল্যের সিংহদ্বারে হাত ধরে পৌঁছে দিয়েছিল—তারও মুখ মনে পড়ে না। বরং মনে আসে বিষাদ স্মৃতি—অভিমান, রাগ, কান্না, ঘৃণা, বিদ্বেষ। পূষণ কৃতজ্ঞ হতেও শেখেনি। ওসব ন্যাকামি ওর আসে না।

এই যে জিজি ওকে প্রায় চূড়ার কাছাকাছি এনে দিয়েছে, তারও স্থায়িত্ব কতদিন সে জানে না। পূষণ অঙ্ক কষে দেখেছে জিজি ওকে শেষ পর্যন্ত চূড়ায় উঠতে সাহায্য করতে পারবে না। সকলেরই সীমাবদ্ধতা থাকে। কোথাও গিয়ে থেমে যেতে হয়। কিন্তু পূষণ সীমায় বিশ্বাস করে না। থামতে ও জানে না। তবে, বাবা কি একটু ভুল সময়ে চলে গেলেন না?

—টাবু—

কালুদা। সঙ্গে সমীরদা।

—বলুন—

—আস্তে আস্তে তো সৎকারের ব্যবস্থা করতে হয়। কীভাবে কি করবে—

—দাদাকে বলুন। ও-ই তো এখন—

ওকে থামিয়ে সমীর বলে, দাদা কি বলার মতন অবস্থায় আছে! তুমি যা বলবে সেভাবেই সব করতে হবে।

—তবু, দাদাকে একবার বলুন।

কালুদা বললেন, দাঁড়াও আমি ডেকে আনছি।

দাদা এসে ভাঙা গলায় বললেন, আমি আর কী বলব—তুই যা ভালো মনে করিস—কালু, সব ব্যবস্থা করে দিস—

পূষণ শীতল চোখে দাদা, সমীরদা ও কালুদার মুখের দিকে তাকাল। লাবু বন্ধুদের সঙ্গে। বাইরের ঘরের দরজায় ছোট মেয়েকে কোলে নিয়ে বৌদি দাঁড়িয়ে। চোখ ওদের ওপর।

পার্স বের করে দশটা একশো টাকার নোট কালুদার হাতে দিয়ে পূষণ বললো, যা ভালো বোঝেন করুন। আরো লাগলে বলবেন। আয়োজনে কোনো ত্রুটি রাখবেন না।

—আরে না-না। আমরা সবাই রয়েছি, ত্রুটি হবে কেন। তুমি কিছু ভেবো না টাবু। ইয়ে—ইলেকট্রিকে—

পূষণ বললো, হ্যাঁ।—বৌদির ঘরে চলে যাওয়া ওর চোখ এড়াল না।

শ্মশান থেকে ফিরতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল। আজকাল শবকেও লাইনে থাকতে হয়। দোতলায় লাবুর ঘরে ঢুকে আয়নায় নিজেকে দেখে অবাক লাগে পূষণের। না-কামানো দাড়ি গালে কুটকুট করে। ধড়া-চাদর-গলায় চাবি—এটা কোন্ পূষণ মিত্তির? ক্লাবের বন্ধুরা, অফিসের সাহেবরা দেখলে বলবে কি!

এখন চলাফেরায় অনেক বিধি-নিষেধ। কিন্তু ওকে একবারের জন্যে হলেও আগামী কাল অফিসে যেতে হবে। এইভাবে যাবে? পাগল নাকি!

মনে মনে বাবাকে ধন্যবাদ দেয় পূষণ।

ভদ্রলোক বিবেচক ছিলেন। রবিবার ভোরে গেলেন।

সোমবার হলেই মারাত্মক ভুল হত। যে ভুলের মূল্য জীবিত বাবাই বুঝতেন না, মৃত বাবা আর কি করে বুঝবেন!

দিদি এসে বললো, তুই হবিষ্যি করবি তো?

পূষণ নিষ্প্রাণ জবাব দেয়—করতে বললে করব।

—এ ঘরের মেঝেতে ঘুমোতে পারবি?

—মেঝেতে?

—সেটাই নিয়ম।

—তাহলে তো পারতেই হবে। মিছে জিজ্ঞেস করছ কেন?

দিদি বেরিয়ে যাবার আগে পূষণ বললো, একটু সমীরদাকে ডেকে দিও তো।

সমীরদা মানুষটা হাসিখুশি, মজাদার। অথচ একেবারে মাটি-ঘেঁষা মানুষ। আগরপাড়ায় ছোট বাড়ি করেছেন। জীবনবীমার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হয়েছেন এখন। ছেলেপুলে নেই বলে দিদির দুঃখ থাকলেও সমীরদা বলেন, বেশ ভালো হয়েছে, মেজবাবু, বুঝলে। নইলে স্কুলে ভর্তি করতে নাভিশ্বাস উঠে যেত। তারপরে ধর যদি ভর্তি করাও যেত এই বুড়ো বয়সে নতুন করে হোমটাস্ক শিখতে হত। আর তোমার দিদিটি তো সারাক্ষণ সেতারের মতো কাল হয়ে থাকত।

—কালো—সেতারের মতন—মানে?

—কালো নয়—কাল—কাল—টেন্স! এরপরও হাসবে না পূষণ তেমন রামগরুড়ের ছানা নয়। সমীরদার মোটা দাগের মজা করা ভালোই লাগে। বিশেষত লুকিয়ে চুরিয়ে অল্পস্বল্প পান করলে একেবারে ফোয়ারা ছুটিয়ে দেন।

সমীরদা এসে বললেন, কী ব্যাপার, মেজবাবু, তলব কেন? দাঁড়াও, আগে শ্বশুরমশায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সন্ধ্যাবেলার সিগারেটটা জম্পেশ করে ধরাই। তোমার তো মেজবাবু নাবালিকা দোষে মানে মাইনর ভাইসে রুচি নেই। নইলে, আজকাল গুরুদশায় চা-র মতন সিগারেটও চলে।

ঘনঘন টান দিয়ে এক বুক ধোঁয়া ছেড়ে সমীর চললেন, মেজবাবু, এখন কদিন তোমার সন্ধ্যা-আহ্নিক চলবে না। অসুবিধে হবে, কিন্তু নিরুপায়।

পূষণ মৃদু হাসে—কী যা-তা বলছেন? আমি সেসব ভাবছি না।

—তবে কি বাবার জন্যে খুব কষ্ট পাচ্ছ ?

—না, তাও নয়। কেমন যেন বিচ্ছিরি লাগছে। একটুখানি ফাঁকা—তবে বেশিটাই যেন ফাঁকি।

—থাক, থাক আর বোলো না। এখন এমনই চালিয়ে যেতে হবে। মেজবাবু, তোমার কপালে এখনো অনেক গেরো।

একটু ভেবে পূষণ বললো, সমীরদা, তুমি এখানে কদিন থাকবে ?

—তোমার দিদিটি সহজে যাবেন বলে তো মনে হচ্ছে না। ধর কাজকর্ম চুকিয়েই যাব। অবশ্য কাল একবার অফিস ঘুরে আসতে হবে। কেন, মেজবাবু ?

—আমাকেও কি অতদিন এখানে থাকতে হবে ?

—সেটাই উচিত।

—অসম্ভব। আমাকে কালই অফিসে যেতে হবে।

হাতের নিভন্ত সিগারেটের টুকরো অ্যাসট্রেতে গুঁজে সমীর বললেন, মেজবাবু, হঠকারিতা কোরো না। নিচে কত লোক এসেছে জান ? কাল থেকে দেখবে ঝাঁকে ঝাঁকে লোক আসবে। আত্মীয়স্বজন, তোমাদের বন্ধু-বান্ধব। যাদের চেন না, নামও শোননি তারাও আসবে। শোকও একটা মহোৎসব। আর তোমাদের জন্যে এটা প্রথম এবং প্রধান শোক। সুতরাং উৎসবটা কেমন জোরদার হয় দেখতে হবে না ! তার উপর তুমি থাক কোন মিনারে না প্রাসাদে, গাড়ি হাঁকিয়ে বাবার ডেডবডি দেখতে এসেছ—সেই তুমি গলায় চাবি ঝুলিয়ে কেমন সন্ধেবেলায় হুইস্কির বদলে খাবি খাচ্ছ এই দৃশ্য তো রোজ দেখা যায় না। তোমার দাদা কীরকম পিতৃভক্ত পুত্র—শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাবার সঙ্গ ছাড়েনি। অবশ্য কুলাঙ্গার তোমার পকেট থেকে অশোকস্তম্ভগুলো বেরিয়ে এসেছে। আরো এনেছ তো ? ঢের লাগবে কিন্তু।

পূষণ বুঝতে পারে ওর গাড়ি নিয়ে আসা, মুখে হুইস্কির গন্ধ নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা কথা হয়েছে। ও বাবার ডেডবডি দেখতে এসেছিল ? মানুষের কল্পনাও কত নিষ্ঠুর হতে পারে !

সমীর বললেন, কালুদার কাছ থেকে টাকার হিসেব নিয়েছ ?

—না।

—ভালো করেছ। এই কদিন হাত এমনই খোলা রেখো। শেষ পর্যন্ত কিছু হাততালি জুটলেও জুটতে পারে। আর যদি বৃষোৎসর্গ করে ফেল তবে তো জয়-

জয়কার পড়ে যাবে। শোনো মেজবাবু, যাই কর, এই অধমের জন্যে কিঞ্চিৎ অমৃতের সংস্থান রেখো। ওতেই আমার তর্পণ হবে।

—সমীরদা, অনুনয়ের স্বরে পূষণ বলে, আমি খুব কঠিন সমস্যার মধ্যে আছি। সব তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না এখন। বলতে পার আমার কেরিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট। কাল অফিসে গিয়ে বুঝতে পারব এখানে ফিরতে পারব কিনা। যদি না-পারি কাজ না-হওয়া পর্যন্ত দু-চারবার আসব হয়তো। টাকা যা দেবার দেব। তোমাকে সব ম্যানেজ করতে হবে। আমার হাততালি, জয়-জয়কার কোনো কিছুরই দরকার নেই। কোনো আড়ম্বরও চাই না। শুধু আমাকে ছেড়ে দাও।

—ছেড়ে তোমাকে দেওয়া যাবে না মেজবাবু। তবে যথাসাধ্য রেহাই দেবার চেষ্টা করব। কাল অফিসে যাবে যাও, তবে সন্ধেবেলা ফিরে এসো।

পরদিন সকালে তৈরি হয়ে মার ঘরে এসে পূষণ দেখে, মাকে ঘিরে বসে আছে দাদা, বৌদি, দিদি ও নিভা। মার মুখে আঁচল চাপা দেওয়া। গতকাল ঠিক খেয়াল করেনি। এখন খেয়াল হলো মা যেমন আমূল বদলে গেছেন। শাদা সিঁথি, খালি হাত, শাদা থান—মুখের রেখার সঙ্গে মেলানো শোকের বিজ্ঞাপন। মাকে সম্পূর্ণ অন্য নারী মনে হয়। অন্য এবং অচেনা।

ওকে দেখে মার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। চোখের কেঁপে-ওঠা অবিকল মায়েরই মতন। শোকেও দৃষ্টি বদল হয় না।

—মা, আমি একটু বেরুচ্ছি।

দাদা-দিদি একসঙ্গে বলে ওঠে—কোথায় যাবি ?

—আমাকে একটু অফিসে যেতে হবে।

—এই অবস্থায় অফিসে যাবি কি !—ছি, ছি।

—উপায় নেই। যেতেই হবে।

মা বললেন, তিনটে দিনও থাকবি না ! বলেই কঁকিয়ে ওঠেন।

দাদা বলেন, বিকেলে ফিরবি তো ?

—চেষ্টা করব। না-ফিরতে পারলে চিন্তা কোরো না। পরে আসব।

ওর চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে বৌদি শোভা বললো, ভুভারতে আর তো কেউ বড় চাকরি করে না !

কেউ জবাব দিল না।

৪

গাড়িতে নিজের ফ্ল্যাটের দিকে যেতে যেতে পূষণ ভাবছিল, কী পোশাকে অফিসে যাবে। ওর একটা কালো স্যুট আছে! সাহেবী কায়দায় সেটা পরে পরিচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে। যদি যায় তবে প্রতিক্রিয়া কি হবে? সবাই কৌতূহলী হবে, মৌখিক সমবেদনা জানাবে। মামুলি কেতাদুরস্ত কথা বলবে। ও কি এসব শোনার জন্যে অফিসে যাবে? না, ও যাবে এম. ডি.-র কাছে নিজে কত কর্তব্যপরায়ণ, নিবেদিতপ্রাণ সেবক, সেটা প্রমাণ করার জন্যে? আরো সোজা করে বললে, বড় সাহেবের সহানুভূতি জাগিয়ে হেগড়ে, প্রকাশ বা অনুপলের থেকে কয়েক কদম এগিয়ে থাকার জন্যে? না—এর কোনোটাই নয়। ও যাবে, ওর ফাইলটা না পেলে এম. ডি. বোর্ড মিটিঙে বিব্রত হবেন। কোম্পানিরও ক্ষতি হবে কেননা আধুনিকীকরণের জরুরি সিদ্ধান্ত পিছিয়ে যাবে। কোম্পানির ক্ষতি হোক এমন কিছু পূষণ করতে পারে না।

হ্যাঁ, কালো স্যুট পরেই যাবে। তাহলে খুব বেশি মানুষের চোখে পড়বে না। বিনীতভাবে ফাইলটি দিয়ে ছুটি চেয়ে চলে আসবে। তারপর একেবারে কাজকর্ম চুকিয়ে অফিসে যাবে। নতুন করে শুরু করবে দৌড়।

ফ্ল্যাটে ঢুকে চারদিক খুঁটিয়ে দেখল পূষণ! নাঃ, জিজি সব ছিমছাম পরিষ্কার করে গেছে। রান্নাবান্না না-জানলেও মেয়েটা ঘর গোছাতে পারে ভালো। টেলিফোনের নিচে চাপা দেওয়া টুকরো কাগজে লিখে গেছে—'এসেই ফোন কোরো। চিন্তায় আছি।'

ঠোঁটের কোণে হাসি উজিয়ে কাগজটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলল পূষণ। বাথরুমে গিয়ে আয়নার সামনে চুল বিন্যস্ত করতে লাগল। ঠিক তখনি আচমকা মাথায় চিন্তাটা এলো।

প্রণয় ও যুদ্ধে অসমীচীন বলে কোনো শব্দ নেই। প্রণয় ও শেখেনি, যদিও নারী শিখেছে বহু। কাকলি রাখীর মতন জিজিও মনে করে পূষণ তার গভীর প্রেমে ডুবে আছে। সহসাই প্রিয়া থেকে জায়া হবে। মেয়েরা যে কেন এত বোকা হয়! প্রেম-প্রণয় অত শস্তা নাকি? শরীরের খেলার সঙ্গে যে প্রেমের কোনো সম্পর্ক নেই তা মেয়েরা বোঝে না কেন? পূষণ তো এতদিনেও জানল না প্রেম কী!

যুদ্ধ কি জানে ও। দৌড়টাই যুদ্ধ। যুদ্ধ মানেই অন্যকে হারানো—নিজের জয়। সে-যুদ্ধে সবই সমীচীন। যেমন সমীচীন ছিল কাকলি ও রাখীর বাধাবন্ধ-

হীন প্রেমের হত্যা। পূষণ অবশ্য হত্যা বলে না, বলে—ওদের বোধের ভুল ভাঙানো, চোখ ফোটানো। যা রক্ত ঝরেছে সে কেবল চলতে শেখার মূল্য। পূষণকে দায়ী না করে বরং ওদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

এখনো সে যুদ্ধে আছে। তবে যুদ্ধের নিয়মে চলবে না কেন? এম. ডি. বরদাচারী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। ও যদি এই ধড়া-চাদর-চাবিসহ যায় অফিসে, সকলেরই নজরে পড়বে। বিপ্লবের মতন ব্যাপার ঘটে যাবে। পূষণ মিত্তির ঐ পোশাকে! এম. ডি. কী ভাবতে পারেন? ক্ষুব্ধ হবেন নাকি শ্রদ্ধামাখা প্রসন্ন চোখে তাকাবেন? দুটোই হতে পারে। ব্যাপারটা প্রায় জুয়া খেলার মতন। পূষণ জুয়ায় বিশ্বাস করে না। ওর খেলা অঙ্কের মতন। আজ কি এই জুয়াটা খেলবে ও? যদি লেগে যায় তবে হেগড়ে, প্রকাশকে বহুদূর ফেলে এগিয়ে যাবে। যদি না-লাগে খুব কি ক্ষতি হবে? ও বিনীতভাবে লাজুক ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিমায় ফাইলটা দিয়ে চলে আসবে। ফাইলটা ওঁর দরকারই। অপছন্দ হলেও অপ্রসন্ন হবার কথা নয়। ওর কর্তব্যনিষ্ঠা ও আনুগত্যের পরিচয় থাকছেই।

পূষণ খালি গায়ের ওপর চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে। টেলিফোন তুলে নিজের সেক্রেটারি মিস মার্গারেটকে ফোন করে।

—হ্যালো—

—মিস মার্গারেট, মিত্র বলছি।

—ও! মিস লাহিড়ী ফোন করেছিলেন। আপনার বাবা কেমন আছেন?

কথানুযায়ী জিজি ঠিকই ফোন করেছিল জেনে ভালো লাগে। জিজিকে আরো কিছু কাজ করতে বলা আছে, নিশ্চয় করবে আশা করা যায়।

—বাবা আর নেই। গতকালই আমাদের ছেড়ে গেছেন।

—ওঃ! আয়্যাম সো সরি।

—ঠিক আছে। এম. ডি.-কে খবরটা দিও। পরে দেখা হবে। বাই।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অফিসে খবরটা রটে যাবে। প্রথম বিস্ময় কেটে গেলে, আলোচনায় বসে এম. ডি.-র ওর কথা, ফাইলের কথা মনে পড়বে। এবং অনিবার্য বিমূঢ়তায় স্নায়ুচাপে ভুগবেন। ঠিক সময়ে পূষণ পৌঁছে যাবে। সময়জ্ঞানটা শুধু ঠিক হওয়া দরকার। টাইমিং!

হঠাৎই ক্ষুধাবোধ টের পায় পূষণ। এখন কী খাওয়া যেতে পারে? ফ্রিজ খুলে দেখে বোতলে দুধ রয়েছে। এক গ্লাস ঠাণ্ডা দুধ ঢেলে নিয়ে সোফায় বসতেই প্রশ্ন জাগে, এখন দুধ খাওয়া চলে তো? নিয়মে যাই থাক, দুধ ছাড়া

আর কিছু খাওয়ার নেই। শেষ যে কবে বাজার করেছিল মনেও পড়ে না। দুধে চুমুক দিয়ে হাসি লাগে। পূষণ মিত্তির ঘরে বসে গ্লাসে দুধ খাচ্ছে! আহা, দৃশ্যটা কেউ দেখল না।

সামনের টেবিলে ফাইল, কাগজপত্র রাখা ছিল। দুধ খেতে খেতে সেগুলো উল্টে-পাল্টে দেখে স্মরণশক্তিকে সরব করে—যাতে প্রশ্ন এলে জবাব দিতে পারে। অনেক খেটে প্রজেক্টটা তৈরি করেছে। যদি এটা গ্রহণ করাতে ও প্রয়োগ করতে পারে তবে ওর লক্ষ্য ডি-জি. এম—ডাইরেক্টর, প্ল্যানিং ও মার্কেটিং—করায়ত্ত হলেও হতে পারে। হতে পারে না, হতে হবেই। ও হারতে জানে না।

অন্যমনস্কভাবেই পেনস্ট্যাণ্ড থেকে প্রিয় কলম তুলে কিছু নোট লেখে পূষণ। কাগজের ভাঁজে কলমটা রাখার পর আচমকা কলমটা ওর দৃষ্টি টানে। অনিবার্য-ভাবে কাকলিকে মনে পড়ে। ও দিয়েছিল কলমটা। এক অর্থে কাকলির শেষ উপহার। কেননা উপলক্ষ ছিল, অ্যাসিস্টেণ্ট মার্কেটিং ম্যানেজার হিসেবে পুরনো কোম্পানি ছেড়ে ন্যাশনাল পেইণ্টসে যোগ দেওয়া। কাকলি জানত না রাখীর বাবা ছিলেন তার এই নতুন পদের উৎস। রাখীর চোখে পূষণ ছিল অনন্য পুরুষ। রাখীকে তখন ভীষণই দরকার পূষণের।

—আমার অপরাধ?—অবুঝ কাকলি জানতে চায়। সুইস পার্ক ছেড়ে এলগিন রোডে নতুন দু'ঘরের ফ্ল্যাটে সদ্য উঠে এসেছে পূষণ। নতুন চাকরির সঙ্গে পাওয়া।

—অপরাধের কথা কেন বলছ? আমি তো তোমাকে কিছু বলিনি।

—তা বলোনি। যেমন এই ফ্ল্যাটের কথাও।

—না বললে তুমি এলে কি করে!

—পুরনো ফ্ল্যাটে গিয়ে না-পেয়ে অফিসে ফোন করার পরে বলেছ। নিজে থেকে বলোনি।

—আসলে এত তাড়াতাড়ি ফ্ল্যাটটা দেবে বুঝতে পারিনি। শনিবার বলল রবিবারেই চলে এলাম। দেখছ না এখনো গোছানোই হয়নি।

—তারপর এক সপ্তাহ কেটে গেছে। আমার সঙ্গে দেখা করা দূরে থাক ফোন করারও সময় হয়নি তোমার।

—ঠিক বলেছ, পূষণ হাসে—যা ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে!

—মিথ্যে কথা।—ঝাঁঝিয়ে ওঠে কাকলি—তুমি ইচ্ছে করে আমাকে অ্যাভয়েড করছ, দূরে থাকছ।

পূষণ সাবলীল মিথ্যা কথা বলে—না—না, তুমি ভুল বুঝছ। আসলে কাজের চাপ বেড়েছে, বন্ধু-বান্ধব বেড়েছে, আমার দুনিয়ার পরিধিটা একটু ছড়িয়ে গেছে তাই আগের মতন আর তোমাকে সময় দিতে পারছি না। সত্যি বলতে কি, পারবও না কাকলি। এটা তোমার জানা ভালো।

কাকলি স্তব্ধ হয়ে থাকে। কথাগুলো ঠিকঠিক মাথায় গেঁথে নেবার মতন সময় নেয়। প্রতিটি শব্দের মধ্যবর্তী শূন্যতার অর্থও বুঝে নেয়। বুঝেও, তবু, অবিশ্বাস্য লাগে। নিজের হাতে গড়া পূষণের উচ্চারণ ঐ শব্দাবলী? কী করেনি, কী দেয়নি ও? এর চেয়ে বেশি কোনো নারী তার প্রিয়তম পুরুষকে আর কী দিতে পারে? ওর চোখের কোণে বিদ্যুতের মতন অশ্রু চমকায়।

—য়ু আর রিয়েলি আ বাস্টার্ড!

—তুমি অকারণে রেগে যাচ্ছ—

—তা তো বলবেই। অকারণে—অকারণে কেননা আমি তোমার জন্যে কিছু করিনি—করলেও অকারণে করেছি—সুইস পার্কের ফ্ল্যাট ছিল অকারণ—দিনের পর দিন—বছর ধরে তোমার সঙ্গে যা-কিছু করেছি তাও অকারণে—তাই না? নাকি বলবে তাও করেছি নগদ আদায়ের জন্যে—বলো, বলে ফেলো তাও—

গলা গম্ভীর করে পূষণ বলে, কেন এসব আবোল-তাবোল বলছ আমি জানি না। তবে কথা যখন তুললে তখন বলছি, তুমি আমার জন্যে অনেকই করেছ—এতই, যার বেশি হয়তো করা যায় না। তুমি না হলে আজো হয়তো সোনারপুরের বাদাবনেই থমকে থাকতাম। সব-কিছুর জন্যেই আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ—ডিপলি গ্রেটফুল! কিন্তু শুধু কৃতজ্ঞতা নিয়ে জীবন চলে না। জীবনের আরো নানা টাস্ক থাকে, দাবি থাকে। চিরদিন সুইস পার্কে থাকা যেত না। এখানেও যে থেমে যাবো তারও কোনো মানে নেই। আর বাকি যা বলেছ, দুজনে যা করেছি পারস্পরিক ভালো-লাগা, চাওয়া-পাওয়া, আনন্দ-উল্লাস থেকেই করেছি। সেখানে নগদ-বাকি আদায়-বিদায় কথা কেন উঠবে তা আমি অন্তত বুঝি না।

নিহত গোলাপ কাকে বলে, কেমন দেখতে পূষণ জানে না। তবু সেদিন কাকলির নীরক্ত, অশ্রুধোয়া মুখ দেখে ঐ উপমাটাই মনে হয়েছিল।

এতদিন পরেও ঠিক মনে পড়ল। না, বুকে কোনো ব্যথা বাজল না। কেননা প্রায় একই রকম কথা বছর তিনেক পরে রাখীকেও বলেছিল। রাখীর পরে ললনাকে। সহসা হয়তো জিজিকেও বলবে। রাখীর জার্মানি থেকে এনে দেওয়া সুদৃশ্য চামড়ার ব্যাগটা পাশের সোফাতেই রয়েছে। জিজির

দেওয়া ঘাসের চটি রয়েছে পায়ে। ললনার দেওয়া কত সার্ট-প্যান্ট রয়েছে ওয়াড্রবে।

সকলের কাছেই কৃতজ্ঞতার সীমা নেই ওর। সবাই ওর জন্যে করেছে অনেক। কিন্তু পূষণ কারুকেই বোঝাতে পারেনি, কৃতজ্ঞতা নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। কৃতজ্ঞতা এক ভয়ংকর মানসিক বোঝা। বস্তুত পূষণ যা স্বীকার করতে চায় না তা হলো, কৃতজ্ঞ হতে ও জানেই না। ঐ শব্দটির অর্থই জানে না। খুব কম মানুষই পৃথিবীতে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকতে পারে। কৃতজ্ঞতাবোধ এক মহৎ গুণ—মলিন মানুষের যা থাকে না। কেননা কৃতজ্ঞ থাকার জন্যে অন্য মানুষটির কাছে নিজের আত্মার কিছু কণা অন্তত নির্বিকার নিবেদন করতে হয়, থাকতে হয় ঈষৎ নতজানু। ঔদ্ধত্য, যা অহং তাড়িত মানুষের স্বভাব, তার বিরোধিতা করে।

দুধের গ্লাসটা ধুয়ে রেখে আবার সোফায় এসে বসল পূষণ। জিজিকে কি ফোন করবে? না, থাক। অফিসে গিয়ে ভাবা যাবে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। এখন বেরিয়ে পড়লে সাড়ে এগারটার মধ্যে অফিসে পৌঁছে যাবে। ফাইলপত্র নিয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে লিফটের দিকে এগিয়ে যায়। পায়ে ঘাসের চটি, হাতের মুঠোয় প্রিয়পছন্দ কলম।

নিজের নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ি রেখে অফিসের ভেতরে ঢোকার মুখে দারোয়ানের উৎসুক দৃষ্টি তাচ্ছিল্য করে সোজা লিফটের কাছে চলে আসে পূষণ। লিফটম্যান ইতস্তত চোখে ওর দিকে তাকায়। মানুষটকে চিনতে ভুল হয় না। এই চোস্ত সাহেবের গায়ের পোশাকের অর্থও বুঝে নেয় ঠিক। কিন্তু স্থির করতে পারে না সাহেবকে সহানুভূতিসূচক কিছু বলা উচিত হবে কিনা। এই সব মানুষের শোকের রং-রূপ সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। ভেতরে একটা ইচ্ছা ছটফট করে এইটুকু জানতে—কে গেছেন। ইচ্ছাকে উচ্চারণে ফুটিয়ে তুলতে যাবার আগেই লিফট পৌঁছে যায় ভি-আই-পি ফ্লোরে।

পূষণ সোজা চলে আসে এম. ডি.-র চেম্বারে। সেক্রেটারি মিস চাওলা ওকে দেখেই এগিয়ে আসে—একটু আগে খবরটা শুনলাম, মিঃ মিত্র। খুব দুঃখিত।

পূষণ ধন্যবাদ জানিয়ে জিজ্ঞেস করে, বস কি একা আছেন?

—না। মিঃ পাই রয়েছেন।

এম. ডি.-র সঙ্গে ডেপুটি এস. ডি. (ফাইন্যান্স)! ব্যাপার নিশ্চয় জটিল। ওকি দেরি করবে? নাকি এটাই সঠিক সময়। যদি টাইমিংয়ে ভুল হয়? হলেও জুয়া ওকে খেলতে হবেই। এতদূর এসে আর ফিরে যাওয়া চলে না।

বললো, বসকে বলুন আমি এসেছি, দেখা করতে চাই—একটুক্ষণের জন্যে।

অন্যসময় হ'লে পূষণ মিস চাওলার নধর শরীর চেখে ছেনে দেখত। দু'একটা হাল্কা রসিকতাও করত। ইয়ার্কির ছলে ওর সঙ্গে শয্যাগত হওয়ার অভিলাষ ছিটিয়ে দিত। এখন তা করা যায় না বলে সাবলীল উদাসীনতায় হাতের ফাইলে চোখ রেখে অপাঙ্গে দেখে নেয় মিস চাওলার চোখে বিস্ময় বা বাহবার ঢেউ ভাঙছে কিনা।

মিস চাওলা ইন্টারকম নাবিয়ে রেখে বলে, আপনি যেতে পারেন।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই অবাক পূষণ দেখে দূরের দেয়ালের কাছ থেকে এম. ডি. বরদাচারি ওরই দিকে হেঁটে আসছেন। উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছেন মিঃ পাই।

বরদাচারি ওর হাত ধরে বলেন, খবরটা শুনেই বড় দুঃখ পেয়েছি। বি ব্রেভ। জীবন তো এমনই।

পাইও বললেন, খুবই দুঃখের খবর।

—বাট মিত্র, তুমি এভাবে এলে কেন?

পূষণ বললো, ক্ষমা করবেন স্যার। এভাবে আসতে চাইনি আমি। কিন্তু আগামীকাল বোর্ড মিটিং রয়েছে, এই ফাইলগুলো লাগবে। তাই—আর যদি আপনারা আর কোনো ব্যাখ্যা বা তথ্য চান—সেজন্যে—

পাই ও বরদাচারি দৃষ্টিবিনিময় করেন। ওঁদের চোখের কথা পড়তে পারে না পূষণ।

এম. ডি.-র পাশে দাঁড়িয়ে বলে, স্যার এই পাতার পুরো স্কিমের লিস্ট লিখে রেখেছি। আপনি একবার দেখে নিন। আর্থিক পরিসংখ্যান, তার বিশ্লেষণও দেওয়া আছে।

বরদাচারি দ্রুত চোখ বুলিয়ে ফাইলটা পাই-এর দিকে এগিয়ে দেন। পাই পাতা উল্টে খুঁটিয়ে দেখেন। ওঁর চোখের উজ্জ্বলতা পুরু চশমার আড়াল থেকেও নিখুঁত পড়তে পারে পূষণ।

পাই এম. ডি.-র দিকে চোখ তুলে বলেন, আপনি ভাবছিলেন তো? দেখুন, মিত্র এই অবস্থার মধ্যেও কী চমৎকার কাজ করেছে।

চোখেমুখে থইথই হাসি ফুটিয়ে এম. ডি. বললেন, তোমাকে থ্যাঙ্কস বলারও ভাষা নেই আমাদের। তোমার এই আনুগত্য আমার মনে থাকবে।

পূষণ বললো, আমাকে কি কাল আসতে হবে, স্যার?

—না না। তোমার আসার দরকার নেই। এই অবস্থায়—না, না—তুমি চুকিয়ে এসো।

—আমার তো স্যার, এখন কদিন ছুটি লাগবে।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়। সেজন্যে তুমি ভেবো না। আর, হ্যে তোমার যদি কিছু দরকার থাকে—আফটার অল সামাজিক দায় একটা বড় ব্যাপার—আদারওয়াইজ অলসো।

পূষণ বুঝতে পারে এম. ডি. কি ইঙ্গিত করছেন। ও তাড়াতাড়ি বলে, না-না স্যার। সব ঠিক আছে। আমার কিছু লাগবে না। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

এম. ডি.-র ঘরের কাছে একটা ছোট লাউঞ্জ। পূষণ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখে সেখানে বেশ কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। হেগড়ে, কুমার, অনুপল ছাড়াও আরো কয়েকজন সিনিয়র অফিসার। ওর আসার খবর চাউর হয়ে গেছে অফিসে। সকলের চোখ ওর পোশাকের ওপর। সকলের কণ্ঠে সহানুভূতির সরস উচ্চারণ।

পূষণ মুখে আলতো বিষণ্ণতার রেণু ছড়িয়ে ঠোঁটের ভাঁজে কৃতজ্ঞ হাসি ঝুলিয়ে রাখে। বিনীত ভাবে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিজের চেম্বারে ঢোকে।

মার্গারেট বলে, আপনি! এসেছেন শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছিল না।

—না এসে উপায় ছিল না। জরুরী চিঠিপত্র কিছু আছে?

—চিঠিপত্র তো থাকবেই। আজ আমি আপনাকে সেসব দেব না। আপনি বাড়ি যান।

বাড়ি তো যাবই। এসেছি যখন মেল দেখে যাই। খবর আছে কিছু?

কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে নিজের টেবিলে বসে চিঠি, নোট দেখতে শুরু করে পূষণ। সবই প্রায় রুটিন ব্যাপার; ও বিশেষ আগ্রহ বোধ করে না।

হঠাৎ মার্গারেট এসে বললো, একটা খবর দেব আপনাকে—এসেই যখন গেছেন, আপনার জানা ভালো।

—বলো।

—গ্লোবাল এন্টারপ্রাইজের প্রজেক্টটা নিয়ে সমস্যা হয়েছে বোধ হয়। মিঃ পাই খুবই আপসেট ছিলেন সকালে।

গ্লোবাল এন্টারপ্রাইজ! ওটা তো হেগড়ে আর কুমার দেখছিল।

—হ্যাঁ। কিন্তু মিঃ পাই খুব রাগারাগি করেছেন। ওঁর পি. এ. বলেছে আমাকে।

এই প্রজেক্ট বহু টাকার পূষণ জানে। টাকার চেয়েও বড় কোম্পানির ইজ্জত—যার সঙ্গে মিঃ পাই-এর ইজ্জতও সমভাবে যুক্ত। কিন্তু সমস্যাটা কি? হেগড়ে-কুমারের দেওয়া মার্কেট রিপোর্ট ও আর্থিক আগামবাণী ওরা অনুমোদন করেনি? নাকি প্রতিযোগী কোম্পানি 'সিলভার ব্লু' কাজটা নিয়েছে?

পূষণ বললো, মার্গারেট, আমি বাড়ি যাচ্ছি। মিস লাহিড়ী ফোন করলে তক্ষুনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বোলো।

পূষণ জানে ওর মাথায় জেগে-ওঠা প্রশ্নাবলীর উত্তর সংগ্রহ করতে পারে একমাত্র জিজি।

৫

অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা নিজের ফ্ল্যাটে চলে আসে পূষণ। ঘরে ঢুকে সোফায় শরীর এলিয়ে দিতেই স্নায়ুর সিঁড়ি ভেঙে ক্লান্তির উঠে আসা টের পায়। এ-ক্লান্তি শরীরের নয়। মনের। চোকস হাবভাবের আড়ালে গোপন টেনশন-স্নায়ুচাপ সারাক্ষণই পাড় ভেঙে গেছে। ঝুঁকিটা কি বেশি হয়ে গেল? কিংবা বেহিসেবী? এম. ডি., ডেপুটি এম. ডি. মৌখিক সৌজন্য ছাড়া অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস তেমন দেখাননি। তাঁদের পক্ষে তা দেখানো সঙ্গতও নয়। ও বেরিয়ে আসার পরে কি আলোচনা করবেন না ওকে নিয়ে? বা, যদি মার্গারেটের খবর ঠিক হয় গ্লোবাল এন্টারপ্রাইজের প্রজেক্ট নিয়ে ওঁরা হয়তো খুবই বিপন্ন হয়ে আছেন। যদি প্রজেক্টটা নামমঞ্জুর হয়ে থাকে তবে বোর্ড মিটিঙে এম. ডি. খুবই অপদস্থ হতে পারেন। তার ফলে অবশ্য হেগড়ে ও কুমারের শর্ষে ফুলের হলুদ নৃত্য দেখা অবধারিত।

এতে পূষণের খুশি হওয়া উচিত। কিন্তু ওর মাথায় তেমন গোবর নেই যে ঘুঁটে-পোড়া দেখে আনন্দ পাবে। সে-ও কি নিজের ভবিষ্যৎ ফাইল-বন্দী করে এম. ডি.-র হাতে তুলে দিয়ে আসেনি? হ্যাঁ, তার আত্মবিশ্বাস এখনো স্থিতধী রেখেছে। কিন্তু পায়ের তলায় যাকে মাটি ভাবছে তা বালুও হতে পারে—চোরাবালি হওয়াও অসম্ভব নয়। ওদের মতন কর্পোরেট আমলাদের জীবনে এমন হয়—হামেশা হয়। তবে, যুদ্ধ যুদ্ধই। ক্রিকেটের মতন শেষ বল পর্যন্ত খেলে যেতে হবে। না-লড়ে সূচ্যাগ্রও ছাড়া যায় না।

অতএব ওর কি উচিত নয় গ্লোবাল এন্টারপ্রাইজের ব্যাপারটা সম্পর্কে যথোচিত খোঁজখবর নেওয়া? যদি দায়িত্বটা ওকে দেওয়া হয় এবং যদি—অবশ্যই খুবই বড় যদি—ও সফল হয় তবে কি ডি. পি. এম. পদে ওয়াক-ওভার পাবে না?

ডি. পি. এম! চিন্তাটা মাথায় বৈদ্যুতিক চক্রের মতন ঘুরতে থাকে। তাঁর আলোর বিচ্ছুরণ অনুভবে উষ্ণতা ছড়ায়। এমন উষ্ণতা যাতে স্নায়ু-ক্লান্তি উঠে যায়।

মনে মনে একটা স্ট্র্যাটেজি ছকার চেষ্টা করে—কিভাবে দায়িত্বটা নিতে পারে, এবং কিভাবে সফল হতে পারে। সবার আগে হেগড়ে-কুমারের রচিত ব্লু-প্রিন্ট, ফাইল মুখস্থ করা দরকার। তারপর জানতে হবে কারা কারা প্রতিযোগী। এবং অবশ্যই কার মর্জি, হুকুম বা আহ্লাদে অনুমোদনটা আসবে। প্রতিবারের মতন এবারও কি নিজস্ব পদ্ধতিতে চলবে?

নিজের মধ্যে অনেক কাটাকুটি খেলে পূষণ মিস চাওলাকে ফোন করল। বললো, জানেন তো এখন আমি কেমন মানসিক অবস্থায় আছি। তার ওপর শুনলাম গ্লোবাল প্রজেক্টটা নিয়ে নাকি ঝড় উঠেছে। যদিও আমি ডিটেলস জানি না তবু খুব খারাপ লাগছে। অসুবিধে না-থাকলে আসল ব্যাপারটা কি একটু বলবেন!

গলায় এমন নিষ্পাপ কাতরতা ফুটিয়ে তুললো যে মিস চাওলাকে ভাবতেই হবে এ-মানুষটা কী রকম ঐকান্তিক কোম্পানিগত প্রাণ। মনে মনে সম্ভ্রম না-করেও পারবে না।

ও জবাব পায়—মিঃ মিত্র, আপনি এখনো এসব নিয়ে ভাবছেন! জানেন তো আমার পক্ষে এসব বিষয়ে কথা বলা একেবারে নিষেধ, তবু আপনাকে বলছি যা শুনেছেন ঠিক। অটোমেশন নিয়ে লেবার প্রবলেম আছে, আবার 'সিলভার ব্লু'-র মিঃ লোকো অনেক বেটার অফার দিয়েছেন। মিঃ হেগড়ে ও কুমার খুবই চেষ্টা করছেন যদিও। কিন্তু এম. ডি. একেবারে আগুন হয়ে আছেন। এর বেশি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, প্লিজ।

—ঠিক আছে। অনেক ধন্যবাদ। শুধু সুযোগ পেলে এম. ডি.-কে বলবেন, এখনো সম্পূর্ণ হতাশ হবার কারণ নেই।

—তার মানে?

—যদিও ওটা আমি ডিল করি না, তবু জিজ্ঞেস করলে বলবেন—আমার বাবা মারা গেছেন, আমি কিন্তু বেঁচে আছি। আর, আমি হচ্ছি ইনকরিজিব্‌ল অপটিমিস্ট। আচ্ছা, রাখছি।

খুব নিখুঁত অঙ্ক না-কষেও ঢিলটা ছুঁড়ে দিতে পেরে ভালো লাগে পূষণের। আজ-কালের মধ্যেই এম. ডি.-র কানে কথাগুলো হুবহু ঢুকবে। এবার ওকে অন্য

বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে। আর! আবার একটা চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জ যত কঠিন হয় ততই মজা। বিশেষত যে-চ্যালেঞ্জ নিজে যেচে নেওয়া যায়।

একটু পরেই জিজির ফোন আসে।

—হ্যালো—

—পূষণ! আয়্যাম সো স্যরি। মার্গারেটের কাছে শুনে এত খারাপ লাগছে। তুমি একদিনও আমাকে নিয়ে গেলে না। তোমার মা কেমন আছেন?

গলগল করে এমন অনেক কথা বলে যায় জিজি। পূষণ রিসিভার কান থেকে এক ইঞ্চি দূরে রাখে।

—কী তুমি কিছু বলছ না যে!

মৃদু শব্দ তুলে গলায় হাসির আভাস এনে পূষণ বলে, তুমি একাই এত বলে যাচ্ছ যে আমি বলার সুযোগ পাচ্ছি কোথায়!

—আজ তোমার অফিসে না-এলে চলত না?

—না, চলত না। শোনো, তুমি এখন একবার এখানে আসতে পারবে? খুব জরুরী দরকার আছে।

—কি দরকার?

—সে টেলিফোনে বলা যাবে না। আসতে পারবে কিনা বলো। আমাকে সোনারপুর ফিরতে হবে সন্ধের আগে।

—ওঃ—তুমি না—ঠিক আছে আসছি। আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।

টেলিফোন রেখে পূষণ জিজিকে কী বলবে তার রিহার্সাল দেয় মনে মনে। জিজি 'কেরিয়ার উওম্যান' পাক্ষিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। সেই সুবাদে প্রতিষ্ঠিত সফল মহিলাদের প্রচুর সাক্ষাৎকার নিয়েছে, তাদের সম্পর্কে ফিচার, প্রবন্ধ লিখেছে। ঝকঝকে ইংরেজী কাগজে নিজেদের রঙিন ছবি দেখে উচ্ছল হবে না এমন নারী পৃথিবীতে নেই। ঐসব মহিলাদের অনেকের সঙ্গেই জিজির বন্ধুত্ব। জিজির বাবা চার-পাঁচটা কোম্পানির ডিরেক্টর। ওর দাদা প্লাবন তো কলকাতার বিখ্যাত ক্লাবের মধ্যমণি। ও-ই পারবে প্রয়োজনীয় খোঁজখবর এনে দিতে। বস্তুত ডি. পি. এম-এর স্বপ্ন পূষণের চোখে গেঁথে দেয় জিজিই। ইতিহাস কেবলি পুনরাবৃত্তি করে কেন? একদা কাকলি ওকে দেখিয়েছিল সফলতার সোপান। জিজি ওকে আরো কত উঁচুর দিকে তাকাতে বলবে? অবশ্য জিজির মধ্যে একজন বোহেমিয়ানও আছে। মাঝে মাঝেই বলে—এত ছোটাছুটির কোনো মানে হয় না। কোনো মানে হয় না বেশি উঁচুতে ওঠার। তাতে জীবনকে ধরা যায় না,

আঁকড়ে থাকাও যায় না। হাতের মুঠোয় জীবনটা ধরে যদি খুশিমতন কচলাতে না-পারি তবে মানুষ না হয়ে রোবট হলেই চলত!

পূষণ বলেছিল, তুমি ঠিক জান তুমি কী চাও?

—হ্যাঁ, মশাই, খুব জানি। কিন্তু এ জানাটাও বৃথা। কেননা আমার জানা আমারই কোনো কাজে লাগছে না।

—কী বলছ, কিছু বুঝলাম না।

—তাও জানি। বুঝলেই যে মুশকিল। তুমি না-বুঝে বেশ ভালো আছ। তাই থাকো। তবে আমার একেক সময় খুব ক্লান্ত লাগে। তখন মনে হয় সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে মার মতন ঘর-সংসার করি।

পূষণ হাসে—করলেই পারো। বাধা দিচ্ছে কে?

জবাব না-দিয়ে জিজি 'জ্যামাইকা ফেয়ারওয়েলে'র সুর গুনগুন করেছিল।

আবার একদিন বলেছিল, দূর, রোজ রোজ ঘরে বসে হুইস্কি খাওয়ার কোনো মানে হয় না। চলো বেরিয়ে পড়ি।

পূষণ বলে, কোথায় যাবে?

—যেখানে খুশি। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ো তারপর দেখা যাবে কোথায় যাওয়া যায়।

—তা হয় নাকি! একটা গন্তব্য ঠিক না করে—কোথায় গিয়ে উঠবে—থাকবে, কী খাবে ব্যবস্থা না করে যাওয়া যায় নাকি!

—তুমি পারবে না। কিন্তু আমি পারি। অত হিসেব কষে আমি চলতে পারি না। জীবন কি অ্যালজাব্রা না ত্রিকোণমিতি?

—তবে জীবন কি?

অদ্ভুত হেসে জিজি বলেছিল, একেক সময় একেক রকম। এখন আমার কাছে জীবন হচ্ছে ধু ধু মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে-যাওয়া একলা বাতাস।

বলেই হো হো করে হেসে উঠেছিল, এসব তোমার মাথায় ঢুকবে না পূষণ। তুমি বরং আরেকটু হুইস্কি খাও।

এইসব মুহূর্তে পূষণের মনে হয়, ও ঠিক জিজিকে বোঝে না। জিজি সম্পর্কে ওর ধারণা হয়তো ঠিক নয়। এবং হয়তো জিজি ওরই সম্পর্কে বড় বেশি জেনে ফেলেছে। অথচ অনুমানে কেন, জ্ঞানে থাকলেও জিজি কখনো ওর পূর্বনারীদের বিষয়ে কখনোই কিছু বলে না। হয়তো এসব কারণেই জিজির প্রতি ওর আকর্ষণ

এখনো অটুট। নারী চরিত্র বিষয়ে পুরুষ স্বভাব-নির্বোধ। সেই নির্বোধ চোখে রহস্যময়তাই নারীরূপের সবচেয়ে মূল্যবান প্রসাধন।

আড়াইটে নাগাদ জিজি এলো। পূষণ যখন ফিরেছিল তখন বাইরে ছিল প্রখর রৌদ্র। তারপর কখন বৃষ্টি নেমেছে ঘরে বসে বোঝা যায়নি। জিজির মাথায় জলের ফোঁটা, শাড়ি-ব্লাউজে ছিটান ভেজা-দাগ বুঝিয়ে দেয় ও বৃষ্টিতে পড়েছিল।

রুমালে মুখ মুছে জিজি একটুক্ষণ পূষণের দিকে তাকিয়ে থাকে। এত চেনা মানুষটাকে ভীষণ অন্যরকম লাগে। নরম গলায় জিজ্ঞেস করে, খুব কষ্ট হয়েছে?

—অস্বাভাবিক কিছু না। বসো তুমি।

উল্টোদিকের সোফায় বসে জিজি বললো, এখন তো কত কি নিয়ম-টিয়ম মানতে হয়। তুমি করছ? খাচ্ছ কি?

সরল হাসে পূষণ, যেটুকু না-করলে নয় আর কি! সব নিয়ম মানলে কি এখানে আসতাম।

—কী দরকার ছিল আসার!

—দরকার ছিল নয়, দরকার আছে। খুবই দরকার। গত বাবার চেয়ে অনাগত ভবিষ্যৎ অনেক বেশি জরুরী।

একটু থেমে পূষণ বলে, জিজি, আমার কিছু কাজ করে দিতে হবে। এখন আমার পক্ষে বেশি ঘোরাঘুরি করায় অসুবিধে আছে। তাছাড়া কাজটা করতে হবে গোপনে—মানে সরাসরি আমি জড়িয়ে আছি তা প্রচার না হওয়াই ভালো। খুব ট্যাক্টফুলি করতে হবে। আমি তোমার ওপর নির্ভর করছি। করে দেবে তো?

জিজি বললো, কাজটা কি? পারলে করব না—তোমার কাজ—হয় নাকি! তোমার মতন সেলফ্‌মেড আমার সাহায্য নেবে, সেটাই তো ভাবা যায় না।

—ইয়ার্কি নয়, জিজি। আমি খুব সিরিয়াস।

—ও কে, বাবা! বলো কাজটা কি?

পূষণ সংক্ষেপে ওকে গ্লোবাল প্রজেক্টের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে—কি কি তথ্য ওর জানা দরকার। কি কি যোগাযোগ প্রয়োজন। এবং বিষয়টার সিদ্ধান্ত এখন কোন পর্যায়ে কার কর্তৃত্বে রয়েছে।

সব শুনে জিজি বললো, এটা যে তোমাদের কোম্পানি পাচ্ছে না সে তো আমি আগেই জানি।

অবাক পূষণ বলে, জানো? তবে আমাকে বলোনি কেন?

—তোমাকে কেন বলব! তুমি তো ওসব ডিল কর না। তবে এখনো ফাইন্যাল কিছু হয়নি।

—কি করে জানলে?

—জানলাম, কারণ গত সপ্তাহেই আমি অপরা দাশগুপ্তকে ইন্টারভিউ করেছি। অপরা—গ্লোবালের এম. ডি. মিঃ মায়ারের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিসটেন্ট। এ-ব্যাপারের পুরো চাবি ওরই হাতে।

স্বগত উচ্চারণ করে পূষণ—অপরা দাশগুপ্ত। মনে করার চেষ্টা করে নামটা চেনা কিনা, বা মানুষটকে কখনো দেখেছে কিনা। মাথায় কোনো স্মৃতির ঘণ্টা বাজে না।

জিজি বলে, তুমি ওঁকে চিনবে না। কিছুদিন হলো গ্লোবালের বম্বে অফিস থেকে এসেছেন।

—তুমি কি জান ওঁর সম্পর্কে—মানে ওঁর ব্যাকগ্রাউণ্ড, কি রকম মানুষ—

দুষ্টু হেসে জিজি বলে, আনম্যারেড অ্যাণ্ড জাস্ট মেড ফর য়ু!

মৃদু হেসে পূষণ বলে, ডোণ্ট বি সিলি! ঠিক ঠিক বলো কি জান?

গলা গম্ভীর করে জিজি বলে, প্রথমেই তোমাকে সাবধান করে দিই, খুব কঠিন ঠাঁই। সী ইজ এ টাফ প্রফেশ্যনাল। শান্তিনিকেতনের এম. এ.। আমেরিকায় এম. বি. এ.। ওঁর বাবা ছিলেন ডিপ্লোম্যাট। আলিপুরে কোম্পানি ফ্ল্যাটে একা থাকেন। নিজের কাজ খুব ভালো বোঝেন। কোনো নেশা নেই। হবি—রবীন্দ্রসংগীত শোনা। দেখতে ভালো। রূপের অহংকার নেই, মর্যাদা আছে।

মন দিয়ে শুনছিল পূষণ। জিজির বলা শেষ হলে মাথায় মোটামুটি একটা ছবি এঁকে নেয়। পরে ভেবে দেখবে, কিভাবে অপরা দাশগুপ্তের কাছে পৌঁছানো যায়।

বললো, আমার দরকারী তথ্য ও কাগজপত্র কবে জোগাড় করে দেবে?

—পারব কিনা বলতে পারি না। তবে চেষ্টা করব। আগামী সপ্তাহ নাগাদ—এটুকু সময় তো দেবে।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়। টেক ইওর টাইম।

জিজি বললো, আই নীড আ ড্রিঙ্ক।

—সবই আছে। যা ইচ্ছে নাও।

—তুমি খাবে?

—না।

—কেন, সংস্কার?

তক্ষুনি জবাব দিতে পারল না পূষণ। একটু ভেবে বললো, বোধহয় তা নয়। লোকভয়। মুখে গন্ধ পেলে কেউ কিছু বলতে পারে। আর সত্যি বলতে কি ইচ্ছেও করছে না।

চোখে-মুখে দারুণ দুষ্টুমি ফুটিয়ে জিজি বলে, তাহলে যা খেলে কেউ গন্ধ পাবে না তাই খাও।

ভুরু কুঁচকে পূষণ বললে, মানে—কি বলছ—

ওর মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে জিজি বললো, আমাকে খাও।

বলেই ওর বুকে ঝাঁপিয়ে শব্দ করে চুমু খায় জিজি। চমকে উঠে তড়িৎ ক্ষিপ্রতায় নিজের শরীর থেকে জিজিকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে পূষণ। সংস্কারবশত নাকি লৌকিক দায়বশত তা ও জানে না। মাথার খুব ভেতরে কেউ যেন দমকলের ঘণ্টা বাজায়—এখন এমন করতে নেই। পিতৃদশায় শুচি থাকা নিয়ম।

কেন এটা অশুচি, কে করেছে এ-নিয়ম এমন প্রশ্ন মাথায় না-জাগলেও শরীরের প্রতিক্রিয়া ছিল নির্ভুল।

ধাক্কায় দূরে-সরে-যাওয়া জিজি হা-হা হেসে বলে উঠল—এই তোমাকে পুরীর পাণ্ডার মতন দেখাচ্ছে। সুদর্শন পাণ্ডা!—বলেই আরো জোরে হাসতে থাকে জিজি। বোবা চোখে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকে পূষণ। মেয়েটা পাগল নাকি? জিজির খেয়ালীপনা জানা থাকা সত্ত্বেও অবাক না হয়ে পারে না ও।

জিজির মধ্যে তখন এক পাগল ইচ্ছার দাপাদাপি। ধড়া-চাদর-পরা সৌম্য পূষণের এতক্ষণের উপস্থিতিই যে ওর মধ্যে একটা ভিন্নতর মানুষের আসঙ্গ-বাসনা সৃষ্টি করেছে তা ও জানে না। নিজের অন্তর্গত অস্থিরতায় শুধু অনুভব করে, এই শুচিগ্রস্ত মানুষটকে তছনছ না করতে পারলে শান্তি নেই। শাসন ভাঙার উন্মাদনার আকর্ষণ অমোঘ।

ও আবার পূষণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তীব্রভাবে চুমু খায়। হাতের ঝটকায় সহজেই আক্রহীন হয় পূষণ। নিজেকেও মুক্ত করতে করতে জিজি বলে, এর আগে কোনো পাণ্ডা বা পুরোহিতের সঙ্গে করিনি। দেখি কেমন লাগে।

মানসিক বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও পূষণ আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করে জিজির ডাকে শরীর ঠিক ঠিক সাড়া দেয়। চেষ্টা করেও নিজেকে চিন্তাবন্দী রাখতে পারে না। লৌকিক শুচিবোধ তুচ্ছ কুটোর মতন ভেসে যায় রক্তের উথালপাতাল ঢেউয়ে।

অনেক পরে নিজেকে সাব্যস্ত করে জিজি বলে—থ্যাঙ্কু! য়ু আর গ্রেট—অ্যাজ এভার!

ভাঙা গলায় পূষণ বলে, কি বিচ্ছিরি ব্যাপার করলে বল তো!

—তোমার খারাপ লেগেছে! অপরাধী লাগছে নিজেকে?

—না—মানে—ঠিক বুঝতে পারছি না—কিন্তু নিজের মধ্যেই একটা কষ্ট টের পাচ্ছি—কেন বলতে পারব না।

—আয়্যাম স্যরি, পূষণ।

জিজি জানেও না যে ওর চোখে জল।

৬

দোতলায় লাবুর ঘরে বসেছিল পূষণ।

বাইরে শ্রাবণের বিষণ্ণ বিকেল। আকাশে থোকা-ধরা কালো মেঘ। সারাদিনই বৃষ্টি পড়েছে থেকে থেকে। ঘরের মধ্যে গুমোট। শরীর-ভেজানো ঘাম। জানালায় বকফুল গাছের গলা জড়িয়ে দুলছে গোলাপজামের শাখা। গোলাপজাম গাছটা পূষণ লাগিয়েছিল। এক সময় গাছ লাগানোর, বাগান করার শখ হয়েছিল। এখন অনেক চেনা গাছেরও নাম ভুলে গেছে। নিজের লাগানো গাছকেও চিনতে পারে না।

এই কদিন যা গেল তাতে ওর মনে হয়েছে এত বছরে নিজের মানুষজনদের ও চিনতে পারেনি। কিংবা শুধুই ভুল জেনে এসেছিল। আর মাত্র দুটো দিন কাটিয়ে চলে যেতে পারলে সহসা ও আর সোনারপুরে আসবে না।

বাবা যতদিন ছিলেন বোঝেনি, এখন বুঝেছে তিনি শুধু মাথার ওপরে আশ্রয়ই ছিলেন না, ওদের সকলকে একসঙ্গে জুড়ে রাখার সুতোও ছিল তাঁর হাতে। হাতটা হারিয়ে যেতেই সবাই ছুটছে নিজস্ব স্বার্থ খুঁটে নিতে। পেশাগত জীবনে যতই চালিয়াৎ-তৎপর হোক না, ব্যক্তিগতভাবে ধূর্ত ধান্ধা শেখেনি পূষণ। মৌলিক মূল্যবোধ এখনো ছাড়তে পারেনি। অথচ দাদা, লাবু, এমনকি মা-ও যা করলেন, কখনো কল্পনা করেনি এমন হতে পারে। সমীরদা ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। সমীরদা না থাকলে ও যে কি করত ভেবে পায় না।

ঝামেলার শুরু শ্রাদ্ধানুষ্ঠান নিয়ে। দাদা ও মা-র ইচ্ছে বৃষোৎসর্গ হোক। পূষণ মতামত দিতে চায়নি। যা করলে সবাই খুশি হয় তাই করা হোক। কিন্তু

খরচের কথা উঠতেই দাদা বললেন, আমার আর কী ক্ষমতা! সংসারই চালাতে পারি না—ঐ টাবু যা করবে—

মার টাকা দেবার কথা ওঠে না। লাবু বললো, হাজার খানেক দেবে।

পূষণ হিসেব করে দেখে শ্রাদ্ধ ও তারপর লোকজন খাওয়ানো ইত্যাদি নিয়ে বিপুল খরচের ভার ওর ওপর পড়ছে। অত টাকার সংস্থানই ওর নেই। সমীরদা আগেই সাবধান করে বলেছিল, মেজবাবু, সংসার বড় কঠিন জায়গা। কেবল তিমি-তিমি খেলা। ওজন বুঝে কাজ করো।

পূষণ বলেছিল, সঙ্গতি যখন নেই, এ-সব করার দরকার কী? কালীঘাটে গিয়ে ঘাটকাজ সেরে এসে আত্মীয়স্বজন কয়েকজনকে ডেকে খাওয়ালেই হয়।

ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে সোরগোল।

দাদা বললেন, আমরা তিন ভাই থাকতে কালীঘাটে গিয়ে—আমাদের একটা মান ইজ্জত নেই?

মা কান্নাকাটি শুরু করলেন।

বৌদি বললেন, এমন কাণ্ড শুনিনি বাপু। গাড়ি করার, ফ্ল্যাট হাঁকাবার টাকা থাকে, বাপের শেষ কাজের জন্যে টাকা থাকে না!

দিদি বললো, টাবু, মাথা গরম করিস না। তুই যখন পারিস, বেশিটা তোকেই দিতে হবে। সব দিক বজায় রেখে কাজটা কর। জীবনে বাবার জন্যে এ-কাজ তো একবারই করবি।

খুব সরল ছিল না বিষয়টি। আরো ঢের কচকচানির পর তিতিবিরক্ত পূষণ বলে, আমি দশ হাজার দেবো—তোমাদের যা খুশি করো। তবে খরচাপাতির দায়িত্ব থাকবে সমীরদার ওপরে।

সঙ্গে সঙ্গে বৌদি বলেন, নিজের দাদা-ভাই থাকতে জামাইবাবুর ওপর বোঝা চাপানো—

দাদা সামাল দিতে বলে ওঠেন—না, না, সমীরই সব করবে। সেটাই ভালো হবে। আমি তো কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকব।

পরে সমীরদা বলেছিলেন, মেজবাবু, আমাকে ফাঁসালে ঠিক আছে, কিন্তু চালটা দিয়েছ দারুণ। বৌদি ঠাকুরনের এক গাল মাছি, সব হিসেব ফট!

—সমীরদা, আগে কখনো গা করিনি। একদিনে যা দেখলাম—চোখ বুজে তো থাকিনি—না বলাই ভালো। নিজের গায়ে থুথু ছিটোতে কার ভালো লাগে!

পরের ঝামেলা লাগলো বাড়ি নিয়ে।

বাবা কেবল একতলার তিনটে ঘর করেছিলেন। পরে দোতলা এবং অন্যসব সরঞ্জাম লাগান, পাম্প বসান, আধুনিক বাথরুম করা, নতুন করে প্লাস্টার করে সুদৃশ্য করে তোলা—এ-সবই করিয়েছে পূষণ। বাবা যেমন বলেছেন টাকা দিয়েছে পূষণ। ও জানত না যে দাদা বাবাকে দিয়ে উইল করাতে চেয়েছিলেন, যাতে দোতলা দাদার হবে, একতলা থাকবে মা ও লাবুর। বিয়ে না করলে নিভা একটা অংশ পাবে। বাবা রাজী হননি, কেননা পূষণকে তিনি বঞ্চিত করতে পারেন না।

দাদা বলেছিলেন, টাবু তো এখানে থাকবে না। ও কি বালিগঞ্জ ছেড়ে আসবে? শুধু শুধু আইনের ঝামেলা রেখে কি লাভ?

বাবা বললেন, টাবু আসবে কি আসবে না—থাকবে কি থাকবে না সেটা ওর ব্যাপার। কিন্তু ওর আসার-থাকার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আমি তা হতে দেবো না।

শেষ পর্যন্ত বাবা অবশ্য কোনো উইল করে যাননি।

দিন দুয়েক আগে মার ঘরে সন্ধেবেলা বসেছিল সবাই। তার আগেরদিন জবলপুর থেকে সীমা ও ওর বর অঞ্জনও এসেছে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, বাবার স্মৃতিকথা ও এলোমেলো নানা কথা হচ্ছিল।

মা বললেন, ওঁর খুব ইচ্ছে ছিল নিভার বিয়েটা দিয়ে যাওয়ার। তোরা একটু গা করলেই হয়ে যেতো।

দিদি বলেন, ওসব কথা থাক মা। এখন এক বছর তো আর বিয়ে হবে না। পরে দেখা যাবে। দাদা আছে, টাবু আছে। তুমি ভাবছ কেন!

মা বলেন, পুরোনো নিয়মকানুন এখন আর কে মানে! কাজকর্ম চুকে গেলে তোরা বরং দেখেশুনে নিভার বিয়ের একটা ব্যবস্থা কর। আমিও যে কদিন আছি!

নিভা বলে ওঠে, সে কি মা! এই তো সেদিন বৃষোৎসর্গ নিয়ে মেজদার সঙ্গে সবাই ফাটাফাটি করলে। ওরকম না করলো নাকি মান থাকে না, রীতি থাকে না।

শোভাবৌদি বলেন, কি কথায় কি বলছ। ওটা হলো মান-সম্মানের কথা। নিয়ম-পালন তো তিল-তুলসী দিয়ে হয়। হয় বলেই তো তা করা যায় না।

লাবু বলে, কিন্তু নিয়ম ভেঙে নিভার বিয়ে দেওয়া যায়, তাই না বৌদি?

নিভা বলে, তোমাদের কি আর কিছু বলার নেই? আমায় বিয়ে নিয়ে

কারুকে ভাবতে হবে না। মেজদা, তুমি আমাকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দাও।

উত্তর না-দিয়ে পূষণ মৃদু হাসে।

সীমা বলে, চাকরি যদি করবি মেজদাকে বলছিস কেন? নিজে জোগাড় কর। মেজদা কি কল্পতরু? ওকে কে চাকরি খুঁজে দিয়েছে? সব কথায় খালি মেজদা—মেজদা—

দিদি বলে, ঠিক বলেছিস সীচু। মা, তুমি টাবুর বিয়ের কথা ভেবেছ কখনো? কখনো বলেছ?

সোৎসাহে নিভা বলে, ঠিক, বড়দি। তুমি মেজদার বিয়ের জন্যে চাপ দাও তো।

এ-সব কথা পুরো শুনছিল না পূষণ। ও ভাবছিল, এ-বাড়িতে এখনো শোকের বাতাবরণ। বাবার শ্রাদ্ধকাজ এখনো বাকি। অথচ কী অনায়াসে ঘর সংসার বিবাহ নিয়ে সবাই কথা বলছে। আসলে চলমানতাই জীবন, মৃত্যু তার মধ্যে ক্ষণিকের যতিচিহ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। কান্নার সঙ্গে দীর্ঘ সহবাস সম্ভব হয় না।

শোভাবৌদি দাদাকে বলেন, তুমি যে কি বলবে বলেছিলে—

মাথা তুলে দাদা প্রসন্ন বলেন, হ্যাঁ—মানে—টাবুকে যে আবার কবে পাওয়া যাবে তার ঠিক নেই। বাবা তো চলে গেলেন। সব ঝক্কি আমাকেই পোহাতে হবে। বাড়িটা বাবার নামে। তার সাকসেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। আমি বলছিলাম, বারবার ঝামেলায় না-গিয়ে তোরা যদি রাজী থাকিস তাহলে কাগজ-পত্র সই করে দিলে আমি ঘোরাঘুরি করে যা যা করার করব।

প্রতিমা, পূষণের দিদি, বললেন, দাদা, তুমি কি ভাগাভাগির কথা বলছ?

—না, না। ভাগাভাগি নয়। তবে কে কোথায় থাকবে, কার কি অংশ তার একটা লেখাপড়া থাকা ভালো। পরে কোনো আর ঝামেলা হবে না, কোর্ট-কাছারিও করতে হবে না। সেজন্যেই আর কি। এখন তো মেয়েরাও অংশীদার।

প্রতিমা, সীমা একসঙ্গে বলে ওঠে, আমাদের কিছু লাগবে না। কাগজ দাও এক্ষুনি লিখে দিচ্ছি।

সমীর বলেন, বাকি ভাগাভাগি কি হবে?

প্রসন্ন তখন একতলা দোতলার ভাগের কথা বলেন।

সীমা বলে, মেজদার কিছু থাকবে না?

শোভা জবাব দেয়, বড়সাহেব কি এখানে থাকবেন?

প্রতিমা বলেন, থাক না থাক, ওর অংশ নিশ্চয় থাকবে।

প্রসূন বলেন, ও থাকতে চাইলে তো খুবই ভালো। তিনতলা তুলে নিয়ে চমৎকার থাকবে। আমরাও তা চাই। ও এসে থাকুক।

সীমা প্রতিবাদ করে—তা কেন হবে! তিনতলা তোলা সোজা কথা নাকি! মেজদার কি টাকার গাছ আছে? দোতলা তো মেজদাই করেছে, ওটা তো ওরই পাওয়া উচিত। দাদা, তুমি বরং তিনতলা তুলে থাক।

—আমি!—প্রসূন অবাক ভঙ্গিতে বলেন, আমার সামান্য চাকরি, তিনটে ছেলেমেয়ে, আমি কোথায় টাকা পাব!

প্রতিমা বলেন, তাহলে একতলায় যেমন আছ তেমনি থাকো। দোতলা দখল করতে চাইছ কেন?

শোভা ঝাঁঝিয়ে ওঠে—দখল—দখল আবার কি! তিনটে ছেলেমেয়ে নিয়ে এক ঘরে অসুবিধে তাই দোতলার কথা বলা হচ্ছে। নিচে মা, লাবু নিভার আলাদা ঘর তো থাকছেই।

প্রতিমা মন্তব্য করেন, শুধু টাবুর কোনো ঘরের দরকার নেই!

সকলকে থামিয়ে মা বলেন, তোরা এত আবোল-তাবোল বকতে পারিস। তোরা বড় খোকার কথা বোধহয় বুঝতে পারিসনি। একটা ঘরে তো ছেলে-মেয়ে নিয়ে সত্যি অসুবিধে হয়। ওপরে দুটো ঘর, ছাদ, বারান্দায় একটু হাত-পা ছড়িয়ে থাকতে পারবে। নিচের ঘরগুলো তো আমাদেরই থাকছে। একটা মানুষের আর কটা ঘর লাগে! আর টাবুর কথা যদি বলিস ও-তো আসেই না। এলেও থাকে না। থাকতে চাইলে আমার ঘর আছে, লাবুর ঘর আছে। নিভাও চিরকাল এখানে পড়ে থাকবে না।

সীমা বলে, কথাটা শুধু ঘর থাকা না-থাকার নয়, মা। কথাটা হকের। মেজদার প্রাপ্য হক মেজদা পাবে কিনা।

এতক্ষণ চুপ থাকলেও এবার মুখ খোলে পূষণ।—আমার হক বা ঘরের জন্যে কারুর চিন্তা করার দরকার নেই। কেননা আমি এখানে থাকতে আসব না হয়তো। তোমরা যে যেমন খুশি ভাগাভাগি করে নিতে পার। তবে দাদা, দোতলার জন্যে আমার যে টাকা খরচ হয়েছে সেটা তুমি আমাকে দেবে। আর যেহেতু এ-বাড়ির ওপর আমি সব দাবি ছেড়ে দেব, সেজন্যে আমার কাছে কোনো কারণেই আর কখনো টাকা চাইবে না। হ্যাঁ, নিভার বিয়ের সময় যথাসাধ্য আমি দেব। ব্যাস। তার বেশি আর কিছু নয়। বৌদি প্রথম থেকে আমাকে অনেক ঠাট্টাবিদ্রূপ

শুনিয়েছে, একটু আগেও কি সব বললো, আমি গায়ে মাখিনি। তবে তাঁর জানা উচিত আমি যা হই, আমার যাই থাক—তা তাঁর স্বামী বা বাপের বাড়ির সাহায্যে নয়। তো, দাদা, আমার প্রস্তাবে যদি রাজী থাকো, কাগজ দাও এখনি সই করে দিচ্ছি।

পূষণ যে এমন অতিকায় বোমা ফাটাবে কেউ ভাবতে পারেনি। কেননা এই ধরনের কথা বলা ওর স্বভাবে নেই। অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ উঠলেই ও নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু গত কয়েকদিনের অভিজ্ঞতায় শিখেছে সমীরের বলা তিমি-তিমি খেলার মানে। বিশেষত দাদা-বৌদির কুটিল পাশাখেলা ওকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। স্ত্রৈণ মানুষ কি স্ত্রীর মতনই লোভী হয়?

পূষণ মাথা ঘুরিয়ে স্তব্ধ ঘরে সকলের মুখ পড়ার চেষ্টা করে। সমীরদার মুখে গোপন হাসি। সীমা উৎসুক চোখে দাদাকে দেখছে। মার চোখ ভাষাহীন। বৌদির মুখ লাল। লাবু নিভার মাথা নিচু। দিদি কি বলবে ভাবছে। দাদা বৌদির দিকে তাকিয়ে প্রম্‌ট্ শোনার অপেক্ষায়।

নিস্তব্ধতা ভেঙে প্রতিমা বললেন, টাবু, এসব তুই কি বললি! এগুলো বলা তোর আদৌ উচিত হয়নি। তোকে মানায় না এসব।

—দিদি, পূষণ বলে, আমি কি অন্যায় বলেছি? তোমরা সবাই জানো দোতলা হয়েছে আমার টাকায়, দাদা সেটা চায়—ওকি মাগনা চায়? তাহলে ভিক্ষে চাক আমার কাছে। কাগজকলম সইসাবুদের কথা বলছে কেন, আর মা-ও যখন বলছেন আমি বাড়িতে আসি না, থাকি না, আমার যখন কিছুরই দরকার নেই, তবে আমার কাছে টাকা চাইবে কেন! বাবার কাজের জন্যে দাদা কত দিয়েছে? তখন তো আমার সামান্য চাকরি বলে গলা শুকোলো, দোতলার ঘরদুটির জন্যে তো একেবারে বজ্রনিনাদ। বৌদিকে জিজ্ঞেস করো বড়সাহেব টাকা না দিলে সারা মাস ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে পারবে কিনা।

—মেজদা!—নিভা আর্তস্বরে বলে ওঠে।

লাবু চেঁচিয়ে ওঠে, মেজদা তুমি ভীষণ বাড়াবাড়ি করছ। তুমি কি মনে কর তোমার টাকা ছাড়া আমাদের চলবে না?

রেগে যায় পূষণ—লাবু, আমাকে চোখ রাঙাস নে। কতটাকা দিস সংসারে? কার টাকায় ফুটানি মারিস জানিস না?

এই সময় সমীর ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। পূষণের হাত ধরে বলেন, মেজবাবু, শান্ত হও। এখন রাগারাগির সময় নয়। সবাই জানে এ-বাড়ির যা-কিছু তোমারই

জন্যে। তুমি না করলে কে করবে! তবে নিজের কথা কি ওভাবে বলতে হয়।

—কোনোদিন কিছু বলি না সমীরদা। কিন্তু মা আর বৌদি যা বললেন, আর দাদার এই ভাগ-বাঁটোয়ারা—সিম্পলি মেড মি সিক! এখনো বাড়িতে বাবার নিশ্বাস লেগে রয়েছে, এখনো আমাদের গলায় চাবি—আর দাদা কাগজ নিয়ে এসেছে ভাইবোনদের সই নিয়ে বাড়ির দখল নিতে। তুমি আমার রাগটা দেখলে, এদের নির্লজ্জতাটা দেখলে না!

সমীর ওকে ধরে ওপরে নিয়ে আসে। একটু পরে পূষণ শান্ত হলে বলে, মেজবাবু, তোমাকে আমি সাবধান করেছিলাম। তবে হাজার হোক জামাই তো, বাইরের লোক, খুব স্পষ্ট করে তোমাকে বলতে পারিনি। কিন্তু মেজবাবু, তুমি যে এভাবে ছুরি চালাবে তা মাইরি আমার মাথায় ছিল না।

হালকা স্বরে যা বলেছিলেন সমীর তা যে এক অমোঘ সত্য, পরদিনই বোঝে পূষণ। তার ক্রুদ্ধ কথার ছুরিতে রক্তাক্ত প্রতিটি সম্পর্ক। অমন যে গুণমুগ্ধ চিরসমর্থক সীমা, সে-ও বললো, মেজদার এটা উচিত হয়নি।

প্রতিমা বললেন, টাবু, তোকে নিয়ে আমরা গর্ব করতাম। আর তুই কিনা —ছিঃ!

এসব ভাবতে ভাবতে একলা পূষণের চোখ ভিজে ওঠে। গলার কাছে দলা পাকায় যন্ত্রণা। একজনও কেউ ওকে বুঝতে চাইল না। কেউ ভাবল না ও-ও একটা মানুষ, নিরন্তর যুদ্ধরত মানুষ, নিছক টাকা জোগানোর যন্ত্র নয়! নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কিভাবে যে সম্পর্কগুলো ছিঁড়ে গেল, তা বুঝতে হলো অনেক মূল্য দিয়ে। আপসোস হয়, কেন যে কথাগুলো বলেছিল।

সব সত্যিকথা কখনো বলতে নেই।

৭

আজ কাজের চাপ কম। নিজের ঘরে বসে ফাইল পড়ছিল পূষণ। গ্লোবাল প্রজেক্টের ফাইল। এ-ফাইল নিজের বানানো। তথ্য অনেকখানি জুগিয়ে দিয়েছে জিজি। কিছু জুগিয়েছে মার্গারেট। বাকিটা পূষণ নিজেই সংগ্রহ করেছে নানা সূত্রে। মিস চাওলাও সাহায্য করেছেন—না-জেনে। পূষণের ধারণা ফাইল মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। মার্গারেটকে বলে রেখেছে যেন কেউ বিরক্ত না করে। কেননা হঠাৎ কেউ এসে ওর কাছে গ্লোবালের ফাইল দেখলে কৌতূহলী হবেই।

তাছাড়া ও একান্ত মনোযোগে ফাইলটা পড়তে চায়। যাতে বুঝতে বা ধরতে পারে হেগড়েরা কোথায় ভুল করেছে। ওদের ভুলটা জানতে পারলে নিজের পরিকল্পনার ছক-কাটা সহজ হবে।

ফাইলটা প্রায় শেষে হয়ে এসেছে। এই সময় ইন্টারকমে মার্গারেট।

—স্যার, মিঃ মায়ার অব গ্লোবাল এন্টারপ্রাইজের সেক্রেটারি লাইনে আছেন।

—কি চান?

—মিঃ মায়ার আপনাকে লাঞ্চে ডাকছেন তাঁর অফিসে।

—লাঞ্চ? তাঁর অফিসে?

—হ্যাঁ, স্যার।

—ও কে, কনফার্ম ইট। আমি ঠিক একটায় পৌঁছে যাব।

মিঃ মায়ারের সঙ্গে হঠাৎই আলাপ হয়ে গেল দিন সাতেক আগে একটা সেমিনারে। পূষণ সেখানে 'অটোমেশন ইণ্ডাস্ট্রিজ অব থার্ড ওর্য়ার্ল্ড'র ওপর বক্তব্য রেখেছিল। ওর বক্তৃতা শুনে মিঃ মায়ার নিজে এসে আলাপ করেছিলেন। ও ইস্টার্ন ইণ্ডাস্ট্রিজে আছে শুনে বলেছিলেন, ইস্টার্নের অনেককেই তিনি চেনেন, কিন্তু আশ্চর্য—পূষণের নামই শোনেননি।

পূষণ জানায়, আমি যে আপনাদের লাইনের লোক নই। প্রজেক্টের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। আমি তো বাজার-সরকার—মার্কেটিং করি।

—তাহলে অটোমেশন, কমপিউটার নিয়ে এতসব জানলে কি করে?

—ঘটনাচক্রে। আমাদের কোম্পানিতে অটোমেশনের প্রাথমিক পর্যায়ে নানা গোলমাল হয়, সে সময় বাড়তি দায়িত্ব হিসেবে ও-কাজটাও আমার ঘাড়ে চাপে। সেজন্যেই বাধ্য হয়ে শিখতে হয়েছে।

মিঃ মায়ারের ষাটের ওপরে বয়েস। মাথার চুল দুধসাদা। নরম গলায় কৌতুকের সঙ্গে কথা বলেন। গল্‌ফ্, খেলোয়াড়ের ঋজু শরীর। না জানলে বোঝার উপায় নেই এই মানুষটিই গ্লোবাল এন্টারপ্রাইজের কর্ণধার—ভ্রূ-ভঙ্গিতে লেনদেন হয় কোটি-কোটি টাকার।

তিনি হঠাৎ পূষণকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেছেন কেন? পদমর্যাদায় ও তাঁর কাছে পৌঁছতেও পারে না। ওদের সঙ্গে ওর কোনো পেশাগত যোগাযোগও নেই। সেদিনের কথা বলা ছিল সৌজন্য। কিন্তু লাঞ্চে ডাকা! এ ধরনের মানুষ যে কোনো লোককে লাঞ্চে ডাকেন না। কেননা লাঞ্চটাও ব্যবসায়িক লাঞ্চ। যার প্রতি মুহূর্তের মূল্য লক্ষ টাকার বেশি, তিনি ওর মতন সাধারণ

মানুষের সঙ্গে ফালতু একঘণ্টা সময় নষ্ট করবেন তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু কারণটা কি হতে পারে? এখনো পর্যন্ত ও প্রজেক্ট নিয়ে কিছু করেনি। কেবল তথ্য সংগ্রহ করে বিচার বিশ্লেষণ করছে। গ্লোবালের কারুর সঙ্গেই কথা বলেনি। এমনকি নিজের এম. ডি.-কেও কিছু বলেনি। পূষণ জানে হেগড়ে-কুমার এখনো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে?

মাথাভর্তি প্রশ্ন নিয়ে পূষণ ঠিক সময়ে মিঃ মায়ারের অফিসে পৌঁছে যায়। ওর সেক্রেটারি সঙ্গে করে ওকে ভেতরে নিয়ে যেতেই উঠে আসেন মিঃ মায়ার। হাত বাড়িয়ে বলেন—ওয়েলকাম ইয়ংম্যান। আমি দুঃখিত এত অল্প নোটিশে তোমাকে ডেকেছি কিন্তু অত্যন্ত খুশি যে তুমি আমাকে নিরাশ করোনি।

বিনীত পূষণ বলে, সৌভাগ্য আমারই। যদিও জানি না এতটা সম্মানের আমি যোগ্য কিনা।

স্নেহময় হাসেন মিঃ মায়ার—ইয়ংম্যান, অত বিনয়ী হওয়ার দরকার নেই। তুমি তো প্রফেশনাল—প্রফেশনালরা নিশ্চয় ভদ্র হবে এবং একটু অ্যাগ্রেসিভ হওয়া ভালো। সেদিন তোমার বক্তৃতা ভালো লেগেছিল, কেননা তোমার কথায় জোর ছিল। তোমার আইডিয়াগুলোও আমার পছন্দ হয়েছে। সেজন্যেই ভাবলাম তোমার সঙ্গে আরো যদি কথা বলি, পারস্পরিক কিছু লাভ হলেও হতে পারে।

যা তিনি বললেন না, তা হলো, সেদিনের পর তিনি পূষণ সম্পর্কে যথেষ্ট খোঁজ-খবর করেছেন। পূষণের পেশাগত জীবন সম্পর্কে সব তথ্যই তাঁর জানা হয়ে গেছে। জেনে আগ্রহী হয়েছেন বলেই আজ ওকে এখানে ডাকা।

বেয়ারা এসে জানালো, টেবিল তৈরি।

মিঃ মায়ার বললেন, চলো, পাশের ঘরে যাই। দেখা যাক তোমাকে আপ্যায়নের কি ব্যবস্থা হয়েছে।

পুরো কার্পেটে মোড়া এই দীর্ঘ ঠাণ্ডা ঘর পেরিয়ে যেতে যেতে পূষণের মনে হয় যেন শৈশবের স্বপ্নের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে—বাবার পাশাপাশি। এই আশ্চর্য পরিবেশে হঠাৎ বাবাকে কেন মনে পড়ল ও জানে না। কেন শ্রাদ্ধক্রিয়ার দু' সপ্তাহ পর এভাবে বাবার স্মৃতি মগজে ঢেউ ভাঙবে তার কোনো ব্যাখ্যা ও জানে না। মানুষের মনের কথা কেই-বা জানে! কখন যে কী মনে পড়ে!

পাশের ঘরে ঢুকে চমকে ওঠে পূষণ। এমন চমক যা ওর সারা অস্তিত্বে আলোড়ন তোলে। ও কোনদিকে তাকাবে ভেবে পায় না। এত সুন্দর

অভিজাত সাজের ডাইনিং রুম কোনো পাঁচ তারা হোটেলেও দেখেনি। বাতানুকুল ঘরে ফুলের সুঘ্রাণ। টেবিলে বাহারী ফুলের সজ্জন সমাবেশ। সব এতো পরিপাটি যে দীর্ঘক্ষণ তাকাতেও ভয় হয়। যেন চোখের দৃষ্টিতেই ভেঙে পড়বে শানিত আয়োজন, কিংবা মলিন হবে তার প্রখর সৌন্দর্য।

ঘরের মধ্যিখানে খাবার টেবিলের ধার ঘেঁষে যে স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে আছে, তাঁর মুখে চোখ ফেলতেই দৃষ্টি পিছলে যায়। সৌন্দর্যের জন্যে নয়, রূপ-ঢাকা এক ভিন্নতর বিভার জন্যে। একটু খুঁটিয়ে দেখলে একে রূপসী বলা যাবে না। রং খুব ফর্সা নয়, নাক নয় তীক্ষ্ণ, ওষ্ঠ ঈষৎ ভারী। ছিপছিপে লম্বা, আধখানা পিঠ ঢাকা চুল। পিংক রঙের শাড়ি ব্লাউজে পরীর মতন দেখায়। সারা শরীরে সেই বন্ধুরতা যার টানে নিরুপায় ঢেউয়ের মতন ভেঙে বিচূর্ণ হয় পুরুষ।

রুদ্ধবাক পূষণকে চেতনায় ফিরিয়ে আনে মিঃ মায়ারের উচ্চারণ—মিট মাই এক্সিকিউটিভ অ্যাসিসটেন্ট মিস অপরা দাশগুপ্ত। অপরা, দিস ইজ পূশ—পূষণ মিত্র।

পূষণ হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গি করতে যাবার আগেই অপরা মর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দেয়—গ্ল্যাড টু মিট য়ু। মিঃ মায়ার তো ক'দিন ধরে কেবল আপনার কথাই বলছেন।

ওর হাত ধরে সৌজন্যমূলক কী উচ্চারণ করে পূষণ ঠিক নিজেও জানে না। হাতের মধ্যে মাখন—উষ্ণতার রোমাঞ্চ। স্পষ্ট উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বরের মাধুর্য ব্যক্তিত্ব চিনিয়ে দেয়। জিজি ওর সম্পর্কে খুব কমই বলেছে।

মিঃ মায়ার বললেন, জাস্ট থ্রি অব আস। এসো, বসা যাক। ড্রিঙ্কস কি নেবে? দ্বিধা করো না, লজ্জা পেয়ো না ইয়ংম্যান। মনে করো তুমি আমার সঙ্গে ক্লাবে এসেছ। বলো কি খাবে?

ঠোঁটের ওপর এক চিলতে হারানো হাসি বুকের ভেতর থেকে তুলে এনে পূষণ বলে—বিয়ার।

নাভিমূল পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। নিজেকে সাব্যস্ত করার জন্যে এক বোতল বিয়ার দু' ঢোকে গিলে ফেলা দরকার। এখানে হয়তো তা করা যাবে না। তবু গলা তো ভেজানো দরকার।

বোতল নয়, বেয়ারা ক্যান খুলে বিয়ার জাগ ভরে ওর সামনে রাখে। মিঃ মায়ার নিলেন জিন-টনিক। অপরা আপেলজুস।

টেবিলের মাথায় বসেছেন মিঃ মায়ার। তাঁর ডান দিকে পূষণ বাঁ দিকে অপরা।

মিঃ মায়ার অপরার গুণাবলীর ফিরিস্তি দিয়ে প্রচুর প্রশস্তি করলেন—আমি তো এখন ওল্ড ফসিল, অপরাই দেখছে সব। তোমাকে যা বলব তা-ও ওর জানা থাকা ভালো, সেজন্যেই ওকে ডেকেছি। সিদ্ধান্ত যাই হোক না, সেগুলো প্রয়োগ তো ওকেই করতে হবে।

দু' চুমুক দেবার পরই পূষণ আত্মস্থ বোধ করে। চৌখস শেয়ানা হিসেবি মানুষটার ঠোঁটে শব্দহীন প্লাষ্টিক হাসি চোখের উজ্জলতার সঙ্গে তাল রেখে দুলতে থাকে। মাঝেমাঝেই দৃষ্টি অপরার খোলা বাহু ছুঁয়ে উদ্ধত বুকে আছড়ে পড়ে সরে যায়। দৃষ্টির লোভ সারল্যের আবরণে লুকানো।

একটু ভূমিকা করে মিঃ মায়ার জানালেন, পূষণকে ডাকার আগে অনেক ভাবতে হয়েছে। কেননা ওদের সঙ্গে গ্লোবালের সম্পর্ক সম্প্রতি ভালো যাচ্ছে না। যদিও বরদাচারি তাঁর পুরানো বন্ধু। কিন্তু তিনি, যে-কোনো সফল মানুষের মতনই, বন্ধুত্বকে পেশার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন না। ব্যবসা ও বন্ধুত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। যদিও পূষণ প্রজেক্টের লোক নয় এবং সে অর্থে গ্লোবালের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ বা লেনদেন নেই, তবু কোম্পানি তো একই। তিনি আশা করেন পূষণ প্রজেক্ট নিয়ে কোনো কথা তুলবে না।

পূষণ জানায়, ও জানেই না প্রজেক্ট নিয়ে গোলমালটা কোথায়। শুধু শুনেছে কোথাও সমস্যা আছে ওটা নিয়ে। বিশদ ও কিছুই জানে না। তাছাড়া ওটা নিয়ে কথা বলার কোনোরকম অধিকারই ওর নেই। বরদাচারি ওকে কিছু বলেননি। ওর কোনো দায়িত্বও নেই। হয়তো ভাবে, বাজার সরকার টেকনিক্যাল ব্যাপার কি বুঝবে। যদিও আজকের দিনে—নলেজ ইকনমির যুগে—এসব যুক্তি অচল। সবাই সব কিছু করতে পারে বলে পূষণ মনে করে। ম্যানেজমেণ্ট বাই নলেজ ট্রেনিং অ্যাণ্ড প্র্যাকটিস।

দ্বিতীয় দফা ড্রিঙ্ক নিয়ে মিঃ মায়ার বললেন, আমি শুনেছি অটোমেশনের সময় তোমাদের কোম্পানিতে কোনো বড় আন্দোলন হয়নি। শান্তিপূর্ণভাবেই তোমরা তা চালু করতে পেরেছ। বরদা তোমাকেই সেজন্য কৃতিত্বের স্বীকৃতি দেয়। আমাদের এখানে আমরা প্রচণ্ড ব্যাপক বাধা পাচ্ছি। তোমাদের চেয়ে ভালো আর্থিক সুযোগ সুবিধে দিয়েও আমরা মানাতে পারছি না। অফিসিয়ালি নয়, আমি কৌতূহলী বুড়ো হিসেবে জানতে চাইছি, হোয়াট ওয়াজ ইওর ম্যাজিক!

এবার মৃদু শব্দ করে হেসে ওঠে পূষণ। অপরা লক্ষ্য করে পূষণ হাসে কম, কিন্তু যখন হাসে সারাশিতে সারাশিতে মুখর বার্তা বিনিময় ঘটে।

পূষণ বলে, সেই অর্থে কোনো ম্যাজিক নেই স্যার, আসল কথা হলো সমস্যাটা সঠিক বোঝা। একটা কথা বলি, জ্বরের ওষুধ আছে, কাঁপুনির কোনো ওষুধ নেই। আর কাঁপুনি হলেই যেমন জ্বর হয় না তেমনি কাঁপুনি ছাড়াও জ্বর হয়। আমরা অনেক সময়েই এটা মনে রাখি না। ওয়ার্কারদের আন্দোলন বেশি ভাগ জ্বরছাড়া কাঁপুনি। তার তো ওষুধ নেই। পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা থাকলে সহজেই মিটে যায়। আমি ইউনিয়নের নেতাদের ডেকে বুঝিয়েছিলাম কেন অটোমেশন দরকার এবং ওদের ভয় যে ছাঁটাই হবে, কাজ কমবে ইত্যাদি তা অমূলক। একজনও ছাঁটাই হবে না আমার এই আশ্বাস ওরা বিশ্বাস করেছিল। আমিও ওদের বিশ্বাস নষ্ট হবার মতন কাজ করিনি, ম্যানেজমেণ্টকেও করতে দিইনি। আপনিও যদি ধাপ্পা না দেন, ওদের সত্যি কথা বলেন, এবং যা কথা দেবেন তা ঠিক রাখেন—আমার মনে হয় না কোনো সমস্যা হবে।

অপরা বলে, কিন্তু মিঃ মিত্র, সব কথা কী করে ওদের আগাম বলা যাবে? অনেক সেকশন ইউনিট বন্ধ হবে, লোন সারপ্লাস হবে—এসব বললে ওরা মানবে?

—কেন মানবে না! আমি বলেছিলাম কি কি ম্যানুয়াল কাজ বন্ধ হবে, কোন্ কোন্ সেকশন উঠে যাবে। সারপ্লাস লোকেদের কোথায় নিয়োগ করবো—সবই বলেছি। করেওছি।

অপরা বলে, সব লোকেদের কিভাবে নিয়োগ করা যাবে! ওরা তো নতুন টেকনিক, মেশিন, পদ্ধতি কিছুই জানে না।

—সেজন্যেই তো বলেছি ম্যানেজমেণ্ট বাই নলেজ, ট্রেনিং অ্যাণ্ড প্র্যাকটিস। ওদের ট্রেনিং দিন, ইনসেনটিভ দিন। বাড়িতে যেমন গৃহিনীরা নতুন গ্যাজেটের মোহে তৎপর হয়ে ওঠে, ওয়ার্কারদের মধ্যেও সেই মোহটা জাগাতে হবে। প্রাথমিক বাধা—যা মূলত মানসিক, আপনি জানেন—পেরুলে দেখবেন ওরাই নতুন মেশিন পদ্ধতির মোহে নয়, প্রেমে পড়ে যাবে।

বেয়ারাকে খাবার দিতে বলে মিঃ মায়ার বললেন, অপরা, তুমি মিত্রর সঙ্গে এ-পয়েণ্টটা নিয়ে আরো বিশদ আলোচনা করো। আমি মনে করি ও যা বলছে ঠিকই বলছে। ও তো প্রমাণ করেছে এভাবে কাজ হয়।

খাবারের আয়োজন দেখে পূষণ একেবারে ত-থ-দ। চপ, ফিশফ্রাই, মিটবল, তন্দুরি চিকেন, ফ্রায়েড রাইস, পরটা, রুটি, ডাল, সবজি। যেন মেনু কার্ডের সব পদের প্রদর্শনী।

বললো, মাপ করবেন আমি এত খেতে পারব না। ফিশফ্রাই নিয়েছি। আর একটু ফ্রায়েড রাইস আর চিকেন হলেই চলবে।

অপরা বললো, সেকি! আর কিছু খাবেন না? আপনি সব সময় এত কম খান?

—এই কিছু কম হলো নাকি! লাঞ্চের সঙ্গে আমার ডিনারও হয়ে যাচ্ছে।

—যাঃ!—অবিশ্বাসী মন্তব্য অপরার!

খেতে খেতে মিঃ মায়ার বললেন, একটা প্রশ্ন করছি তোমাকে—হয়তো একটু ব্যক্তিগত ব্যাপারেই—তবু আমার জানা দরকার, তুমি কি বদলের—আই মিন কোম্পানি বদলের কথা ভাবছো?

এ-প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিল না পূষণ। ঈষৎ বিব্রত ভাবে বললো, না—সেরকম কিছু তো ভাবিনি, মানে ভাবছি না।

—তোমার রেকর্ড বলছে তুমি ইতিমধ্যেই ছ'বার চাকরি বদলেছে। অবশ্যই প্রতিবারেই ফর বেটার জব। সেজন্যেই জিজ্ঞেস করলাম। কখনো যদি ভাবো আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো।

—অনেক ধন্যবাদ। তবে এখন সেরকম কিছু ভাবছি না। ইস্টার্নে বেশ ভালোই আছি।

অপরা বললো, মিঃ মায়ার হয়তো আপনার জন্য আরো ভালো কিছুর কথা ভাবছেন।

পূষণ হেসে ওঠে—মিস দাশগুপ্ত, আরো ভালোর কি কোনো শেষ আছে! তাছাড়া আমার প্রয়োজন খুবই কম। টাকার চেয়েও আমার কাছে জরুরী—কাজে আনন্দ পাওয়া। ইস্টার্নে তা পাচ্ছি এখনো। তবে আমি আশা করি, মিঃ মায়ার আমার ওপর রাগ করবেন না।

—নো, ইয়ংম্যান, নো। নট অ্যাট অল। বরং আমি তোমার সততা ও আনুগত্যের প্রশংসা করি।

—ধন্যবাদ, স্যার।

খাওয়া শেষ হলে নিজের চেম্বারে ফিরে মিঃ মায়ার বললেন, ইয়ংম্যান, তোমার যদি অসুবিধে না থাকে তবে অপরার সঙ্গে একটু বসো। অটোমেশন নিয়ে ওর আরো কিছু জানার থাকতে পারে। তোমার অভিজ্ঞতা যা তাই বলবে। অপরা, তুমি কাল আমাকে বিশদ নোট দেবে। শীঘ্রই কাজ শুরু করতে হবে আমাদের।

পূষণকে বললেন, আবার এসো, ইয়ংম্যান। সন্ধেবেলায় আমি ক্লাবে থাকি। এলে দেখা কোরো। থ্যাঙ্কস এগেইন ফর কামিং।

মায়ারের ঘরের ঠিক উল্টোদিকে অপরার ঘর। সুন্দর সাজানো। দু'কোণে ফুলের টব। ঘরের মধ্যে মেয়েলি সৌরভ। দেয়ালে গ্রাফ-পেপারে গ্লোবালের নানা অফিস-ফ্যাকট্রির চিহ্ন, ব্যবসার পরিসংখ্যান। টেবিলের বাঁদিকে মোটা আর্ট ফাইল। ওপরে লেখা—জি. পি.-ফোর। গ্লোবাল প্রজেক্টের ক্রমিক কোড নম্বর। যা পূষণ ইতিমধ্যেই জেনেছে। ফাইলটা দেখেই বুকের রক্তে ছলাৎ শব্দ হয়। ফাইলটা একেবার হাতে পেলেই ও রহস্য সমাধান করতে পারে। কিন্তু কিভাবে পাওয়া যাবে?

ঘোরানো চেয়ারে বসে অপরা বললো, কি খাবেন—চা না কফি?

মাথা নাড়ে পূষণ—কিছু না। বলুন, আর কি জানতে চান।

—আপনি যা বলেছেন তাতে আমি এখনো খুব নিশ্চিত নই যে ওরা আমাদের কথা মেনে নেবে। আসলে আপনার কথা শোনার পর থেকেই মিঃ মায়ার আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন টু ফলো ইওর লাইন অব অ্যাকশন। না পেরে বললেন, আমার কথা মানছো না, তুমি মানুষটির নিজের মুখ থেকেই শোন। সেজন্যই আজ আপনাকে ডেকেছেন। আপনি আসায় আপনার সহৃদয়তার প্রমাণ পাওয়া গেল। আমরাও কিছু জানলাম। দেখি তা প্রয়োগ করা যায় কিনা। যদি সফল হই আপনাকে ডিনার খাওয়াবো।

শব্দ করে হাসে পূষণ। অপরার আবার মনে হয়, সার্শিতে সার্শিতে বাক্য বিনিময় হলো।

—ডিনার খাওয়াতে হবে না, তবু আপনি সফল হোন। এমন একজন এক্সিকিউটিভকে খুঁজে বের করুন যার কথার ওপর ওয়ার্কারদের আস্থা ও বিশ্বাস আছে। দেখবেন কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে। আর, সবাইকে ট্রেনিংয়ে পাঠান। বিশেষত যে সব সেকশন/ইউনিট উঠে যাবে সেসব লোকেদের। অনেকেই হয়তো শিখতে পারবে না। ফিরে এসে তারা নিজেরাই বিকল্প ব্যবস্থা চাইবে। যারা সফল হয়ে আসবে, দেখবেন দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করবে। ট্রাই ইট। আই উইশ য়ু গুড লাক্।

কথা বলতে বলতে সময়ের খেয়াল থাকে না। পূষণ টের পায় বুকের মধ্যে প্রসন্ন রৌদ্রের আহ্লাদ থৈ থৈ করছে। ইচ্ছে করে সারাদিন এই মহিলাটির সঙ্গে কথা হোক, এর উপস্থিতি ঘিরে থাকে ওকে। এখন একেকবার সাহসী হয়ে

চোখ রাখে অপরার তীক্ষ্ণ বুকের ওপর। ওখানে কি কোনদিন মুখ রাখবে না পূষণ? রক্তে মায়াময় জলপ্রপাতের শব্দ।

বুক থেকে চোখ যায় জি. জি.-ফোর ফাইলের ওপর। বুক ও ফাইল দুই-ই তার আয়ত্তের সমদূরত্বে। দুই-ই ওর চাই। বুক না হলেও ফাইল।

সাহস করে বললো, ইচ্ছে না হলে বা অসুবিধে থাকলে উত্তর দেবেন না, নিছক অ্যাকাডেমিক কৌতূহলে জানতে চাইছি, আপনাদের প্রজেক্টে ইস্টার্নের সঙ্গে বিরোধটা কোথায়? হেগড়ে, কুমার যতদূর জানি বেশ ভালো লোক, কম্পিটেন্ট। সেজন্যেই অবাক লাগছে।

একটু গম্ভীর হয়ে অপরা বলে, সিক্রেটস্ বলতে পারব না। তবে ওরা যে ড্রইং স্পেসিফিকেশন দিয়েছেন তা আমাদের স্ট্যাণ্ডার্ডের সঙ্গে মিলছে না। খরচও বেশি ধরছেন। এ বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না, প্লিজ।

—ঠিক আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আর কিছু জিজ্ঞেস করব না। এখন উঠি। আপনার সঙ্গে আবার দেখা হতে পারে কি?

—হ্যাঁ, কেন নয়। চলে আসবেন। ইন ফ্যাক্ট আমারই হয়ত আপনাকে দরকার হবে। আবার অ্যাডভাইস চাইলে দেবেন তো?

কার যে কাকে দরকার হয় কে জানে! পূষণ বললো, চেয়ে দেখুন।

চেম্বার ছেড়ে পূষণ বেরিয়ে যাবার পর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে অপরা। নিজেকে বোঝার চেষ্টা করে। বারবার চোখ পড়ে পূষণের বসা চেয়ারের ওপর। খালি চেয়ারের ওপর কল্পিত ছায়া। ওর হাসির শব্দ মনে পড়ে। কী যে আছে ঐ হাসির শব্দে! যেন সাদা বকের ডানা ঝাড়া। বুকের ওপরে ওর চোখের আনাগোনা লক্ষ্য করে মজা লেগেছে। ভদ্রলোক কি লোভী? ব্যবহারে তো মনে হলো না। আচ্ছা, সিগারেট খায় না কেন? তাহলে এখনো ঘরে গন্ধ থাকত। অ্যাসট্রেতে থাকত পোড়া টুকরো। মুচকি হেসে অপরা নিজেকেই বললো, মিস অপরা, য়ু আর ফিনিশড! গড সেভ য়ু!

৮

ঘরে মৃদু আলো জালিয়ে শুয়ে শুয়ে ক্যাসেটে রবীন্দ্রসংগীত শুনছে পূষণ। এখন এটাই তার রোজকার হবি। অজস্র ক্যাসেট কিনে এনেছে—সব নামী গায়ক-গায়িকার। মাঝে-মাঝে গীতবিতান উল্টে পছন্দের লাইন মুখস্থ করে। গুনগুন করে সুর ভাঁজার চেষ্টা করে। বেশ লাগে। কতকাল এসব গান শোনেনি।

একেকটা গান শুনে অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে। নিজের ভেতরে জেগে ওঠে নতুন অঙ্গীকার। নিজেই নিজেকে বলে, যোগ্য হও, যোগ্য হয়ে ওঠো।

এতকাল ওর একটা মাত্র অবসেশন ছিল, দৌড়—আরো গতি—আরো সফলতা—আরো সিঁড়ি পেরিয়ে যাওয়া। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অপরা-মগ্নতা। সারা অনুভবই এখন অপরা-বোধে আচ্ছন্ন। অবশেষে ও তার আকাঙ্ক্ষিত জীবনেশ্বরীকে খুঁজে পেয়েছে। যেন ওরই জন্যে এতকাল অপেক্ষায় ছিল। অন্য নারীদের ভিড়ে খুঁজে বেড়িয়েছিল এই অনন্যাকে। এই বোধের নামই কি প্রেম? পূষণ জানে না। শুধু জানে, অপরা-বিহীন জীবন অসহ নয়, অসম্ভব। কিন্তু এখনো জানে না কিভাবে পৌঁছবে সেই লক্ষ্যে!

সাহস করে ফোন করতে পারেনি, যদি ভুল বোঝে! অফিসেও যেতে পারেনি, যদি অনাহুত বলে তিরস্কৃত হয়! অপরা বা মিঃ মায়ারও আর ডাকেনি।

অথচ অফিসে গ্লোবাল প্রজেক্ট নিয়ে টেনশন বেড়ে উঠছে। অপরার কথানুযায়ী হেগড়ে-প্রকাশের ড্রইং স্পেসিফিকেশন, এষ্টিমেট দেখেছে পূষণ। কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। গ্লোবালের স্ট্যাণ্ডার্ড না জানলে ফারাকটা ধরাও যাবে না। তা পাওয়া যেতে পারে অপরার ফাইলে। সেটা কিভাবে পাবে?

রবীন্দ্রসংগীতের সুর ছিঁড়ে টেলিফোন বাজল। টেপরেকর্ডার বন্ধ করে রিসিভার তোলে পূষণ।

—হ্যালো

—গুড ইভনিং। অপরা বলছি। কেমন আছেন?

—ভালো। আপনার খবর বলুন, কেমন চলছে?

—হঠাৎ ফোন করে বিরক্ত করছি না তো? কি করছিলেন?

—না, না। মোটেই বিরক্ত করছেন না। বরং ভালো লাগছে। যা করছিলাম তা বললে তো বিশ্বাস করবেন না।

—তাই নাকি? তবু বলুন।

—আপনার কথা ভাবছিলাম।

—সত্যি? মিথ্যে হলেও শুনতে ভালো লাগছে।

—বিশ্বাস করুন, সত্যি বলছি। ভাবছিলাম, আর তো যোগাযোগ করলেন না। আপনাদের সমস্যা মিটলো কিনা।

—হ্যাঁ, সেজন্যেই ফোন করছি। অফিসে একেবারে সময় পাইনি। আপনার

প্রেসক্রিপশানে খুব কাজ দিয়েছে। আমাদের প্রাথমিক প্রস্তাব ইউনিয়ন মেনে নিয়েছে।

—গুড। শুনে খুশি হলাম।

—মিঃ মায়ার আমাকে বলেছেন আপনাকে যেন ফোন করে ধন্যবাদ জানাই।

—ওঁকেই আমার ধন্যবাদ জানাবেন।

—আচ্ছা। রাখি তাহলে—

—মিস দাশগুপ্ত, কাল কি একবার দেখা হতে পারে আপনার সঙ্গে?

—হ্যাঁ, চলে আসুন অফিসে। চারটে নাগাদ। অসুবিধে হবে না তো?

—অসুবিধে কিসের! আমি চারটের সময়ই যাব।

দু'জনেই শুভরাত্রি জানিয়ে টেলিফোন রাখে। পূষণের মনে হয় ঘরে যেন এক হাজার চাঁদ উঠেছে। বুকের মধ্যে মৃদঙ্গধ্বনি। কালকের চারটে আসতে এত দেরি!

রক্তের উচ্ছ্বাস ও মনের চঞ্চলতার মধ্যে সমন্বয় আনার জন্যে আর কিছু ভেবে না-পেয়ে হুইস্কি নিয়ে বসার কথা ভাবতেই কলিং বেল বাজল। অস্থির বাজনা শুনেই বুঝল জিজি। ওর স্বভাবই বিরতিহীন বেল বাজানো।

বসার ঘরে ঢুকে জিজি বলল, কি করছিলে?

ও পরে আছে হলুদ শালোয়ার-কামিজ। বুকের ওপর নীল ওড়না।

পূষণ বললো, চাঁদের আলোয় নাচছিলাম।

চুলের ক্লিপ খুলতে খুলতে জিজি ভুরু কোঁচকায়—ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো!

—না, না। ভুল বলেছি। প্রেম করছিলাম।

—কার সঙ্গে?

—কেন নিজের—মানে, স্বপ্নের সঙ্গে।

—এই তোমার কি হয়েছে? আবোলতাবোল বকছ কেন?

—আবোলতাবোল? কই না তো। না, হ্যাঁ—ছেলেবেলায় পড়েছিলাম। ইয়ে, হুইস্কি খাবে?

—না।

—তাহলে আমি খাই?

উঠে দাঁড়িয়ে পূষণের হাত ধরে জিজি বললো, তুমিও খাবে না এখন। বসো চুপ করে।

সোফায় বসে নিরীহ স্বরে পূষণ বলে, হুইস্কি খাবো না! ঠিক আছে। তবে এসো চুমু খাই।

—তাও হবে না। আগে আমার কথার জবাব দাও।

দু'পা সামনের দিকে ছড়িয়ে দু'হাত মাথার পিছে সোফায় রেখে পূষণ বললো, কি কথা?

—তুমি অপরা দাশগুপ্তর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে?

—না। মিঃ মায়ার ডেকেছিলেন। তাঁর ঘরে মিস দাশগুপ্তর সঙ্গে দেখা হয়েছে। মিঃ মায়ারই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

—আমাকে বলোনি কেন? ভেবেছিলে আমি খবর পাব না? তুমি ওঁর ঘরে গিয়ে আড্ডা দাওনি?

—আড্ডা! হাত নামিয়ে সোজা হয়ে বসে পূষণ—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? মিস দাশগুপ্ত আড্ডা দেবার মহিলা! ওদের অটোমেশন নিয়ে প্রবলেম আছে—তাই নিয়ে কথা হয়েছে। তাও মিঃ মায়ারের অনুরোধে।

এতক্ষণে হাসি ফোটে জিজির মুখে। পূষণের দু'কাঁধ চেপে বলে, তাহলে তোমাকে সুখবরটা দিই। ওদের প্রবলেম মিটে গেছে। অপরার মুখে তোমার জয়জয়কার। আমাকে বললেন, পূষণ মিত্র ইজ আ মিরাক্যল ম্যান। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন চিনি কিনা তোমাকে। আমি বললাম, দেখেছি, আলাপ হয়নি। বললেন, গো অ্যাণ্ড মিট হিম। ফ্যানটাস্টিক মানুষ।··· আমার শুনে যে কী ভালো লাগল! নো বডি নোজ বেটার দ্যান মি হাউ ফ্যানটাস্টিক য়ু আর!

বলেই ওর ঠোঁটে গালে ঝড়ের গতিতে চুমু খায় জিজি।

নিজের ভেতরের হাসি ও উল্লাস গোপন রেখে পূষণ বললো, এবার হুইস্কি নিতে পারি?

নরম প্রশ্রয়ের হাসি সারা মুখে ছড়িয়ে জিজি বললো, নাও। আমার জন্যেও নেবে।

হুইস্কিতে কয়েক চুমুক দেবার পর জিজি ডাকে—সোনা!—এ-ডাক জিজির অতি নিজস্ব। ঘন আবেগের মুহূর্তেই কেবল বেরিয়ে আসে।

—বলো।

—একটা কথা বলছি সোনা। তুমি যাই করো, যত নারী সঙ্গই করো—আই ডোণ্ট মাইণ্ড—কিন্তু আমাকে ছেড়ে যেও না। ডোণ্ট ডিচ মি।

—হঠাৎ একথা বলছ কেন?

—বলছি, কারণ আমি তোমাকে জানি। আমি অপরার সঙ্গে কথা বলেছি, তোমারও মুখচোখের ভাষা পড়লাম। আমি জানি তুমি ওর জন্যে ছুটবে। নিজের দরকারেই ছুটবে। ছোটো—কিন্তু আমার কাছে ফিরে আসবে। বলো, আসবে? বলো সোনা!

এক ঢোকে গ্লাস শেষ করে উঠে গিয়ে আবার গ্লাস ভরে আনে পূষণ। চুমুক দিয়ে বলে, আমাদের আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিংয়ে এসব ছিল না। আমাদের সম্পর্কে কোনো পূর্বশর্ত ছিল না। কোনো শর্ত এখনো মানতে রাজী নই আমি।

জানে, জিজি জানে। সবই মনে আছে। প্রথম ঘনিষ্ট হবার সময়েই পূষণ বলেছিল, ভবিষ্যতের কোনো প্রতিশ্রুতি ও দিচ্ছে না। ভালোবাসবে, বিয়ে করবে—এমন অঙ্গীকার করতে পারবে না। যদি পরস্পরকে ভালো লাগে, যদি কখনো মনে হয় জীবনটা দু'জনে একসঙ্গে শেয়ার করে কাটাতে ভালো লাগবে, যদি ইচ্ছে হয় সন্তানের, তখনই কেবল বিয়ের কথা—পাকাপাকি সম্পর্কের কথা ভাবা যাবে। নইলে দু'জনেই মুক্ত। দু'জনেরই আসা-যাওয়ার পথ খোলা।

তিন বছর আগে এসব স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছিল জিজি। কেননা তখন সেও চায়নি বদ্ধ জীবন। চেয়েছিল দরজা থাক খোলা, আকাশ উন্মুক্ত। এখন পূষণকে ছাড়া জীবন ভাবতে পারে না জিজি। ও-ই জানে পূষণ কী ভীষণ একলা। বাবার মৃত্যুর পর থেকে কত যে বদলে গেছে পূষণ—তাও জিজির চেয়ে ভালো আর কে জানে! ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে এক গভীর মমতাবোধ ওর মধ্যে ফেনিয়ে ওঠে। একেকদিন রাতে ঘুমের মধ্যে অস্থিরভাবে এপাশ-ওপাশ করে, ডুকরে ওঠে পূষণ। কখনো ভয় পায়। তখন জিজি বুকে জড়িয়ে রেখে শিশুর মতন ঘুম পাড়ায় ওকে। তখন ওর মনে হয় এমন একটি অসহায়, কাতর, আর্ত মানুষকে স্নেহ মমতা ও আশ্বাসের নিশ্চিত আশ্রয় দেওয়ার চেয়ে মহত্তর কাজ জীবনে আর কিছু নেই!

নরম গলায় জিজি বলে, এমন করে বলে না সোনা। আমি তোমার ওপর কিচ্ছু চাপিয়ে দিচ্ছি না। আমার জন্যে তোমাকে কিছু করতেও বলছি না। আমি কখনো আমার সমস্যা নিয়ে তোমাকে বিব্রত করিনি। আমি শুধু বলছি, আমাকে ছেড়ে যেও না। আমাকে বিয়ে করতে না চাও কোরো না, আমার সঙ্গে থাকতে না-চাও থেকো না। কিন্তু আমার সঙ্গে বাঁচো, আমাকেও তোমার সঙ্গে বাঁচতে দাও। আমি তোমাকে ভালোবাসি, সোনা।

—আমি কিন্তু এ-ধরনের কোনো কথা তোমাকে বলিনি।

—জানি, সোনা। ভালোবাসার কথা তুমি বলোনি। ভালোবাসা কি

তুমি জানো না। এখন জানো না, একদিন জানবে। আমার কাছেই শিখবে না-হয় ভালোবাসা কাকে বলে। যদি শিখতে না-চাও, তাতেও ক্ষতি নেই। আসলে ভালোবাসা তো জীবনের কোনো কাজেই লাগে না। তবু মানুষ জীবন দিয়েও তার মূল্য দেয়। না-হয় সে-মূল্যটা আমিই দেব। তুমি কেবল আমাকে ছেড়ে যেও না।

কী ছিল জিজির কণ্ঠে? কথায়? পূষণের বুক টলটল করে। গলায় জমে বাষ্প। ও জিজির মাথায় হাত রেখে নিজের দিকে আকর্ষণ করে বলে, কি সব বলে যাচ্ছে তখন থেকে! তোমাকে ছেড়ে যাবার কথা উঠছে কেন? আমি তেমন কিছু বলেছি তোমাকে?

মাথা নাড়ে জিজি—না বলোনি। আমিও কোনোদিন তোমাকে বলিনি, রাখী মুখার্জি, ললনা বসুকে আমি চিনি।

নিজের মধ্যে আমূল কেঁপে উঠলেও নিজেকে সংহত রাখে পূষণ। কিন্তু মগজের মধ্যে ব্রেক-করা গাড়ির টায়ারের কর্কশ শব্দ। স্মৃতির দিগন্ত জুড়ে হুইসলের ছোটাছুটি। খুব আস্তে আস্তে হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে ঢোক গেলে।

তারপর বলে, ওদের চেন তো কি হয়েছে?

—কিছু না। এমনি বললাম।

পূষণের বুক থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসে জিজি বললো, দাও, আরেকটা হুইস্কি দাও। খেয়ে বাড়ি যাই।

উঠতে গিয়েও থেমে যায় পূষণ—বাড়ি যাবে! থাকবে না?

—নাঃ। তুমি তো কথা দিতে পারলে না, সোনা। তাই যাওয়াই ভালো।

ওকে জড়িয়ে ধরে পূষণ অনুনয় করে—না। আজ থেকে যাও। আজ যেও না, প্লিজ! আমার খুব খারাপ লাগবে, খুব কষ্ট হবে। আজ যেও না, প্লিজ, আজ থেকে যাও।

ওর কাতর চোখে চোখ রেখে জিজি মাথা ঝাঁকায়—আচ্ছা!

উঠে দাঁড়িয়ে জিজি বলে, ঘরে খাবার-দাবার আছে? না-কিছু বানিয়ে নেব?

পূষণ বললো, এখন কিছু বানাতে হবে না। চলো বাইরে থেকে খেয়ে আসি।

—আবার বাইরে যেতে হবে?

ওর গলার অনিচ্ছা ও ক্লান্তি পড়ে পূষণ বললো, তোমাকে যেতে হবে না। য়ু রিল্যাক্স। আমি নিয়ে আসছি, যাবো আর আসব।

রাত্রে উথালপাথাল-করা প্রবল ভালোবাসাবাসি সত্ত্বেও দু'জনেরই অনুভবে

ধরা পড়ে ওদের মাঝখানে ভিন্নতর ছায়াপাত ঘটেছে। জিজি স্পষ্টই বুঝতে পারে অন্যদিন যে শিখরে পৌঁছে সারা শরীরে ও মনে তেনজিং-উল্লাস খেলে বেড়াত, আজ তার অনেকটা নিচু থেকেই গড়িয়ে পড়েছে দু'জনে।

ঘুমন্ত পূষণের দিকে তাকিয়ে তবুও মায়া হয়। হাত বাড়িয়ে ওর কপালে মাথায় আঙুল বোলায়। খুব গভীর থেকে উঠে আসা একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে করতে পাশ ফেরে জিজি। ও-ই জানে, ভালোবাসা আসলেই এক নীল অভিমান।

পরদিন ঠিক চারটের সময় অপরার অফিসে পৌঁছলো পূষণ। অপরা ঘরে নেই। বেয়ারা বললো, মেমসাহেব এখনি আসবেন, আপনাকে বসতে বলে গেছেন।

অন্তর্গত দ্বিধা নিয়েও অপরার ঘরে ঢুকে চেয়ার টেনে বসলো পূষণ। টেবিলে যথারীতি প্রচুর কাগজ, ফাইল। ঘরের সাজসজ্জা আগের দিনের মতনই। অনুৎসুক চোখে সারা ঘরের ওপর দৃষ্টি বোলায়। সেদিন যেখানে জি জি-ফোর ফাইল দেখেছিল, সে জায়গাটা ফাঁকা। ফাইলটা নেই। একই সঙ্গে হতাশা ও নিশ্চিতি জেগে ওঠে। ফাইলটা থাকলে চুরি করে দেখার লোভ সামলাতে পারতো কিনা জানে না। নেই বলে কোনো দুঃসাহসিক কাজ করতে হলো না। বিবেক থাকলো অমলিন।

হঠাৎ চোখ পড়লো একটা প্লাস্টিক ফোল্ডারের ওপর। পূষণ হাতে নিয়ে দেখল শিরোনাম—ফ্যাক্টস ফর ম্যানেজমেণ্ট। পাতা উল্টেই চমকে ওঠে। প্রথমেই রয়েছে—জি জি-ফোর : আর্থিক বিশ্লেষণ। তাতে তিনটে কলমে ভাগ করা বিভিন্ন খাতে খরচের আনুমানিক হিসাব। এক কলমে গ্লোবালের অঙ্ক, একটাতে ইস্টার্নের আর অন্যটাতে সিলভার ব্লু-র অঙ্ক। পূষণ দ্রুত হাতে মোটা দাগের অঙ্কগুলো টুকে নেয়। কান থাকে সজাগ। বাইরে মৃদু শব্দ হতেই ও ফোল্ডারটা যথাস্থানে রেখে কাগজটা রাখে পকেটে।

তখনই দরজা খুলে ঢোকে অপরা।

—স্যরি, আপনাকে বসিয়ে রেখেছি। হঠাৎ একটা আলোচনায় বসতে হলো। অনেকক্ষণ এসেছেন?

—না, না। এইতো এলাম। ব্যস্ত হবেন না আপনি।

অপরা হাতের ফাইল টেবিলে রেখে বসে। ফাইলের ওপর পূষণের চোখ। সেই ফাইল—জি জি-ফোর।

—কি খাবেন? চা না কফি? অপরা জানতে চায়।

অপরা ঘণ্টা বাজিয়ে বেয়ারা ডেকে কফি আনতে বলে।

পূষণ জিজ্ঞেস করে—আপনাদের প্রজেক্ট ফাইন্যাল হয়েছে?

—না-আ। এই দেখুন না জার্মানি থেকে কনসাল্ট্যাণ্ট এসেছেন একগাদা নতুন ড্রইং নিয়ে। আবার নতুন করে এস্টিমেট চাইতে হবে। এসব নিয়ে বকতে গিয়েই তো দেরি হলো।

বেয়ারার হাত থেকে কফির কাপ নিয়ে নিজে পূষণের দিকে বাড়িয়ে ধরে অপরা। নিজের কাপে চুমুক দিয়ে বলে—বলুন—

পূষণ মৃদু হাসে—কিছু বলতে আসিনি। আপনাকে দেখতে এসেছি। সেদিন টেনশনে ছিলেন, আজ কেমন আছেন?

—ভালো—খুব ভালো। একটা বড় ঝামেলা মেটানো গেছে।

—আমার পারিশ্রমিকের কথা মনে আছে তো? দু'জনেই শব্দ করে হেসে ওঠে।

৯

জীবনে কোনো কিছু সম্পর্কেই আগাম-ঘোষণা চলে না। কখন যে কী ঘটবে, জীবনের খাত কোন দিকে বাঁক নেবে তার সঠিক পূর্বাভাস যে দিতে পারে সে নিশ্চয় নিপুণ জ্যোতিষী। জ্যোতিষে বিশ্বাস নেই পূষণের। কিন্তু গত কয়েকদিনে যা ঘটে গেল তা এমনই দ্রুত ও অভাবনীয় যে তুখোড় রাইট-উইঙ্গার হয়েও পূষণ ভারসাম্য রাখতে গিয়ে টালমাটাল হয়ে যাচ্ছে।

অপরার সঙ্গে দেখা করার পরদিনই ডেকে পাঠিয়েছিলেন এম. ডি। জানতে চান গ্লোবাল প্রজেক্টের ব্যাপারে ও কিছু করতে পারে কিনা।

পূষণ বলে, স্যার, আমি টেকনিক্যাল লোক নই। আমরা কি ড্রইং এস্টিমেট দিয়েছি জানি না। তবে আমার কাছে খবর আছে, আমরা খুব প্র্যাকটিক্যাল হিসাব দিইনি। আমাদের এস্টিমেট অনেক বাড়ান এবং তার চেয়েও বড় কথা আমাদের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনে অর্থাৎ সাধারণভাবে সামগ্রিক কারিগরী বিষয়ে কিছু ভুলভ্রান্তি আছে।

—তুমি এই প্রজেক্টের পুরো দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছ?

—তা কি করে নেব! ওটা তো আমার সাবজেক্ট না। তবে ওভারঅল প্রজেক্ট ম্যানেজমেণ্টে সাহায্য করতে পারি, আপনি যদি বলেন। তবে একটা শর্তে।

—কি শর্ত তোমার ?

—আমি যেভাবে বলব সেভাবে আর্থিক পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষণ দেখাতে হবে। টেকনিক্যাল মডিফিকেশন যদি সাজেস্ট করি তা যথাসাধ্য অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। আর, গ্লোবালের সঙ্গে আলোচনায় হয় আপনি বা ডেপুটি এম. ডি (টেকনিক্যাল) থাকবেন এবং কখনোই আমাকে ডাকবেন না। আমার যা-কিছু যোগাযোগ কেবল আপনার সঙ্গে। আর কেউ জানবে না যে এ-ব্যাপারে আমি কিছু করছি। আমি আড়ালে থাকতে চাই। বুঝতেই পারেন—হেগড়ে, কুমার আমার বন্ধু।

বরদাচারি তীক্ষ্ণ চোখে ওকে পর্যবেক্ষণ করেন। ভাবেন ওর শর্তগুলো নিয়ে, মনে মনে ওর বুদ্ধির প্রশংসা করেন। বলেন, আমি এখনই তোমাকে কথা দিচ্ছি না। কথা দেবার আগে আমার কাছে এমন প্রমাণ থাকা দরকার যাতে বুঝতে পারি তুমি যা বলছ তা সম্ভব।

বিনীত ভঙ্গিতে পূষণ বলে, নিশ্চয় স্যার। বিনা প্রমাণে আমাকে বিশ্বাস করবেন কেন।

একটা কাগজ বের করে এম. ডি-র দিকে বাড়িয়ে আবার বলে, এই ফিগারগুলো একবার চেক করিয়ে নিন। আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন গলদ কোথায়। ফিগারগুলোর পাশে আমাদের রিপোর্টের পাতার নম্বর দেওয়া আছে। মিলিয়ে দেখতে কোন অসুবিধে হবে না। স্যার, আর একটা কথা বলি। দু'-একদিনের মধ্যেই গ্লোবাল নতুন ড্রইং দিয়ে নতুন এস্টিমেট চাইবে। তখন আমাকে আবার ডাকবেন।

বরদাচারির বিস্মিত চোখের নীরব সম্ভ্রম আদায় করে বেরিয়ে এসেছিল পূষণ। মিস চাওলাকে চোখ টিপে বলেছিল—থ্যাঙ্কু !

সেদিনই সন্ধ্যায় অপরার বাড়িতে ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল। অপরা হোটেল-রেস্টুরেন্টে যেতে রাজী নয়। কলকাতার শিল্পজগৎ খুব ছোট। পূষণের সঙ্গে ওকে দেখলেই নানা গুজব তৈরি হবে। অপরা নিজের বাড়িতেও একলা কোনো পুরুষকে ডাকে না। কিন্তু পূষণের পারিশ্রমিক তো দিতে হবে। পূষণ অবশ্য বলে, ওটা বকেয়া থাক। পরে আদায় করবে। অপরা জানায়, ঋণ রাখায় ও বিশ্বাসী নয়।

অনেক ফুল আর মিষ্টি নিয়ে হাজির হয় পূষণ। অপরাকে দেখেই দু'চোখে মোহাঞ্জন লাগে। ও পরেছিল হলুদ-লাল পাড়ের সাদা তাঁতের শাড়ি, সাদা

ব্লাউজ। মুগ্ধস্বরে পূষণ বলে, অপরা, আপনি যেন রজনীগন্ধার স্বপ্ন ! আপনাকে দেখলে ভ্যানগগ্, আর সূর্যমুখী আঁকতেন না।

লাজুক হেসে অপরা বলে, ধ্যাৎ, কী যে বলেন !

কথায় কথায় পূষণের জানা হয়ে যায়, ওর মা-বাবা নেই। একমাত্র ছোট ভাই আছে এয়ারফোর্সে। এখন তেজপুরে। দু'চুড়ায় থাকেন এক কাকা। ছুটির দিনে ও যায় সেখানে।

অফিস ঘরের মতনই সুরুচিপূর্ণ সাজানো ফ্ল্যাট। বোঝাই যায় ফুল, লতা-পাতার প্রতি ওর টান। বারান্দায় ফুলের টবের সারি। বসার ঘরের কোণে মানি প্ল্যান্ট, ক্যাকটাস, রবারগাছ।

অপরা বলে, সন্ধেবেলা আপনার তো পানীয় চাই ?

পূষণ অবাক হয়—আপনার এখানে—

—আমি খাই না। বুম্বা—আমার ভাই—ও খায়। ওর জন্যেই রাখা থাকে। ওর তো আসা-যাওয়ার ঠিক নেই। জেটবেগে আসে যায়। আপনি খেতে পারেন। কি দেব, হুইস্কি ?

পূষণ হাসে—অ্যাজ য়ু প্লিজ।

অপরা ভাবে, ও কি নিজস্ব শব্দে হাসবে না ?

একটি সন্ধ্যায় অল্প-পরিচিত, পরস্পর পছন্দকারী নারী ও পুরুষ যতখানি ঘনিষ্ঠ হতে পারে ঠিক ততটাই অন্তরঙ্গতায় ভেসেছিল দু'জনে। নিজের ঘরে ফিরে পূষণ অপরার টেলিফোন পায়—ও ঠিক ফিরেছে তো ! সন্ধ্যাটা বিরক্তিকর মনে হয় নি তো ?

চারদিন পর অপরার ফ্ল্যাটেই ওকে প্রথম চুম্বন করে পূষণ। ওর ঈষৎ পৃথুল ঠোঁট চুষতে চুষতে মনে হয়েছিল, এর চেয়ে মধুর খাদ্য পৃথিবীতে আর কিছু নেই। অপরার ঘাড়ের ঘ্রাণে পেয়েছিল তারুণ্যের স্বপ্নের স্পন্দন। নিজের মনে পূষণ বলেছিল, এমন নারীর জন্যে এক জীবনের প্রতীক্ষা দেওয়া যায় অনায়াসে।

এর তিনদিন পর অপরাকে নিয়ে আসে নিজের ফ্ল্যাটে। প্রস্তাবে আপত্তি করেনি অপরা। কেননা একজন মানুষকে জানতে গেলে তাকে দেখা দরকার তার সর্বভূমে। মানুষের রুচি-সঙ্গতির নির্ভুল প্রমাণ থাকে ড্রইং রুমে নয়, বেড-রুমে, কিচেনে, বাথরুমে। যেমন গেঞ্জির রং প্রমাণ করে পুরুষটি স্বভাবে পরিচ্ছন্ন কিনা।

সারা ফ্ল্যাট ঘুরে দেখে ড্রইং রুমে আসার পর পূষণ বলে, কেমন দেখলে ?

—বেশ ভালো ফ্ল্যাট। তবে আরেকটু টাইডি করলে ভাল হবে।

—হ্যাঁ। আসলে ফেমিনিন টাচ দরকার। ওটা না-থাকলে কোনো ফ্ল্যাটই সমৃদ্ধ মনে হয় না। তো কি মনে হলো—থাকতে পারবে?

চমকে ঘাড় ঘোরায় অপরা—তার মানে?

শব্দ করে হাসে পূষণ। যে-হাসি শুনে অপরার মনে হয় সাশিতে সাশিতে বাক্য বিনিময় হচ্ছে।

—এর চেয়েও স্পষ্ট করে বলতে হবে? অবশ্য দেখাবার মতন আমার হাতে কোনো ফ্ল্যাগ নেই। সেকথা তোমাকে আমি বলেছি।

প্রথম বাক্য শুনে অপরার বুকের মধ্যে যে-ভাবে রক্ত ছলাৎ করে উঠেছিল, পরের কথা শুনে তা স্তিমিত হয়ে যায়। ওর অবাক লাগে।—কি বলছ বুঝলাম না।

পূষণ বলে, আমার দেখাবার মতন পিতৃপরিচয় নেই, আত্মীয়স্বজন নেই। আমি উঠে এসেছি শূন্য থেকে—ফ্রম জিরো। বলতে পারো ফুটপাত থেকে এই বালিগঞ্জ পার্ক লেনে। একেবারে নিজের চেষ্টায়। কেউ হাত ধরেনি। তুমি কি আমার হাত ধরবে অপরা? যাতে জীবনটা আরো একটু উঁচুতে নিয়ে যেতে পারি!

কৌতুকের স্বরে অপরা বললো, জীবন কি পিরামিড না এভারেস্ট যে উঁচুতে উঠবে! বেশি উঁচুতে নৈঃসঙ্গ বড় তীব্র—তা জানো?

স্বরে কৌতুক থাকলেও শব্দের ওজন বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। ঠিক কী বলতে চায় অপরা—পূষণ সম্যক ধরতে পারে না।

অপরা বললো, জীবন সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুব আংশিক। তার সমগ্র চেহারাটা ভাবার, অনুমান করার ক্ষমতাই হয়ত নেই আমাদের। এই যে তুমি বললে, তোমার হাতে ফ্ল্যাগ নেই। আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছ তা বলছি না। তবু এটা ঠিক আমার হাতে অনেক ফ্ল্যাগ আছে। কিন্তু আমার না-থাকার তালিকাও খুব দীর্ঘ। কত দীর্ঘ তুমি ধারণাই করতে পারবে না। আমি কত নির্জন, কত একলা তুমি জান? ক্লাবে-পার্টিতে যেতে পারি না বলে দিনের পর দিন অফিস থেকে ফিরে অত বড় ফ্ল্যাটে কিভাবে একলা সময় কাটে বুঝতে পার? তুমি জিরো—শূন্য—থেকে উঠে এসেছ। তোমার একটা অ্যাচিভমেণ্ট আছে। কিন্তু যে জিরোতে শুরু করে জিরোতেই থেমে আছে, তার কথা ভাব তো! দুই শূন্য যোগ করে এক হয় না। দুটো শূন্য পাশাপাশি রাখলেও তার কোনো মূল্য

বাড়ে না। কিন্তু দুটো শূন্য যদি একের পাশে থাকে তবে একশ'। ঐ এক হলো জীবন। যার লক্ষ্যের দিকে তোমার হাত ধরে নয়, তোমার সঙ্গে যেতে চাই। তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল, তুমিই সে-পুরুষ যে আমাকে জীবনরূপ শেখাবে। কী, পারবে?

একটুক্ষণ সময় লাগে সব কথাগুলো মগজে ঠিক ঠিক গেঁথে নিতে। তারপরই পূষণের অনুভবে বিস্ফোরণ ঘটে। অপরাকে বুকে জড়িয়ে ঘাড়ে গলায় চুমু ঢালতে ঢালতে বলে—পরা—আমার পরা—

পূষণ আরো আগ্রাসী হবার চেষ্টা করতেই নিজেকে আলগা করে অপরা—ব্যস, ব্যস। অনেক হয়েছে। আর বেশি আদর করলে দমবন্ধ হয়ে মারা যাব।

মুখে খুশির হাসি নিয়ে অপরাকে দেখে পূষণ। ও প্রখর সুন্দরী নয়, তবু বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না।

দু'দিন পর অপরার প্রতীক্ষায় নিজের ফ্ল্যাটে বসে আছে পূষণ। সময় পেলেই ফোনে কথা বলেছে। কেবলি মনে হয়েছে, কখন সান্নিধ্য পাবে। এখন এক মুহূর্তও ওকে ছেড়ে থাকতে ইচ্ছে করে না। পূষণ নিজেই অবাক হয়। আর কোনো নারীর জন্যে এমন অস্থিরতা, কাতরতা বোধ করেনি আগে। মনে হয় অপরা যেন এই গ্রহের মানবী নয়, অন্য কোথাও থেকে বেড়াতে এসেছে। বা, ও নিজে রয়েছে এক গভীর স্বপ্নের মধ্যে। স্বপ্ন ফুরলেই মিলিয়ে যাবে অপরা।

কলিং বেলের চিৎকার শুনেই আঁতকে ওঠে পূষণ। অপরার আসার সময় হয়নি এখনো। আর এই চিৎকার ওর অতি চেনা। জিজির তো আসার কথা ছিল না। সেদিনের পর আর ফোনও করেনি। পূষণ শুনেছিল কাগজের ব্যাপারে বম্বে না কোথায় যেন গিয়েছিল।

আবারও বেলের চিৎকার শুনে দরজা খুলতেই হয়।

—ঘুমোচ্ছিলে নাকি? বলতে বলতে ভেতরে আসে জিজি।

—তুমি হঠাৎ! কবে ফিরেছ?

—কাল ফিরেছি। হঠাৎ আবার কি। আমি কি কখনো নোটিস দিয়ে আসি?

—না, না। তা বলিনি। ইয়ে মানে, কোনো দরকার থাকলে বলো, আমার একটু তাড়া আছে।

—কোথায় যাবে?

—যাব না। ইয়ে—মানে অন্য লোক আসবে।

—লোক না নারী? কে? অপরা? অতদূর পৌঁছে গেছ! বাঃ, আই মাস্ট কনগ্রাচুলেট য়ু।

রেগে ওঠে পূষণ—জিজি, মাইও ইওর বিজনেস। কাজের কথা থাকলে বলো, আদারওয়াইজ য়ু মে প্লিজ এক্সকিউজ মি।

পাজামা-পাঞ্জাবি পরা পূষণের ভদ্দুর মূর্তির দিকে এক পলক তাকিয়ে আত্মস্থ ভঙ্গিতে সোফায় বসে জিজি বললো, বাড়িতে বন্ধু এলে তাদের আপ্যায়ন করতে ভুলে গেছে দেখছি। এক গ্লাস জল তো দাও। গলা ভিজিয়ে তোমার অপরা-জয় গল্প শুনি।

পূষণ জল এনে দিলে এক ঢোকে গ্লাস শেষ করে জিজি বলে—থ্যাঙ্ক।

হাতের রুমালে ঠোঁট মুছে আবার বলে—আমার কথাগুলো মনে আছে তো? ভুলে গেলে, মানে ভুলে যাবার চেষ্টা করলে, মারাত্মক ভুল করবে পূষণ মিত্তির। জিজি লাহিড়ীকে তুমি চেনোনি।

ক্ষুব্ধ পূষণ বলে, তুমি কি আমায় ভয় দেখাচ্ছ? ব্ল্যাকমেল?

উদার প্রশ্রয়ের মৃদু হাসি গালের ভাঁজে উজিয়ে জিজি বললো, য়ু আর আ ডার্লিং কিড! সেজন্যেই তোমাকে এত ভালবাসি।

পূষণ কিছু বলতে পারার আগেই ভীরু-স্বরে কলিং বেল বাজে। পূষণ এগিয়ে গিয়ে দরজা খোলো এসো।

অপরা এগিয়ে এলে জিজি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়—নমস্কার, মিস দাসগুপ্ত। কেমন আছেন?

এখানে জিজিকে দেখবে অপরার দূর ভাবনাতেও তা ছিল না কখনো। বিস্ময় গোপন না করেই উজ্জ্বল হেসে বললো, জিজি! আপনি এখানে কি করছেন?

ঘাড় ঝাঁকিয়ে জিজি বলে, আমার কাজটাই তো এরকম—ভুল সময়ে ভুল জায়গায় যাওয়া। আসলে আমরা একটা কভার-স্টোরি করছি—'ইনফ্লুয়েন্স অব মেন অন কেরিয়ার উওমেন, সেজন্যে মিঃ মিত্রর একটা ইন্টারভিউ চাইছিলাম। উনি তো ভীষণ ব্যস্ত মানুষ। অফিসে একেবারে সময় দিতে পারেন না। ভাবলাম বাড়িতে এসে ধরব। এখনো ব্যস্ত আছেন বলছেন। কি আর করা! পরে একদিন হবে।

পূষণের দিকে তাকিয়ে বললো, চলি মিঃ মিত্র। পরে ফোন করে জেনে নেব কবে আপনার সময় হবে।

অপরাকে বললো, চলি মিস দাশগুপ্ত। উইশ য়ু অল দ্য বেস্ট!

ওদের কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে যায় জিজি।

অপরা জিজ্ঞেস করে—তুমি ওকে চিনতে?

—হু' একবার অফিসে এসেছিল। ভেরি রিসেন্টলি।

—আমার ওঁকে বেশ লাগে। সো স্মার্ট! মার্জিত। মনে হয় ফান-লাভিং অথচ স্বাভাবিক একটা উষ্ণতা রয়েছে।

সপাটে অপরাকে বুকে জড়িয়ে গালে গাল রেখে পূষণ বলে, আমার তোমাকে ছাড়া আর কারুকে ভালো লাগে না। তুমিই আমার সব উষ্ণতার খনি।

ওভাবে জড়িয়ে আদর করতে করতে ওরা শোবার ঘরে পৌঁছে যায়। বিছানায় বসে অন্তহীন চুমু খেতে খেতে অপরার বুকে হাত রাখে পূষণ। অপরার সারা শরীর কেঁপে ওঠে। পূষণের হাতের চাপ বাড়ে। অপরার গলা থেকে ঝরে—আঃ!

হু'একবার বলেছিল অপরা, এই ছাড়ো, কি হচ্ছে—ছাড়ো—

অবিরল সমুদ্রের ঢেউ কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় বুঝতেও পারে না। এত সুখ—নিজের শরীরেই লুকানো থাকে এত সুখ, কে জানত! একটুকরো মৃত্যুর মতন গভীর সুখের অতলে তলিয়ে যাওয়ার আগে ডুবন্ত মানুষের আকুলতায় দু'হাতে প্রবলভাবে জড়িয়ে ধরেছিল পূষণকে।

অনেক—অনেক পরে যখন চেতনায় ফিরল, অপরার চোখের কোণে দুধের দাগের মতন অশ্রুফেনা। পূষণ গাঢ়চোখে ওর শিথিল নিদ্রালু অবয়বের দিকে চেয়ে থাকে। নিজের ভেতরে যে কি হয় বুঝতে পারে না। অপরার গালের ওপর মাথা রেখে নরম গলায় ডাকে—পরা—

প্রথমেই সাড়া আসে না। কয়েকবার ডাকার পর যেন বহুদূর থেকে উত্তর আসে—উঁ—

অপরার অন্ধহাত খুঁজে খুঁজে উঠে আসে পূষণের ঠোঁটের ওপর—কথা বলো না। —ফিসফিসিয়ে উচ্চারণ করে।

আরো কিছুক্ষণ সময় বয়ে যেতে দেয় পূষণ। অপরার অনাবৃত বুকের তীব্রতা সহ্য করতে না-পেরে নিজেই চাদর টেনে ঢেকে দেয়। অপরা ওর পিঠে হাত রেখে চোখ খোলে। এক চিলতে হেসে পূষণের খোলা বুকে মুখ গোঁজে।

পূষণ ডাকে—পরা—

—বলো—

—আমরা কবে বিয়ে করব ?

—তুমি বলো।

—আমি তো এখনই করতে চাই।

—সব কিছু পেয়ে যাওয়ার পরও চাও ?

—এতো ভূমিকা হলো মাত্র। পাওয়া তো শুরুই হয়নি।

পূষণের পিঠে চিমটি কেটে অপরা বললো, এই যদি ভূমিকা হয় তবে আমি আর বাঁচব না।

একটু থেমে যোগ করে—বুম্বা আসুক। ওকে তো বলা দরকার।

ওর চুলে বিলি কাটতে কাটতে পূষণ জানতে চায় জি জি-ফোর-এর কি হয়েছে, কেননা ওর মনে হয়েছে এই প্রজেক্টটাও অপরার নানা টেনশনের অন্যতম কারণ। অপরা জানায়, এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। মুশকিল হচ্ছে মিঃ মায়ারের ইচ্ছা এর বরাদ্দ সিলভার ব্লু-কে দেবেন। কিন্তু বরদাচারির—মিনিস্ট্রি ও গ্লোবালের বোর্ডে—প্রভাব মিঃ লোবোর চেয়ে ঢের বেশি। তাছাড়া অপরাকে মানতেই হয় যে, ইস্টার্নের টার্মস ও দক্ষতা সিলভার ব্লু-র চেয়ে অনেক ভালো।

অপরা বলে, তোমাদের ঐ হেগড়ে-কুমার একেবারে গবেট। ওরা লেটেস্ট টেকনিক্যাল ডেভলপমেণ্ট সম্পর্কে একেবারেই সচেতন নয়। আমরা নতুন জার্মান টেকনোলজি ব্যবহার করতে চাইছি—ওরা বুঝতেই চাইছে না, ওরা সেই ট্র্যাডিশনাল ব্রিটিশ মডেলের বাইরে ভাবতে পারছে না। আলোচনা চলছে—দেখা যাক।

পূষণের বাঁ হাত অপরার গলা বাহু ছুঁয়ে অপরার ডান বুকে গিয়ে থামে। ওর শরীর শিরশির করে। অপরা ওর হাতের ওপর গাল চাপে।

পূষণ বলে, পরা, আমাকে একটা ফেবার করবে ?

—ফেবার ? সেকি ! বৌ মানে তো দাসী। তুমি তো হুকুম করবে। করো।

গলায় আহত হবার ভাব ফুটিয়ে পূষণ বললো, তুমি আমাকে তাই ভাবো নাকি ?

অপরা বললো, এই তুমি রাগ করলে ! আমি মজা করছিলাম। বলো কি করতে হবে ?

—তোমার ঐ জি জি-ফোর ফাইলটা পড়তে দেবে একবার ?

—অসম্ভব ! প্লিজ এ-অনুরোধ করো না।

চাদরের ভেতরে পূষণের হাত তৎপর থাকে। মনে মনে বলে—ছুঁয়ে থাক, ছুঁয়ে যাও। শরীরের আর্তি মস্তিষ্কের প্রখরতা ঠিকই ভোঁতা করে দেবে।

পূষণ বলে, আমার স্রেফ অ্যাকাডেমিক কৌতূহল। তুমি তো জান আমি প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত নই। আমি কথা দিচ্ছি, আমি ওর কিছুই ব্যবহার করব না। তোমার সামনে বসে একবার দেখব শুধু।

শরীরের অস্থিরতা অপরার চিন্তায় ধোঁয়াশা আনে। পূষণ সমান সক্রিয়। আর সহ্য করতে পারে না অপরা। পূষণকে নিজের দিকে টেনে বলে, কাল এগারটা নাগাদ এসো। নাউ-নাউ-

১০

জি জি-ফোর প্রজেক্টের দায়িত্ব ইস্টার্নকে দেবার সিদ্ধান্ত হলো। ইস্টার্নের দেওয়া সর্বশেষ এষ্টিমেট, নকৃশা ও সিডিউল গ্লোবালের জার্মান কনসালট্যাণ্ট অনুমোদন করার পর ওদের বোর্ডও তা সমর্থন করে।

তার আগে অবশ্য দীর্ঘ আলোচনা হয় দু'পক্ষে। বরদাচারি, তাঁর টেকনিক্যাল ডেপুটি মিঃ সুদ সহ, হেগড়ে ও কুমারকে নিয়ে আলোচনায় বসেন। পূষণের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শেষ পর্যন্ত মীমাংসায় পৌঁছান যায়।

মিঃ মায়ারের হাত থেকে সই করা কাগজপত্র নিয়ে নিজের অফিসে ফিরে বরদাচারি সুদকে বলেন, নিশ্চয় মানবেন সব ক্রেডিট পূষণেরই প্রাপ্য। টেকনিক্যাল লোক না হয়েও ও এতসব জানল কি করে বুঝতে পারছি না। আর আশ্চর্য ও নিজে আদৌ ইনভল্‌ভড্‌ হতে চাইল না !

—ঠিকই বলেছেন স্যার। ও একেবারে ডেডিকেটেড টিম-ম্যান। ওর জ্ঞানও অসাধারণ। ও যখন তথ্যগুলো দিলো আমরা মানতে চাইছিলাম না, অথচ গ্লোবালের কনসালট্যাণ্ট মিঃ ফ্ল্যইবার ঠিক পূষণের কথাগুলোই বললেন। পূষণকে রিওয়ার্ড করা উচিত স্যার।

—কাল বোর্ড মিটিংয়ে বলব আমি। কদিন আগেই অটোমেশনের সমস্যা মিটিয়েছে, এবারে এই প্রজেক্ট—ওর জন্যে নিশ্চয় কিছু করা দরকার। ও এমন ডিউটিফুল—বাবার মৃত্যুর পরদিন ও আমাকে ফাইল পৌঁছে দিয়ে গেছে। এসব কি ভোলা যায় !

মিঃ মায়ার খুশি হবেন না জানত অপরা। কিন্তু বোর্ডের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কারুর কিছু বলার থাকতে পারে না। আর, মানতেই হবে ইস্টার্নের শেষ কাজের সঙ্গে মিঃ লোবো মোটেও ধার ঘেঁষতে পারেননি। তবু মাথায় একটা কাঁটা খচখচ করে, হঠাৎ ইস্টার্ন—মানে ঐ হেগড়ে-কুমার—এত কুশলী ও দক্ষ হয়ে

উঠল কি করে? নাকি মিঃ সুদই আসল লোক যিনি চূড়ান্ত প্রজেক্ট তৈরি করেছেন!

চারটে নাগাদ ওকে ডেকে পাঠালেন মিঃ মায়ার।

ঘরে যেতেই বললেন, অপরা, তোমাকে আমি মেয়ের মতন স্নেহ করি, বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি আমার বিশ্বাস রাখোনি।

অপরা অবাক হয়—কী বলছেন স্যার! আমি বিশ্বাসভঙ্গ করেছি?

—ইয়েস। নইলে ইস্টার্ন ফ্যাইবারের ফিগার ড্রইং কি করে পেল! আমি তো লোবোকে কিছু বলিনি। ইচ্ছে করলে বলতে পারতাম নাকি?

—বিশ্বাস করুন আমি জানি না। আমি ইস্টার্নকে কোনো তথ্য দিইনি।

—হতে পারে না। আমি নিশ্চিত ইস্টার্ন ওয়াজ ফেড উইথ দ্য মেটরিয়ালস। অথচ পুরো ফাইল তোমার হেফাজতে ছিল।

অপরা বুঝতে পারে না ইস্টার্ন কি করে ওসব পেতে পারে। হেগড়ে বা কুমার কেউ আসেনি ওর কাছে। এলেও পেত না কিছু।

মায়ার বললেন, তুমি পূষণের সঙ্গে কখনো কিছু আলোচনা করেছ?

—না, স্যার। তাছাড়া ও-তো প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত নয়, আসেওনি। হি হ্যাড নো রোল টু প্লে ইন দিস।

মুখে বললেও নিজের মধ্যে খচখচানি টের পায়। ও ফাইল দেখার জন্যে অত জেদ করেছিল কেন? যদিও অপরার সামনেই কিছুক্ষণের জন্যে ফাইলটা দেখেছে এবং ওকে কোনো কিছু নোট বা কপি করতে দেওয়া হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা পূষণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এগুলো সে ব্যবহার করবে না। তাহলে? অপরা জানত না যে পূষণের চোখ ক্যামেরার কাজ করে, আর স্মৃতি কমপিউটার তুল্য।

—আমি দুঃখিত অপরা। তোমার কথা মানতে পারছি না। তুমি যে পদে আছ সেখানে যদি বিশ্বাস না-থাকে—

ওর মাথায় সমুদ্রের গর্জন—পূষণ ওকে বিট্রে করেছে। এমন কুৎসিৎভাবে কোম্পানির স্বার্থে ব্যবহার করেছে! বুকের মধ্যে আগুনের দাহ।

বলে—বুঝেছি, স্যার। আমি রেজিগ্‌নেশন পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মায়ার বলেন—তুমি রাগ করছ, অপরা। তোমাকে আমি তা করতে বলিনি। শুধু বলছি ভবিষ্যতে আরও সাবধান হবে। ডোন্ট রিপিট দিস।

—না, স্যার। এরপর আর এখানে কাজ করতে পারব না আমি।

নিজের ঘরে ফিরে রেজিগ্‌নেশনের চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে সামান্য ব্যক্তিগত জিনিসপত্র যা ছিল গুছিয়ে নিয়ে পূষণের অফিসে ফোন করে অপরা।

মার্গারেট জানায়—পূষণ আজ অফিসে আসেনি। ও অসুস্থ। কে বলছেন—মিস লাহিড়ী?

কিছু না-বলে ফোন রেখে দেয় অপরা। অসুস্থ হয়ে সারাদিনে খবর দিল না ওকে? যে দিনে চার-পাঁচ বার ফোন করে অকারণে, সে অসুস্থ হয়েও ফোন করবে না? মার্গারেট কেন ওকে মিস লাহিড়ী বলে মনে করল? মিস লাহিড়ী কি জিজি? তার মানে জিজি ওকে প্রায়ই ফোন করে। তবে যে পূষণ বলেছিল সম্প্রতি কয়েকবার জিজি গেছে ওর কাছে। অন্য কোনো মিস লাহিড়ী কে হতে পারে?

উত্তপ্ত মাথায় অজস্র প্রশ্ন—সবই উত্তরহীন—ওকে ক্ষতবিক্ষত করে। সংশয়, সন্দেহ, বিশ্বাসহীনতা অপরার চেতনাকে নিষ্ঠুর ঠোকরায়। বুঝতে পারে না কি করবে, কি করা উচিত।

উদ্‌ভ্রান্তের মতন পূষণের বাড়িতে ফোন করে। লাইন পায় না। আবার করে—এনগেজড। আবার করে—বেজে যায় টেলিফোন, কেউ তোলে না। তারপর আবার—এনগেজড। কোথায় কোন নম্বরে লাগছে কে জানে।

অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা পূষণের বাড়ির দিকে রওনা হয় ট্যাক্সিতে। রেজিগ্‌নেশন দেবার পর কোম্পানির গাড়ি নিতে ইচ্ছে হলো না। ট্যাক্সিতে যেতে-যেতেও মাথায় বিদ্যুতের তীব্রতায় ছোটাছুটি করে প্রশ্নগুলো। পূষণ কি প্রতারক, মিথ্যেবাদী, বিশ্বাসহন্তারক? ওকে কিছুতেই এসব ভাবতে ইচ্ছে করে না। ও তো অনেক বড় মাপের মানুষ। ওকে কি ছোট ভাবা যায়?

পূষণের মাল্টিস্টোরিড বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামলে ভাড়া জানতে চায় অপরা। ড্রাইভার মিটার দেখে ভাড়া হিসাব করে।

আচমকা অপরার চোখে পড়ে জিজির পিঠে ঘনিষ্ট হাত রেখে একটা গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে পূষণ। জিজির মাথা নিচু, বুকের ওপর ঝোঁকান। পূষণ ওকে কিছু বলছে। কি বলছে শোনা সম্ভব নয়। তবে যেভাবে ওকে গাঢ় আশ্লেষে ধরে আছে তাতে ওদের ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে সংশয় থাকে না।

পূষণ বলছিল, তুমি অহেতুক সিন করলে। আমাদের মধ্যে এমন শর্ত ছিল না। আমি তোমাকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিইনি। অপরাকে আমি ভালোবাসি, ওকে বিয়ে করব—এতে তুমি কষ্ট পেলে আমি দুঃখিত হতে পারি, তার বেশি আর কিছু করার নেই।

ভাঙা গলায় জিজি বলে, আমি আর আসব না তো ?

—বন্ধু হিসেবে নিশ্চয় আসতে পার। তবে পারস্পরিক অসুবিধে এড়াবার জন্যে ফোন করে এসো, বিয়ে হয়ে গেলে অবশ্য যখন খুশি আসতে পার। তুমি নিশ্চয় চাও না অপরা আমাকে ভুল বুঝুক।

দরজা খুলে জিজিকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পূষণ বলে, সাবধানে যেও। ভালো থেকো।

জিজি গাড়ি স্টার্ট দেয়। পূষণ ভেতরের দিকে এগিয়ে যায়।

ড্রাইভার বলে—দিদি, ভাড়াটা—

অপরা ধরে নেয় জিজির সঙ্গে সারাদিন কাটাবার জন্যেই অফিসে যায়নি পূষণ। অসুখ কিছুই হয়নি। ওটা নিছক বাহানা। মুহূর্তে অপরার সারা পৃথিবীতে হিম অন্ধকার নামে। এখন চোখ ভেঙে জল বয়। নিজেকে নিজের কাছে বিদেশী মনে হয়।

ড্রাইভারকে বলে—আলিপুর চলুন।

ট্যাক্সি গুরুসদয় রোডে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকায়, ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়ে বজ্রপাত ঘটে। তারপরই তুমুল বৃষ্টি নামে। ট্যাক্সির জানালার বাইরে পৃথিবী ধূসর হয়ে যায়।

পরদিন অফিসে ঢুকেই পূষণ টের পায় সারা অফিসে খুশির হাওয়া বইছে। অত বড় প্রজেক্টের ভার পাওয়া মানেই কোম্পানির সমৃদ্ধি। তার মানে বাড়তি বোনাস। আগামীবারে নতুন দাবি সনদ দেওয়া হবে।

পূষণ অবাক হয়ে গেল ওর ঘরে হেগড়ে আর কুমারকে দেখে। ওরা দু'জনেই ওকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছে। এক ফ্লোরের ব্যবধানে কাজ করলেও গত এক বছরে ওরা কেউ ওর ঘরে আসেনি।

পূষণ বললো, হোয়াই মি ? আমি কি করেছি ?

হেগড়ে বলে, কোনো কৃতিত্ব দাবি না-করে তুমি যা করেছ আমরা তাকে অভিবাদন জানাই। তুমি হেল্প না করলে হয়ত এই প্রজেক্ট হাতছাড়া হয়ে যেত।

কুমার বলে, আমাকে স্বীকার করতেই হবে আমরা তোমাকে ঠিক বুঝতে পারিনি বা অনেক সময় ভুল বুঝেছি। য়ু আর আ গ্রেট পার্সন। এখন থেকে আমরা একটা টিম হিসেবে কাজ করতে পারব আশা করি।

বারবার পূষণ বলে, তোমরা এসব আমাকে কেন বলছ জানি না। আমি

তো কিছুই করিনি। তাছাড়া আমি তো টেকনিক্যাল ব্যাপার কিছু বুঝি না। সব তো তোমরাই করেছ।

হেগড়ে হাসে, তুমি বড্ড বেশি বিনয় করছ। মিঃ স্বদ আমাকে বলেছেন তুমি কি করেছ। গ্লোবালের মিটিঙে আমি তো ছিলাম। দেখেছি প্রায় লস্ট কেস কি ভাবে মিঃ স্বদ তোমার দেওয়া তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে বের করে আনলেন। শুধু বলো, তুমি ওগুলো কোথায় পেলে ? হাউ ?

অম্লান হাসে পূষণ—নলেজ, সিম্পল নলেজ। তোমরা তো আমার নলেজ ইকনমির কথা মানতে চাও না। মনে রেখো ড্রাকার ভুল বলেননি।

ওদের পরে আরো অনেক সিনিয়র অফিসার ওর সঙ্গে দেখা করে গেল। মার্গারেট বললো, গতকাল থেকেই সবাই ওকে খুঁজছে।

আসলে গতকাল ও অফিসে আসেনি মানসিক টেনশন থেকে দূরে থাকার জন্যে। জানাই ছিল গতকাল প্রজেক্টের ভাগ্য-নির্ধারণ হবে। যেহেতু বরদাচারি ও স্বদ ওর কথামতন সব তৈরি করেছেন, যদি কোন কারণে গোলমাল হয় তবে ওর পক্ষে মুখ দেখানই কষ্টকর হত। ব্যবসা-বাণিজ্যে শেষ কথা বলে কিছু নেই। হবেই—তা বলা যায় না। যদি না হত তবে ও কি করতো ভাবেনি। কিন্তু অফিসে সারাক্ষণ দুরুদুরু বুকে বসে থাকা অসম্ভব ছিল। সেজন্য ঘরে বসে চুপ-চাপ একা একা মদ্যপান করেছে। দুপুর দুটো নাগাদ মার্গারেট ওকে সাফল্যের খবর দেয়। তারও অনেক পরে আসে জিজি।

আরো একটা ভয় কাজ করছিল। অপরা কি বুঝতে পারবে ওর ভূমিকা ? যতই নিজেকে আড়ালে রাখুক, কাগজপত্র দেখে অপরার বুঝতে না-পারার কথা নয় ওসবের গোপন স্থপতি কে ! বুঝতে পারলে ও কি রাগ করবে ? ক্ষুব্ধ হবে ? গোঁড়াতে হলেও, পূষণ নিশ্চিত, সব বুঝিয়ে বলে ওকে মানিয়ে নিতে পারবে। রাগ কমার জন্যে সময় দেওয়া উচিত। সে-কারণে অনেকবার ভাবলেও কাল রাতে ফোন করেনি। অবশ্য, স্বীকার করতেই হবে, মনে ক্ষীণ আশা ছিল, অপরা নিজেই হয়তো ফোন করবে। ফোন করে বকুনি দিলেও ভালো লাগত। একেবারে চুপ যখন, খুবই রেগেছে হয়তো। তার মানে ওর কাজ—অপরাকে বোঝান—একটু বেশি কঠিন হবে।

সাড়ে বারোটা নাগাদ পূষণের ডাক পড়ল এম. ডি.-র ঘরে। উচ্ছল হাসির অভ্যর্থনা জানিয়ে মিস চাওলা বলে, আজ তো তোমার দিন। সবাই তোমার জন্যে বসে আছে।

দুষ্টু পোকাটা মাথায় চিড়বিড় করে পূষণের। বলে—তুমি ?

—আমি কি ?—মিস চাওলা অবাক জিজ্ঞাসু।

—তুমিও কি বসে আছ আমার জন্যে ?

ঝরঝর হাসে চাওলা—ওঃ, মিঃ মিত্র ! তুমি কি কোনোদিন বদলাবে না ?

—বদলাব যদি তুমি আমাকে তোমায় আদর করতে দাও। নইলে ইন্‌কারিজিবিলই থেকে যাবো।

—য়ু নটি ম্যান ! চোখ পাকিয়ে চাওলা বলে।

এম. ডি-র ঘরে ঢুকে পূষণ দেখে তাঁর সামনে বসে আছেন দুই ডেপুটি—মিঃ সুদ ও মিঃ পাই। আর রয়েছেন পার্সোন্যাল ম্যানেজার নিরুপম বরাট।

সাদর আহ্বান জানান বরদাচারি—এসো, এসো।

সবাই উঠে ওর সঙ্গে করমর্দন করে বলে, তুমি একটা দারুণ কাজ করেছ !

বরদাচারি বলেন, প্রজেক্টের লোক না-হয়েও তুমি যে আগ্রহ নিয়ে এবং তুখোড় বুদ্ধির সঙ্গে কাজটা করেছ তার জন্যে আমাদের কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।

পূষণ বলে, আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন স্যার। কোম্পানি তো সকলের। আমি সামান্য যেটুকু পেরেছি করেছি। আপনারা খুশি হয়েছেন এতেই আমি ধন্য। আপনাদের প্রশংসা দাবি করার মতন কিছু করিনি, তবু আপনারা যে স্নেহ দেখাচ্ছেন তাতেই আমি মুগ্ধ।

বরদাচারি বলেন, বরাট, খবরটা কি তুমি বলবে ?

বরাট বলেন, না, স্যার। আপনি বস, আপনিই বলুন।

মাথা ঝাঁকিয়ে বরদাচারি বললেন, পূষণ—ইয়ংম্যান, আমি গর্বের সঙ্গে প্রথম মানুষ হিসেবে তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি তোমার ডাইরেক্টর প্ল্যানিং, প্রজেক্টস ও মার্কেটিং পদে নিয়োগের জন্যে।

বাকি তিনজনও উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত ঝাঁকিয়ে পরপর বললেন—কনগ্রাচুলেশনস !

হতভম্ব পূষণ বিস্মিত হতেও ভুলে যায়। যে-লক্ষ্যের জন্যে দৌড়াচ্ছিল, ছিল যুদ্ধরত—তা যে এখনই হাতে এসে যাবে, বোনাস সহ, ভাবতে পারেনি পূষণ। ওর মনে হয় এটা সত্যি নয়। বুঝি-বা স্বপ্ন দেখছে।

মিঃ সুদ বললেন, পূষণ, তোমার দায়িত্বটা হয়তো বেশি হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে প্ল্যানিং ও মার্কেটিংয়ের সঙ্গে প্রজেক্টসও তোমার কর্তৃত্বে থাকা ভাল।

মিঃ পাই বললেন, তুমি তো প্রমাণ করেই দিয়েছ, য়ু আর দ্য বেস্ট ম্যান উই হ্যাভ।

ভেতরে প্রবল উচ্ছ্বাসের আলোড়ন সত্ত্বেও পূষণের মগজে যুক্তি-বুদ্ধির অঙ্ক চলে ঠিক। নতুন পদের আড়ম্বরের মধ্যে ঘোরতর বিপদের বীজের অস্তিত্বও ঠিক বুঝতে পারে। বারবার অপরা দাশগুপ্তর সাহায্য পাওয়া যাবে না। এবং, কোনো খেলোয়াড়ই চিরকাল খেলা চালিয়ে যেতে পারে না।

গলা পরিষ্কার করে পূষণ বলে, স্যার, আপনারা আমাকে যেভাবে সম্মানিত করেছেন,তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। আমি নিশ্চয় আমার দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করার চেষ্টা করব। কিন্তু আমার একটা বিনীত নিবেদন আছে। যদি অনুমতি করেন—

বরদাচারি বলেন—বলো, কি বলবে। নির্ভয়ে, বিনা দ্বিধায় বলো।

—স্যার, আপনারা আমাকে প্রজেক্টের দায়িত্ব দিচ্ছেন তাতে দুটো ভুল হচ্ছে। এক, আমি টেকনিক্যাল লোক নই, সুতরাং আমাকে সব সময় অন্যদের উপর নির্ভর করতে হবে। দুই, আমার মতে হেগড়ে, কুমার বা অনুপলের ওপর অবিচার করা হচ্ছে। কাজটা, স্যার, ওরাই করেছে, ওরাই করবে। ওদের বদলে আর কারুকে ডাইরেক্টর করলে ওরা খুবই দুঃখ পাবে, মুষড়ে পড়বে। মোরেল বলে কিছু থাকবে না। সেজন্যে আমার প্রস্তাব, ওদেরই কারুকে—যাকেই আপনারা যোগ্য মনে করেন—ডাইরেক্টর অব প্রজেক্টস পদে নিয়োগ করুন। আর যদি আরেক জন ডাইরেক্টর নিয়োগ করতে না চান তবে প্রজেক্ট মিঃ সুদের হাতেই থাক। আমি কথা দিতে পারি, আমাকে যা করতে বলবেন তা সব সময়েই করব।

চারজনে সামান্য আলোচনা হলো। পূষণের কথার যৌক্তিকতা মেনে নিতেই হলো।

মিঃ সুদ বললেন—আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইওর ফিলিং।

বরদাচারি বললেন, থ্যাঙ্ক পূষণ। তুমি খুব ভালো প্রস্তাব দিয়েছ। তুমি ডি. জি. এমের দায়িত্বেই থাকবে। বরাট, অর্ডার ইস্যু করে দাও, আজই।

নিজের ঘরে ফিরতে ফিরতে পূষণের মনে হয়, ওর পা যেন মেঝেতে পড়ছে না। যেন ভেসে চলেছে। বুকের মধ্যে দাপাদাপি করে গর্বিত উল্লাস। ইচ্ছে হয় এক্ষুনি ছুটে চলে যায় অপরার কাছে।

যাওয়া দূরে থাক ফোন করতেও কয়েক ঘণ্টা কেটে যায়। আধঘণ্টার মধ্যেই

একের পর এক সহকর্মীরা অভিনন্দন জানাতে আসে। সকলের উচ্ছ্বাস প্রশস্তি ফুরোতে চায় না। অনুপল এক ফাঁকে বললো, মিঃ সুদ আমাকে সব বলেছেন। তুমি যা করলে আমরা তা কোনোদিন ভুলব না। তোমার জায়গায় আর কেউ হলে এমন করতো কিনা সন্দেহ আছে। তোমার তুলনা নেই, পূষণ। ইঁদুর-দৌড়ে থাকলেও যে মনুষ্যত্ব খোয়াবার দরকার করে না তোমার কাছে শিখলাম।

তিনটে নাগাদ একটু ফাঁকা হয়ে অপরাকে ফোন করল পূষণ। ডাইরেক্ট লাইন বেজে গেল, কেউ তুলল না। পরে অপারেটরের মাধ্যমে চাইল, নো রিপ্লাই। আরো কয়েকবার চেষ্টা করেও না পেয়ে মিঃ মায়ারের পি. এ-কে চাইল। তখনই জানা গেল অপরা চাকরি ছেড়ে দিয়েছে গতকাল। কারণ কিছু জানা গেল না। কিন্তু পূষণ অনুমান করতে পারে।

মনের মধ্যে জলতে থাকা উৎসবের সব আলো ফুৎকারে নিভে যায়। গভীর দংশনের বিষ আর্ত করে তোলে। এতটা হবে ও ভাবতে পারেনি। অপরার কাছে কি ক্ষমা চাওয়াও যাবে? ও কি ক্ষমা করবে?

মাথায় ঝড়, বুকে অব্যক্ত যন্ত্রণা নিয়ে পূষণ চলে এলো আলিপুরে অপরার ফ্ল্যাটে। বেল দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। দরজা খোলে না। আবারও বেল টেপে। আবার। আবার। আবার।

মৃদু শব্দে দরজা ফাঁক হয় এক চিলতে। ভেতরে চেন লাগান থাকে। চিলতে ফাঁকে একটুকরো অপরা। এলোমেলো চুল। চোখের কোলে কালি। শীতল মুখ।

ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করে, কি চাই?

পূষণ বলে—অপরা, আমি। দরজা খোল।

—না। যা বলার ওখান থেকেই বলো।

পূষণ বলে, পরা, আয়্যাম সরি। আমাকে ক্ষমা করে দাও, প্লিজ। আমি বুঝতে পারিনি এতদূর যাবে ব্যাপারটা।

—আর কিছু বলবে?

—হ্যাঁ, শোন, ডাইরেক্টর হয়েছি। আমরা যে-কোনোদিন বিয়ে করতে পারি।

—কনগ্রাচুলেশনস। তোমার আরও সাফল্য কামনা করি।

কাতর কণ্ঠে পূষণ বলে, পরা, প্লিজ দরজা খোল। লেট মি এক্সপ্লেইন।

—ব্যাখ্যা করার কিছু নেই। দরকারও নেই। তুমি যেতে পার।

—পরা, প্লিজ।—পূষণ অনুনয়ে ভেঙে পড়ে।

—তুমি আমাকে অফিসে এবং ব্যক্তি জীবনে কুৎসিত ভাবে প্রতারণা করেছ। নাউ, লিভ মি অ্যালোন।

—প্রতারণা? তুমি ভুল করছ অপরা। আমি প্রতারণা করিনি। বিশ্বাস কর। হ্যাঁ, সত্য গোপন করেছি। কিন্তু প্রতারণা করিনি। আমি তোমাকে ভালবাসি—জীবনে প্রথমবার জেনেছি ভালবাসা কি।

—এসব কথা বলারও তোমার অনেক লোক আছে। আমি শুনতে আগ্রহী নই। মিথ্যা-প্রতারণার সঙ্গে আপস করতে শিখিনি। একবার ঠকেছি বলেই আর ঠকতে চাই না। তুমি যাও।

—কোথায় যাব, পরা, কোথায় যাব, বলো। আমি সব ছেড়ে তোমার কাছে এসেছি তোমাকে নিয়ে যাব বলে, তোমার সঙ্গে বাঁচব বলে। এখন আমি কোথায় যাব?

অপরার ঠোঁটের কোণে একটুকরো হাসি ঝিলিয়ে ওঠে—যেখান থেকে উঠে এসেছিলে—ফুটপাতে, আস্তাকুঁড়ে। যেটা তোমার আসল জায়গা।

পূষণের চোখের সামনে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

—

BIVAV

Price : Rs. 15·00
Vol. 11. No. 4

42nd Special Autumn Issue
July – Sept. 88
Published in October 88

Reg. No.
R. N. No. 30017/76

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL No. ISSN 0970 – 1885

With Best Compliments from :

East India
Pharmaceutical Works
Limited

6, LITTLE RUSSELL STREET
CALCUTTA-700071